নব-নারী

অর্থাৎ

প্রাচীন ও আধুনিক নয় নারীর জীবন চরিত

৺ নীলমণি বসাক

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা।

মৃজাপুর, অপর সর্কিউলার রোড,

৫৮।৫ সঙ্খ্যক ভবনে

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সন ১২৭৭। ইং ১৮৭০।

বিজ্ঞাপন।

ভিন্ন দেশীয় অনেকে মনে করিয়া থাকেন এতদ্দেশে বিদ্যাবতী বা গুণবতী নারী ছিলেন না। এ কথা নিতান্ত অমূলক। পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে অনেক বিদ্যাবতী ও গুণশালিনী কামিনী ছিলেন, বিবিধ প্রাচীনগ্রন্থে ইহা প্রকাশ আছে। এবং একালেও গুণবতীনারীর অভাব নাই। কিন্তু এতদ্দেশে জীবনচরিত লিখিবার প্রথা না থাকাতে তাদৃশ স্ত্রীদিগের গুণ ও যশঃ বিশেষরূপে সর্ব্বত্র বিদিত হইতে পারে নাই। এই ন্যূনতা পরিহার বাসনায়, এবং বালিকারা সদ্গুণবিশিষ্টা স্ত্রীদিগের উত্তম উত্তম চরিত্র দর্শন করিলে পবিত্র পথ অবলম্বন করিবে এই অভিপ্রায়ে, অশেষ প্রকার অনুসন্ধান ও নানা গ্রন্থহইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রাচীন ও আধুনিক নয় নারীর চরিত্র লিখিত হইল।

এই পুস্তক অধিক মনোরম হইবে এই আশয়ে, সীতাচরিত্রের মধ্যে রামায়ণের ও দ্রৌপদী-চরিত্রের মধ্যে মহাভারতের সমুদায় বৃত্তান্ত সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কি দেশীয় কি বিদেশীয় সমুদায় বালক বালিকার ও সর্ব্বসাধারণের সহজে বোধ হইবার নিমিত্ত এই পুস্তক অতি সরল ভাষাতে লিখিত হইল। যদি ইহাতে কোন দোষ দর্শন হয়, গুণজ্ঞ মহাশয়েরা গণ্য করিবেন না।

এই পুস্তকে যে সকল নারীর চরিত্র লিখিত হইল তাঁহারা কোন্‌সময়ে জন্মিয়াছেন এবং কে কতবৎসরজীবিত ছিলেন, কোন গ্রন্থে তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া কঠিন, এজন্য সকলের জন্মসময় ও জীবনকাল লিখিত হয় নাই।

পুনশ্চ

নবনারী পুস্তক প্রকাশ করিবার সময় আমার এমত আশা হয় নাই যে, ইহার এত অধিক আদর হইবে। কিন্তু ইহাতে আমার আশার অতিরিক্ত ফল হইয়াছে, যেহেতুক ভদ্র-

লোক মাত্রেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং হিন্দুকালেজ প্রভৃতি কলিকাতাস্থ ও অন্যান্য দেশস্থ অনেক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এই নবনারী অনেক নারী পাঠ করেন, ইহা অপেক্ষা অধিক সন্তোষের বিষয় আর কি হইতে পারে। এক্ষণে এই পুস্তক সমুদায় শেষ হওয়াতে, পুনর্ব্বার সংশোধিত করিয়া মুদ্রিত করা-গেল, এবং সকলে গ্রহণ করিতে পারেন, এজন্য মূল্য, পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন করিয়া দেওয়াগেল। পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক এই পুস্তক প্রথমে সংশোধিত হইয়াছিল।

শ্রী নীলমণি বসাক।

এবারে তৃতীয় বারের মত অবিকল থাকিল, কেবল দুই একটী কথা পরিবর্ত্ত হইয়াছে মাত্র।

সন ১২৭২। }
ইং ১৮৬৫। } শ্রী গিরিশচন্দ্র শর্ম্মা।

এই পঞ্চম বারও কেবল ২।১টী কথা পরিবর্ত্ত হইল।
ইং ১৮৭০। শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

সূচীপত্র।

নব-নারী

—০—

সীতা।

সীতা মিথিলাধিপতি জনক রাজর্ষির কুমারী। বাল্মীকি মুনি লিখিয়াছেন জনক রাজা পুত্র-কামনায় যজ্ঞের ভূমি খনন করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে লাঙ্গলের ফলাতে এক অণ্ড উঠিল। রাজা তন্মধ্যে এক কন্যা প্রাপ্ত হইয়া তাহার সীতা নাম রাখিয়া তাহাকে দুহিতার ন্যায় লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং যত্ন-পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন।

সীতা পরম রূপবতী ছিলেন এবং ক্রমে গুণবতীও হইলেন। পরে তাঁহার বিবাহের বয়ঃক্রম হইলে জনক রাজা মনে মনে এই স্থির করিলেন, সর্ব্বগুণান্বিত যে রাজকুমার মহাদেবের ধনুর্ভঙ্গ করিবেন তাঁহাকে আমি এই কন্যা সম্প্রদান করিব। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি দেশ দেশান্তরে সংবাদ পাঠাইলেন, যাঁহার সীতাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা থাকে তিনি আসিয়া ধনুক ভঙ্গ করুন এই সংবাদে কন্যারত্ন লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া অনেকানেক রাজনন্দন মিথিলা নগরে আগমন

করিলেন, কিন্তু ধনুক ভঙ্গ করিতে না পারিয়া সীতার আশায় নিরাশ হইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সূর্য্যবংশীয রাজা দশরথ অযোধ্যাধিপতি ছিলেন। তাঁহার সাত শত মহিষী ছিলেন, কিন্তু কাহারও সন্তানাদি হয় নাই। পরে ভাগ্যক্রমে কৌশল্যা, কেকয়ী ও সুমিত্রা এই তিন রাণী এককালে গর্ভবতী হইলেন। কৌশল্যা রাণীর গর্ভে রাম, কেকয়ী রাণীর গর্ভে ভরত, আর সুমিত্রা রাণীর গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন যমজ পুত্রদ্বয় জন্মিলেন। এই চারি পুত্র জন্মিলে জনশ্রুতি হইল স্বয়ং নারায়ণ অংশ-চতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইলেন। পরে এই চারি ভ্রাতার কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে তাঁহারা বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যায় এমত সুপণ্ডিত হইলেন যে, তৎকালে তাঁহাদের তুল্য পণ্ডিত বা বীর পৃথিবীতে ছিল না। অধিকন্তু চারি ভ্রাতায় অত্যন্ত প্রণয় জন্মিল।

ঐ সময়ে নরহিংসক রাক্ষসদিগের অত্যন্ত দৌরাত্ম্য ছিল। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোন যাগ যজ্ঞ বা ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহারা অস্থি ও শোণিত প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু প্রক্ষেপ করিয়া তাহা নষ্ট করিত। তাহাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। এই উপদ্রব নিবারণার্থ বিশ্বা-

মিত্র মুনি রাজা দশরথের নিকটে গিয়া প্রার্থনা করিলেন, যদি নিশাচরগণের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য আপনি রাম ও লক্ষ্মণকে দেন, তবে আমরা নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাধা করিতে পারি। রাজা দশরথ যদিও তাহাতে মনে মনে অসম্মত ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্ম-শাপের আশঙ্কায় অগত্যা সম্মত হইলেন। পরে বিশ্বামিত্র মুনি রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহারা সুবাহু ও তাড়কাপ্রভৃতি অনেক রাক্ষস রাক্ষসী বধ করিলেন, তাহাতে মুনিগণ স্বচ্ছন্দে যজ্ঞ সমাধা করিয়া রাম লক্ষ্মণকে অশেষ প্রকারে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর যখন বিশ্বামিত্র মুনি রাম লক্ষ্মণকে গৃহে প্রত্যানয়ন করেন তখন তাঁহারা জনক রাজার ধনুর্ভঙ্গের প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করিয়া তদীয় রাজ্যে গমনেচ্ছু হইলেন। তাহাতে বিশ্বামিত্র মুনি তাঁহাদের উভয়কে মিথিলা নগরে জনক রাজার সমীপে লইয়া গেলেন। জনক রাজা নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম রামচন্দ্রকে দেখিয়া এবং তাঁহার গুণানুবাদ শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া নির্জ্জনে বিশ্বামিত্র মুনিকে কহিলেন, আমি ইহাঁকে কন্যা দান করি, ইহা আমার নিতান্ত বাঞ্ছা, কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ না করিলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপযশ হইবে, এই বড় আশঙ্কা! সীতাও তদ্গুণ শ্রবণে মোহিত

হইয়া অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিলেন, এবং দর্শনাবধি তাঁহাকে আপন মন সমর্পণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার কোমল শরীর, তিনি এই বিষম ধনুক কিরূপে ভঙ্গ করিবেন ইহাই ভাবনা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, রাম ভগ্নোৎসাহ বা ভীত না হইয়া, অনেকানেক মহাবল রাজারা যে ধনুক নত করিতেও পারেন নাই, সে ধনুক অনায়াসে ভগ্ন করিলেন।

রাম ধনুর্ভঙ্গ করিলে পর, জনক রাজা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে কন্যা দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু রাম পিতার অনুমতি বিনা বিবাহ করিতে সম্মত না হইয়া, পিতাকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন এবং ভরত ও শত্রুঘ্নকে আনয়নার্থ দূত প্রেরণ করিতে বলিলেন। জনক রাজা তদনুসারে অযোধ্যা নগরে দূত প্রেরণ করিলেন। রাজা দশরথ এই সংবাদে পরমানন্দিত হইয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে লইয়া বহুসমারোহ পূর্ব্বক মিথিলা নগরে গমন করিলেন। জনক রাজা যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। পরে শুভ লগ্ন স্থির করিয়া তিনি রামচন্দ্রকে সীতা সম্প্রদান করিলেন। ঊর্ম্মিলা নাম্নী তাঁহার আর এক কন্যা ছিল, লক্ষ্মণের সহিত তাঁহারও বিবাহ দিলেন। এবং কুশধ্বজ নামে তাঁহার এক অনুজের পরম সুন্দরী দুই কন্যা ছিল, ভরত ও শত্রুঘ্নকে সেই

দুই কন্যা দান করিলেন। রাজা দশরথ এইরূপ চারি পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্র ও পুত্রবধূগণকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন; তাঁহাদের আগমনে অযোধ্যা নগরে মহা আনন্দোৎসব হইল, রাজা দশরথ অনেক পুণ্য কর্ম্ম ও দান বিতরণ করিলেন।

তদনন্তর ভরত শত্রুঘ্ন-সমভিব্যাহারে কেকয় নগরে মাতামহালয়ে গমন করিলেন। ইহার কিছু কাল পরে সুবিজ্ঞ রাজা দশরথ বয়োধিক্য প্রযুক্ত আপনাকে রাজকর্ম্মে অক্ষম বিবেচনা করিয়া, সুহৃদ-রাজগণ ও পাত্র মিত্রগণের পরামর্শানুসারে রামকে রাজত্ব দিয়া আপনি স্বচ্ছন্দে থাকিবার বাঞ্ছায়, তাঁহাকে কহিলেন, রাম, আমি বৃদ্ধ এবং রাজকর্ম্মে অক্ষম হইয়াছি। অতএব, তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, তোমাকে রাজ্য প্রদান করিয়া আমি রাজকার্য্য হইতে অবসর লইতে ইচ্ছা করিয়াছি, তুমি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া যথানিয়মে প্রজাপালন কর। যাহার যে অভিযোগ থাকে শুনিয়া বিচার করিবে। রাজনীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া যাহাতে আপন মানবৃদ্ধি হয় তাহা করিবে। পরের সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে তাহার প্রতি কুদৃষ্টি করিবে না। পরহিংসা ও পরপীড়ন করিবে না, পরধনে লোভ করিবে না। বিনা অপরাধে কাহারও দণ্ড করিবে না। পরদার-পরায়ণ ও পরপীড়ককে শাস্ত্রানুসারে

দণ্ড দিবে। তপ জপ ও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে, এবং দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি রাখিবে। সকলের প্রতি সদয় ও সদাশয় হইবে। অনাথ দীন দুঃখিদিগকে প্রতি-পালন করিবে। এবং যাহাতে কাহারও দুঃখ না হয় এমত কর্ম্ম করিবে। ইত্যাদি নানা প্রকার উপদেশ দিয়া, পরদিন রাজ্য দিবেন এই স্থির করিয়া, অধিবাস করাইলেন।

রাম রাজা হইবেন এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রকাশ হইলে, অযোধ্যাবাসী তাবৎ লোক আনন্দে মগ্ন হইল। কিন্তু কেকয়ী রাণীর অত্যন্ত মনোদুঃখ হইল। তাহার কারণ এই—রাজা দশরথ তাহার গর্ভজাত ভরতকে রাজা না করিয়া তাহার সপত্নীপুত্র রামকে রাজা করি-লেন। অতএব রাজা রজনীযোগে অন্তঃপুরে আসিলে কেকয়ী তাঁহার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া মৌনভাবে ম্লানবদনে শয়ন করিয়া থাকিলেন। রাজা বৃদ্ধ, কেকয়ী যুবতী ছিলেন, বৃদ্ধদিগের যুবতী ভার্য্যা প্রাণ অপে-ক্ষাও প্রেয়সী হয়, এই জন্য রাজা দশরথ কেকয়ীর অনেক সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন, আর বলিলেন, হে প্রিয়ে, তুমি কি জন্য অভিমান করিয়া [illegible] এত বড় রাজা, আমার শাসনে পৃথি[illegible] তোমার কিসের অভাব হইয়াছে [illegible] দিতেছি। কেকয়ী বলিলেন, হে না[illegible]

করিয়া বল আমি যাহা চাহিব তাহা দিবে, তবে আমি সাহস করিয়া আপন অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারি। রাজা বলিলেন তোমার জন্য প্রাণদান করিতে পারি, তুমি কি চাহ বল, আমি সত্য করিলাম, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব।

এই কথা শুনিয়া কেকয়ী চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রগণকে সাক্ষী করিয়া রাজাকে বলিলেন হে মহারাজ, ইহার পূর্ব্বে যখন তুমি যুদ্ধে আহত হইয়াছিলে তখন আমি তোমার অনেক সেবা করিয়াছিলাম। তাহাতে তুমি আমাকে বর দিতে চাহিয়াছিলে। পরে তোমাকে আর এক বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছি, তাহাতেও তুমি বর দিতে চাহিয়াছিলে। আমি তখন কোন বর লই নাই। অতএব এক্ষণে সেই দুই বর চাহিতেছি আমাকে দাও। রাজা বলিলেন তাহার বাধা কি, কি দুই বর চাহ বল। কেকয়ী বলিলেন আমার প্রথম প্রার্থনা এই, ভরতকে রাজত্ব প্রদান কর, এবং দ্বিতীয় প্রার্থনা এই, রামকে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাস দাও। রাজা এই কথায় স্তব্ধ হইয়া কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত অচৈতন্য ভাবে থাকিলেন, তৎপরে স্বভাবস্থ হইয়া কেকয়ীকে বলিলেন, অরে চণ্ডালি, শ্রীরাম অতি ধার্ম্মিক, তাঁহাকে বনবাস দিয়া এক দিবসও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। অতএব পতি-

হীনত্ব স্বীকার করিয়াও তুই সপত্নীপুত্রের বনবাস ইচ্ছা করিস্। হায়, তোর তুল্য নরাধমা পৃথিবীতে আর নাই। কল্য রাম রাজা হইবেন, অদ্য তাঁহার অধিবাস হইয়াছে। কল্য ভরতকে রাজ্য দিলে লোকে কহিবে আমি স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া এই কর্ম্ম করিলাম, ইহা আমার প্রাণে কখন সহ্য হইবে না। যে ব্যক্তি নারীর বশ সে অত্যন্ত হেয়। রাজা এই প্রকার অনেক ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেকয়ী রাণী কোন প্রকারে ক্ষান্ত হইলেন না। সমস্ত রাত্রি কেবল কলহে ও দুঃখে যাপন হইল।

রজনী প্রভাত হইলেও রাজা শোকে ব্যাকুলতা প্রযুক্ত রাজসভায় আসিলেন না, রাজ্যাভিষেকের সময় উপস্থিত হইলেও তিনি বহির্গমন করিলেন না, তাহাতে সভাস্থ গণ এই বলিয়া সুমন্ত্র সারথিকে অন্তঃপুরে পাঠাইলেন যে, দেখিয়া আইস রাজা কেন আসিতেছেন না। সুমন্ত্র গিয়া দেখিল রাজা দশরথ অজ্ঞানাবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া আছেন। সুমন্ত্র কহিল মহারাজ, অদ্য রাম রাজা হইবেন, নিমন্ত্রিত নৃপতি-গণ সভায় অধিষ্ঠান করিয়াছেন, আপনার অপেক্ষা মাত্র, আপনি শীঘ্র আসিয়া রামকে রাজা করুন। দশ-রথ কহিলেন, সুমন্ত্র আর কি দেখিতেছ, পাপীয়সী কেকয়ী আমার প্রাণ বধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে

ইহার সত্যে আমি আপনাকে বদ্ধ করিয়াছি, তুমি শীঘ্র রামকে লইয়া আইস, ইহার যে পরামর্শ হয় তাহা করা যাইতেছে।

এই কথায় সারথি তথনি রামের সমীপে গমন করিল। রাম তাহার কথার আভাসে পিতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সীতাকে কহিলেন, দেখ আমি রাজত্ব পাইব এই জানিয়া বুঝি বিমাতা কোন যুক্তি করিয়া থাকিবেন, অতএব পিতা ডাকিয়াছেন শুনিয়া আসি। ইহা বলিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক পিতার নিকট গমন করিলেন। পথে ও প্রকোষ্ঠে লোকারণ্য। রাম রাজা হইবেন ইহা দেখিবার জন্য দেশের সমুদায় লোক ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে, অধিক কি, যে সকল কুলবালা কখন গৃহের বাহির হয় নাই, তাহারাও লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া রাজপথে দণ্ডায়মানা হইয়াছে। এই লোকমণ্ডলীর মধ্য দিয়া যখন রাম চলিলেন তখন সকলে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। পরে রাম, লক্ষ্মণকে বাহির প্রকোষ্ঠে রাখিয়া পিতার অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, পিতা অজ্ঞানাবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া আছেন। তাহাতে বিমাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মাতঃ! পিতার এ ভাব কেন। কেকয়ী বলিলেন রাজা আমাকে দুই বর দিবেন পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সেই দুই বর প্রার্থনা করিয়াছি। প্রথম বর এই

ভরত রাজা হইবেন, দ্বিতীয় বর এই, রাম তুমি চতু- র্দ্দশ বৎসর বনবাস করিবে।

রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন এজন্য পিতার ভাবনা কি, ভরত সর্ব্বগুণবিশিষ্ট এবং উত্তমরূপে রাজ্য করিতে পারিবেন, তিনি আসিয়া রাজ্য করুন, আমি বনে গমন করিতেছি। কেকয়ী বলিলেন, রাম, ভরত আসিবার অপেক্ষা না করিয়া তুমি অদ্যই বনে গমন কর। রাজা দশরথ কেকয়ীর এই সকল কথা শুনিয়া অধোবদন হইলেন। রাম বলিলেন জননি, আমি অদ্যই বনে গমন করিব, কেবল সীতাকে মাতার নিকট অর্পণ করিবার অপেক্ষা, অধিক বিলম্ব হইবে না। ইহা বলিয়া রামচন্দ্র পিতাকে প্রণাম করিলেন। রাজা পুত্রের এইরূপ অলৌকিক সুশীলতা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রামচন্দ্র স্বীয় জননীর নিকটে গিয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া, মাতাকে কহিলেন আমি পিতৃ- সত্য পালনার্থ বন গমন করিব। কৌশল্যারাণী তাঁহার বনবাসের কথা শুনিয়া একবারে হাহাকার ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং রামকে নানারূপ বুঝাইয়া বনগমনে ক্ষান্ত করিতে যত্ন করিলেন। রাম বলিলেন আমি অরণ্যে গমন না করিলে পিতার সত্য পালন হয় না। কৌশল্যা বলিলেন, রাজা বুদ্ধিশুদ্ধিরহিত এবং কেকয়ীর

অত্যন্ত বশবর্ত্তী। শাস্ত্রে লেখে, স্ত্রীর বাধ্য হইবে না। অতএব যে পিতা স্ত্রীর বশ হইয়া এমন পুত্রকে বনবাস দিতে চাহেন তাঁহার আবার সত্য কি! লক্ষ্মণ বলি-লেন, জননী যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন, যে পিতা স্ত্রী-বশীভূত, তাঁহার কথায় কেন রাজ্য ত্যাগ করিবেন। হে প্রভো, আমি তোমার আজ্ঞাকারী, আজ্ঞা কর এখনি ভরতের রাজ্যভোগ খণ্ডাইয়া দিই। কৌশল্যা বলিলেন, রাম, লক্ষ্মণ কি বলিতেছে শুন, আমি তোমায় ভূয়ো ভূয়ঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি পিতৃ আজ্ঞা পালন করিও না। বরঞ্চ এক সত্য পালন জন্য ভরতকে সমুদয় রাজ্যভার দাও, কিন্তু দ্বিতীয় আজ্ঞা পালনের প্রয়োজন নাই। তুমি বনে গমন করিলে আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। আর দেখ, তোমার গর্ভ-ধারিণী জননী আমি, তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া কত ক্লেশ পাইয়াছি। অতএব মাতা, পিতা অপেক্ষা পূজ্যা, আমি তোমাকে বনগমনে নিষেধ করিতেছি, তুমি মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করিও না। রাম বলিলেন সে কথা সত্য, কিন্তু পিতা তোমার পূজ্য, অতএব তাঁহার আজ্ঞা অবশ্য গুরুতর, তাহা কিরূপে লঙ্ঘন করিব।

যখন কৌশল্যারাণী রামকে এইপ্রকার পিতৃআজ্ঞা পালনে দৃঢপ্রতিজ্ঞ দেখিলেন তখন অত্যন্ত শোকা-কুলা হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাম মাতাকে

প্রণাম করিয়া সীতার সমীপে গমন করিলেন, এবং উাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়া বলিলেন, সীতে! এখন এক বৎসরও গত হয় নাই, তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। ইহার মধ্যেই বিধাতা এই বিড়ম্বনা করিলেন, আমি অরণ্যে চলিলাম, যেকাল পর্য্যন্ত আমার প্রত্যাগমন না হয় সে কাল পর্য্যন্ত তুমি গৃহে থাকিয়া মাতার সেবা করিও। জানকী উত্তর করিলেন, প্রাণেশ্বর, তুমি আমার সর্ব্বময় কর্ত্তা ও পরম গুরু, তুমি যদি বনে গমন কর, তবে আমার গৃহে থাকিয়া কি সুখ। পতি বিনা পত্নীর অন্য গতি নাই, পতির জীবনে জীবন এবং মরণে মরণ। অতএব যদি তুমি অরণ্যে গমন কর আমিও তোমার সঙ্গিনী হইব, আমি তোমার চিরদিনের বন্দিনী, তুমি যেখানে যাইবে সেইখানেই তোমার চরণসেবায় নিযুক্ত থাকিব। বিশেষতঃ তুমি বনে অনেক ক্লেশ পাইবে, এ দাসী সঙ্গে থাকিলে তাহার অনেক লাঘব হইবে। যদি বল, তোমার সঙ্গে গেলে আমিও দুঃখ পাইব, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার সকল দুঃখ দূর হইবে, তোমার দর্শনে রোগ শোক কিছু জানিতে পারিব না, তোমার সেবায় পরম সুখ মানিব।

রাম বলিলেন, প্রিয়তমে বন অতি ভয়ানক এবং সিংহ ব্যাঘ্র ও রাক্ষসে পরিপূর্ণ। তুমি নবীন যুবতী,

সেই দুর্গম ভয়ানক অরণ্যে কিরূপে যাইবে, এবং ফল মূল আহার করিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিবে। তোমার অতি কোমল অঙ্গ, তুমি কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া থাক, মৃত্তিকাতে কিরূপে শয়ন করিবে। আরও, তুমি কখন গৃহের বাহির হও নাই, তুমি কিরূপে পদব্রজে গমন করিবে, তোমার কোমল চরণ কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হইলে তুমি চলৎশক্তিরহিতা হইবে। ইহা ভিন্ন বন-বাসে উভয়ের বিকৃত মূর্ত্তি হইবে, তাহাতে পরস্পর দর্শনে সুখ বোধ হইবে না। অতএব তুমি অন্তঃপুরে বাস কর, চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে আমি পুনর্ব্বার আসিয়া তোমার সঙ্গে সুখে কালযাপন করিব।

স্বামীর এ সকল কথায় জানকী সাতিশয় কাতরা হইয়া কহিলেন, হে নাথ, তুমি পণ্ডিত হইয়া কেন অপণ্ডিতের ন্যায় কথা কহিতেছ! তুমি ভূমণ্ডলে বীর নামে বিখ্যাত, কিন্তু যে ব্যক্তি আপন ভার্য্যা রক্ষা করিতে অক্ষম, তাহার বীরত্ব কি। দেখ, ভরত তোমার রাজ্য লইতে কিছু উপেক্ষা করিল না, তাহার রাজ্যে তোমার ভার্য্যাকে কে রক্ষা করিবে, তোমার স্ত্রীকে লইতে তাহার বিলম্ব কি। তুমি বলিতেছ বন গমনে আমার চরণে কাঁটা ফুটিবে, কিন্তু তুমি নিকটে থাকিলে সে কাঁটাকে তৃণ জ্ঞান করিব। মৃত্তিকায় শয়ন করিলে যদি অঙ্গে ধূলী লাগে তাহাও তোমার

কৃপায় অগুরুচন্দন জ্ঞান করিব। তোমার সঙ্গে যদি তরুমূলে বাস করি তাহাও স্বর্ণপুরী হইতে সহস্র গুণে সুখজনক। তোমার দুঃখে দুঃখ, তোমার সুখে সুখ, তোমা বিনা সকল অন্ধকার। যদি কানন ভ্রমণে ক্ষুধা বা তৃষ্ণা হয় তোমার শ্যাম রূপ দর্শনে তাহা নিবারণ করিব। বিশেষ, অনেক তীর্থ পর্য্যটন হইবে, অপূর্ব্ব বন ও গিরি দর্শন করিব। আমি যখন পিত্রালয়ে ছিলাম, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বলিতেন এই কন্যা পতি-সঙ্গে বনবাস করিবে। সে কথা কখন মিথ্যা নহে, আমার অদৃষ্টে বনবাস আছে তাহা কে খণ্ডন করিতে পারিবে। যদি তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া না যাও, তবে আমি আত্মহত্যা করিব, তাহাতে তুমি স্ত্রীবধের অপরাধী হইবে।

জনকনন্দিনী এই প্রকার উত্তর করিলে রাম বলিলেন, সীতে, তোমার মনঃ পরীক্ষার্থ আমি এই সকল কথা কহিয়াছিলাম। তুমি যদি নিতান্ত আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা কর তবে অঙ্গাভরণ পরিত্যাগ কর। এই কথা শুনিয়া সীতা মহা আহ্লাদিতা হইয়া আভরণ মোচন করিয়া যাহাকে সম্মুখে দেখিলেন তাহাকে দিলেন, এবং ভাণ্ডারে যে বস্ত্র ও ধন ছিল তখনই তাহা সকল বিতরণ করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাই, তুমি

গৃহে থাকিয়া সকলকে পালন কর, দাস দাসীদিগের সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিবে, কখন রাজ্য লইবার আশা করিও না। পিতা মাতা আমাকে না দেখিয়া কাতর হইবেন, কিন্তু তুমি আমি অভেদাত্মা, অতএব তোমাকে দেখিলেও অনেক সান্ত্বনা পাইবেন। লক্ষ্মণ বলিলেন আমি তোমার সেবক, তুমি যদি অরণ্য গমন করিবে আমিও তোমার অনুচর হইয়া সঙ্গে যাইব। বিশেষ, তুমি আমি এক, বিমাতা তাহা জানেন, অতএব আমি তোমার সঙ্গে গমন না করিলে তিনি কি মনে করিবেন, এবং সেবক বিনা তুমি সীতাকে লইয়া কিপ্রকারে বনে বনে ভ্রমণ করিবে। অতএব আমি এখানে থাকিব না, তোমার সঙ্গে যাইব। রাম বলিলেন যদি নিতান্তই সমভিব্যাহারী হও তবে উত্তম ধনুক ও শর সঙ্গে লও। বনমধ্যে অনেক রাক্ষস রাক্ষসী আছে তাহাদের সঙ্গে সতত যুদ্ধ দ্বন্দ্ব হইবে। এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ উত্তম ধনুক ও শর বাছিয়া লইলেন। তদনন্তর রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, আমরা বনে চলিলাম, আমাদের ধনে প্রয়োজন নাই, অতএব পুরোহিত ও সৎকুলজাত ব্রাহ্মণ আনাইয়া, যিনি যাহা চাহেন তাহাকে তাহা দান কর, এবং দরিদ্র ভিক্ষুক দীন অনাথ যাহারা আমাদের দুঃখে দুঃখী তাহাদের যে যাহা যাচ্ঞা করে তাহা তাহা-

দিগকে দাও। চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে যেন কাহাকেও অন্যত্র ভিক্ষা করিতে না হয়। এই আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মণ মুক্তহস্তে তাবৎ ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে অনেকে অনেক ধন পাইল, এবং যে অতি দরিদ্র ছিল সেও ধনাঢ্য হইল।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অরণ্য গমনে প্রস্তুত হইলেন। যে রাম লক্ষ্মণ, সোণার চতুর্দ্দোলায় গমন করিতেন, কখন ভূমিতে পাদ ক্ষেপণ করেন নাই, ও যে সীতা কখন সূর্য্যের মুখাবলোকন করেন নাই, তাঁহারা অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া রাজপথে দাঁড়াইলেন। তাঁহাদিগের এই অবস্থা দেখিয়া অযোধ্যাবাসী স্ত্রী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ সকলে হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। রাজা দশরথ কেকয়ীর বশতাপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বনে দিলেন এই অপবাদে তাবৎ নগর পূর্ণ হইল।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা রাজার নিকট বিদায় হইতে গেলেন। রাজা তখন শোকে ব্যাকুল হইয়া কালভুজঙ্গিনী কেকয়ী রাণীকে নানাপ্রকার তিরস্কার করিতে ছিলেন। পরে রামচন্দ্র বিদায় হইতে আসিয়াছেন এই সংবাদ হইলে তিনি মহিষীগণকে ডাকিতে বলিলেন। তাঁহারা আসিয়া রাজার চতুর্দ্দিকে বসিলে, রাম লক্ষ্মণ এবং সীতা তিন জনে রাজাকে প্রণাম করিয়া

বলিলেন, মহারাজ, অনুমতি হউক, আমরা বনে গমন করি। রাজা রোদন করিতে করিতে বলিলেন বৎস, তোমার সঙ্গে আমার পুনর্দ্দর্শনের আশা নাই, তোমার শোকে আমার জীবনান্ত নিশ্চিত, অতএব আমিও তোমার সঙ্গে কাননে গমন করিব। রাম বলিলেন পুত্রের সঙ্গে পিতার অরণ্য গমন অবিধি। রাজা বলিলেন তবে তুমি অদ্য বনযাত্রা করিও না, কল্য যাইও, অদ্য আমি তোমাকে দেখিয়া মনের ক্ষোভ দূর করি। রাম বলিলেন এক রাত্রির জন্য কেন একটা অপযশ থাকিবে। তাহা হইলে বিমাতা ঠাকুরাণী মন্দ কহিবেন, অতএব অদ্যই বনগমন শ্রেয়ঃ।

রাজা এই কথা শুনিয়া সুমন্ত্র সারথিকে আজ্ঞা করিলেন রামের সঙ্গে তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও বহুমূল্য ধন দাও, অরণ্যমধ্যে অনেক পুণ্য স্থান ও তপস্বী আছেন, রাম এই সকল ধন তাঁহাদিগকে দান করিবেন। রাজা এই আজ্ঞা করিলে, কেকয়ী অত্যন্ত ম্লানবদনা হইয়া রাজাকে বলিলেন মহারাজ, আপনি ভরতকে সকল রাজ্য দিয়াছেন, অতএব এই সকল ধন লইয়া রামকে দেন এ কোন্ বিচার। রামচন্দ্র বলিলেন পিতঃ বিমাতা উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি অরণ্যগমন করিব, আমার অশ্ব হস্তী ও অর্থে কি প্রয়োজন, আমি বল্কল পরিধান করিয়া অরণ্য ভ্রমণ করিব, কেবল লক্ষ্মণ ও

সীতা আমার সঙ্গে যাইবেন, অন্য কোন দ্রব্যের প্রয়োজন নাই। কেকয়ী রাণী পূর্ব্বে বল্কল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, রাম বল্কলের নাম করিবামাত্র তিনি সেই বল্কল আনাইয়া দিলেন। তদবলোকনে রাজা দশরথ ও তাঁহার সাত শত রাণী রোদন করিতে লাগিলেন, এবং কেকয়ীকে সকলে এই বলিয়া ভৎ-সনা করিতে লাগিলেন, পিতৃসত্য পালনার্থে কেবল রামই বনে যাইবেন, লক্ষ্মণ ও সীতাকে কি জন্য বন প্রেরণ কর। অপর, রাম ও লক্ষ্মণ বল্কল পরিধান করিলেন, কিন্তু সীতা তাহা কিরূপে পরিধান করিবেন, সকলের এই মহাভাবনা হইল। পরে সভাসদ ও মন্ত্রি-গণ এই বিধান করিলেন যে সীতার বল্কল পরিধানের প্রয়োজন নাই, তিনি বসন ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিবেন।

ইহা স্থির হইলে, রাজাজ্ঞাতে সুমন্ত্র রাজভাণ্ডার হইতে উত্তম পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার আনিয়া দিল। জানকী ঐ বেশ ভূষায় ভূষিতা হইয়া ত্রিভুবনমোহিনী রূপ ধারণ করিয়া রাজার চরণে প্রণিপাত করিলেন। তৎপরে কৃতাঞ্জলিপুটে কৌশল্যা রাণীর সম্মুখে দণ্ডায়-মানা হইলেন। কৌশল্যা রাণী বলিলেন সীতে, তুমি রাজার কন্যা ও রাজার বধূ, তোমার আচরণ দেখিয়া ত্রিভুবন চলিবে, অতএব তুমি সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে

এবং স্বামীর সেবা করিবে। স্বামী নির্ধন বা ধনবান্ হউন স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের উত্তম ধন আর নাই। সীতা বলিলেন জননি, স্বামীর সেবা আমি পরম ধর্ম্ম জানি, এবং স্বামীর সেবা করিতে পাই এই আমার কামনা, সেই জন্য আমি বনগমনে ব্যগ্র, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন স্বামিপদ আমার সার হয়। কৌশল্যা বলিলেন এইরূপ কুলবধূ, এই নবীন বয়সে অরণ্যে যাইবে ইহাতে আমার আত্যন্তিক খেদ জন্মিতেছে। তদনন্তর কৌশল্যা রাণী রামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন দেখ রাম, জানকী অতি সুন্দরী, বন অতি ভয়ানক, তুমি ইহাঁকে লইয়া মুনির আশ্রমে সতত সাবধানে থাকিবে। সুমিত্রা বলিলেন, লক্ষ্মণ, তুমি রামকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিবে, শাস্ত্রে বলে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃ-তুল্য, অতএব সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিবে, এবং সীতাকে মাতার অধিক জ্ঞান করিবে। রাম বলিলেন, মাতঃ তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যদি তিন জনে একত্র থাকি, তাহাহইলে ত্রিভুবনে কাহাকেও শঙ্কা করি না। তদনন্তর রাম আর সকল রাজমহিষীকে বন্দনা করিলেন, এবং কেকয়ীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মা, আশীর্ব্বাদ কর; আমি বন প্রস্থান করি। কেকয়ী কোন উত্তর করিলেন না। তদনন্তর রাম মাতাকে পিতার চরণে সমর্পণ করিয়া

বলিলেন, আমি যেপর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করি, আপনি মাতাকে পালন করিবেন। রাজা বলিলেন আমি যদি জীবিত থাকি তবে তাহা অবশ্য করিব, কিন্তু তুমি বনে চলিলে, আমি তোমাকে এই আজ্ঞা করি, তুমি তাহা লঙ্ঘন করিও না, তুমি তিন্ দিবস রথারোহণে গমন কর। এই কথায় সুমন্ত্র রথ আনয়ন করিল। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা তদারোহণে যাত্রা করিলেন।

রাম যাত্রা করিলে অযোধ্যা নগরস্থ সমস্ত লোক রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। রাজা দশরথ যদিও উত্থান-শক্তি-রহিত তথাপি পুত্রকে দেখিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দাড়াইলেন। তদ্দৃষ্টে রাম সারথিকে বলিলেন, সারথে, আমি পিতার দুর্গতি আর দেখিতে পারি না, তুমি শীঘ্র রথ চালাও। এই কথায় সারথি বেগে রথ চালাইতে লাগিল, তাহাতে ক্ষণেক মধ্যে রথ দৃষ্টির অগোচর হইল। তখন রাজা অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল রাম চিন্তা করিতে লাগিলেন। রামের বন গমনে অপর সাধারণ সকল লোক অসুখী হইল।

যখন অযোধ্যাতে সকলে এইরূপ শোক-সাগরে মগ্ন, তখন রথারোহণে রামচন্দ্র তমসা নদীর কূলে উপনীত হইয়া, তথায় স্নান ও ফলাহার করিলেন। তৎপরে লক্ষ্মণ কতকগুলি বৃক্ষের পত্র বিছাইয়া দিলেন;

তাহাতে রাম ও সীতা শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া জাগরিত থাকিলেন। পর দিবস প্রাতঃস্নানাদি করিয়া তমসা নদী ও তৎপরে গোমতী নদী পার হইয়া ইক্ষ্বাকুর দেশ দিয়া গঙ্গাতীরে কোশল রাজ্যে উপস্থিত হইয়া জাহ্নবীর কূলে বৃক্ষ-মূলে বসিলেন। সারথি অশ্ব চরাইতে লাগিল। দিবাবসানে পুনর্ব্বার রথারোহণ করিয়া পর দিবস, শৃঙ্গবের নগরে গুহক চণ্ডাল নামক তাঁহার এক বন্ধুর গৃহে গিয়া সুমন্ত্র সারথিকে বিদায় দিলেন। গুহক চণ্ডাল তাঁহাকে রাখিবার জন্য অনেক যত্ন করিল, কিন্তু রাম তাহাতে সম্মত না হইয়া, পর দিবস গঙ্গাপার হইয়া অগ্রে আপনি, মধ্যে সীতা, পশ্চাতে লক্ষ্মণ, এই প্রকারে দুই ক্রোশ পদব্রজে গমন করিয়া, গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থলে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ভরদ্বাজ মুনি তাঁহাদের বনবাসের কথা শুনিয়া বিস্তর বিলাপ করিলেন, এবং সেইখানে তাঁহাদের অবস্থিতির জন্য অনেক আকিঞ্চন করিলেন। কিন্তু অযোধ্যা নগর তথা হইতে অধিক দূর নহে, তথায় থাকিলে কি জানি ভরত তাঁহাকে লইতে আসিবেন, এই আশঙ্কায় তথায় অবস্থিতি না করিয়া, যমুনা পার হইয়া সীতাকে মধ্যে লইয়া রাম লক্ষ্মণ গমন করিতে লাগিলেন। সীতা কখন পথ ভ্রমণ করেন নাই, গমনে

অত্যন্ত ক্লান্তা হইলেন, এবং অগ্নিতে ক্ষীরের পুত্তলি যেমন গলিত হয়, সূর্য্যকিরণে তাঁহার কোমল শরীর তদ্রূপ হইতে লাগিল। অনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিয়া চিত্রকূট অরণ্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সেইখানে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া থাকিলেন।

এ দিকে সুমন্ত্র রামকে শৃঙ্গবের পুরে রাখিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইল। রাজা দশরথ পুত্রশোকে পূর্ব্বাবধি আহার নিদ্রা বর্জ্জিত, এক্ষণে ঐ সংবাদে আরও শোকাকুল হইয়া শয্যাগত হইলেন, এবং বলিলেন আমি সরযূতীরে একবার মৃগয়ার্থ গমন করিয়াছিলাম। ঐ সময়ে অন্ধক মুনির পুত্র নদী কূলে কমণ্ডলুতে জল পূর্ণ করিতেছিল। আমি সেই শব্দে মৃগ বোধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিয়াছিলাম। পরে মৃত পুত্রকে মুনির সন্নিধানে লইয়া দিলে, মুনি সরযূ নদীর তীরে পুত্রের তর্পণ করিয়া পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ কালে আমাকে এই অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে আমি যেমন পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলাম তুমিও এই প্রকার পুত্রশোকে মরিবে। অতএব সে কথা কখন ব্যর্থ হইবে না, রামের শোকে অদ্যই আমার প্রাণ ত্যাগ হইবে। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি হিমাঙ্গ ও অচেতন হইলেন, এবং সেই রাত্রেই তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল।

এই অচিন্তনীয় ঘটনায় সকল রাজমহিষী, বিশেষতঃ কৌশল্যা দেবী অধিক মনস্তাপ পাইলেন। অনন্তর, পুত্র নিকটে নাই, রাজার মুখানল কে করিবে এই জন্য বশিষ্ঠ মুনি ব্যবস্থা দিলেন তাঁহার শব তৈলের মধ্যে রাখিয়া কেকয়রাজ্য হইতে ভরত শত্রুঘ্নকে আনয়ন করা যাউক, ভরত আসিয়া পিতার মুখাগ্নি করিবে। এই পরামর্শানুসারে তখনই কেকয়-রাজ্যে দূত প্রেরিত হইল। দূতগণ রথযোগে পঞ্চম দিবসে তথায় উপনীত হইয়া ভরত শত্রুঘ্নকে রথারোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যায় লইয়া আসিল। ভরত ও শত্রুঘ্ন দুই ভাই অযোধ্যাতে আসিয়া পিতার মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন, এবং মাতাকে রামের বনবাসের মূল জানিয়া তাঁহাকে অশেষরূপে ভর্ৎসনা করিলেন। তৎপরে সরযূতীরে পিতার মুখাগ্নি করিয়া তদীয় আদ্যক্রিয়া উপলক্ষে অনেক ধন, অশ্ব, হস্তী ও গবী দান করিলেন।

তদনন্তর মন্ত্রিগণ ভরতকে সিংহাসনারূঢ় হইতে কহিলেন। কিন্তু ভরত উত্তর করিলেন রাজা বর্ত্তমানে সেবকের কর্ত্তব্য নহে যে, রাজ্যভার গ্রহণ করে। রাম এ রাজ্যের ভূপতি, আমি তাঁহার কিঙ্কর, অতএব তাঁহার রাজ্য আমাকে অর্হে না। বিশেষ, আমার মাতাকর্ত্তৃক তাঁহার বনবাস হইয়াছে, অতএব আমি

কখন সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারিব না। আমি ও শত্রুঘ্ন উভয়ে তাঁহার অন্বেষণে যাইব, এবং তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক, যেরূপে পারি মাতার দোষ-জন্য আমাদের প্রতি তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিয়া, তাঁহাকে আনিয়া রাজসিংহাসনে বসাইব।

ইহা বলিয়া ভরত ও শত্রুঘ্ন চতুরঙ্গ সেনা সমভি-ব্যাহারে তপস্বীর বেশে রামের অন্বেষণ করিতে করিতে চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া দেখিলেন, এক পর্ণশালার দ্বারে রামচন্দ্র বসিয়া আছেন, সীতা তন্মধ্যে, এবং লক্ষ্মণ বাহিরে আছেন। রামদর্শনে ভরত গলবস্ত্র হইয়া তাঁহার পদানত হইলেন। রাম তাঁহাকে তুলিয়া আলি-ঙ্গন করিলেন। অনন্তর ভরত রামের চরণ ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, আপনি কাহার বাক্যে রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে আসিয়াছেন। বামা জাতির বামা বুদ্ধি, তাহা-দের কথায় কে কোথায় রাজ্য ত্যাগ করে, বা দেশা-ন্তরে যায়। মাতা যে অপরাধ করিয়াছেন সে অপরাধ আমার, তাহা মার্জ্জনা করিয়া দেশে চলুন, আপনি অযোধ্যার ভূষণ, আপনা বিনা অযোধ্যা অন্ধকার। রাম বলিলেন ভরত, তুমি পণ্ডিত হইয়া কেন বিমাতার অনু-যোগ কর, আমি পিতৃ আজ্ঞায় বনবাসে আসিয়াছি, বিমাতার কিছুমাত্র দোষ নাই। ইহা বলিয়া রাম পিতার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে বশিষ্ঠ মুনি

তাঁহার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাম পিতার মৃত্যু সংবাদে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, এবং লক্ষ্মণ ও সীতাও রোদন করিতে লাগিলেন। পরে বশিষ্ঠ মুনির বিধানানুসারে তিন দিবস অশৌচ গ্রহণানন্তর রাম পিতৃশ্রাদ্ধাদি করিলেন। অনন্তর ভরতকে নানাপ্রকার বুঝাইয়া বলিলেন অযোধ্যা নগর শূন্য, কোন্ দিন কোন শত্রু আসিয়া রাজ্য নষ্ট করিবে. অতএব তুমি শীঘ্র যাইয়া বাজ্য শাসন ও প্রজা পালন কব। চতুর্দ্দশ বৎসর গতপ্রায়, তাহাব পর সকলে পুনর্ব্বার একত্র হইব। ভরত কহিলেন, সিংহের ভাব শৃগালে কথন বহন কবিতে পারে না, আমি কি প্রকারে আপনকার রাজ্য শাসন করিব। আপনি যদি একান্ত গৃহে না যান, তবে আমাকে আপনকাব চরণ-চিহ্ন পাদুকা প্রদান করুন, আমি তাহা সিংহাসনে স্থাপন করিয়া আপনকার নামে রাজ্য করিব, যদি তাহা না করেন, তবে আমিও আপনকাব সঙ্গে বনবাস করিব। এই কথা শুনিয়া বাম তাঁহাকে আপনার পাদুকা প্রদান কবিলেন। ভরত ঐ পাদুকা মস্তকে লইয়া স্বদেশে আসিয়া তাহা সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে ছত্র দণ্ড ধরাইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন।

ভরতের গমনের কিছু দিবস পরে, লক্ষ্মণ কহিলেন, প্রভু এখানে থাকিলে ভরত পুনর্ব্বার লইতে আসি-

বেন, অতএব এখানে আর অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য নহে, অন্যত্র চলুন। এই আশঙ্কায় রাম-লক্ষ্মণ সীতা সমভি-ব্যাহারে অগস্ত্য-পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। ঐ পর্ব্বতে আগমন মাত্র অগস্ত্য মুনি অগ্রসব হইয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদরে আপন আশ্রমে লইয়া গেলেন। মুনিব আশ্রমে কতক দিবস বাস করিয়া তাঁহারা পঞ্চ-বটী বনে গমন করিলেন এবং তথায় কুটীব নির্ম্মাণ কবিয়া বাস কবিতে লাগিলেন।

এই সময়ে লঙ্কাতে রাবণ রাজা ছিলেন। লঙ্কা লবণ-সমুদ্র-মধ্যস্থ এক দ্বীপ। এক্ষণে উহাব নাম সিংহল দ্বীপ *। ঐ দ্বীপ পূর্ব্বে রাক্ষস জাতিব অধি-কাব ছিল, কিন্তু তাহারা দেবতাগণের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ করিত, এই জন্য দেবতারা তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া রাক্ষস-বংশ ধ্বংস কবণানন্তব লঙ্কা অধিকাব করিয়া, বিশ্বশ্রবা মুনিব পুত্র বৈশ্রবণকে ঐ বাজ্য দিয়াছিলেন।

কিন্তু সংগ্রাম কালে কতগুলা বাক্ষস লঙ্কা হইতে পলায়ন কবিয়া, স্থানান্তরে লুকাইয়াছিল। বৈশ্রবণ লঙ্কাধিপতি হইলে তাহাদেব পুনরায় লঙ্কাধিকাবেব

---

* সিংহবাহু রাজা সিংহ বধ করিয়াছিলেন, এই হেতু তাঁহার পুত্রেরা সিংহল নামে উক্ত হয়েন। সেই সিংহল এই লঙ্কা অধিকার করিয়া বসতি করেন। তত্ত্ববোধিনী ৪২ সংখ্যা।

বাঞ্ছা হওয়াতে, সুমালী নামে রাক্ষসাধ্যক্ষ আপন দুহিতা নিকষাকে বলিল তুমি বিশ্বশ্রবা মুনির স্থানে গমন কর, এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তদ্দ্বারা পুত্র উৎপাদন কর, সেই পুত্র লঙ্কাধিকারী হইবে। বিশেষ ঐ পুত্র বৈশ্রবণের বৈমাত্র ভ্রাতা হইবে, তাহাতে রাজ্য পাওয়া সম্ভব। নিকষা পিতৃবাক্যে বিশ্বশ্রবা মুনির নিকট যাইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। মুনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। নিকষা কহিল আপনকার দ্বারা আমার দুই পুত্র হয় এই আমার অভিলাষ। বিশ্বশ্রবা মুনি ঐ প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বলিলেন তোমার গর্ভে দুই পুত্র জন্মিবে, কিন্তু তাহারা দুর্জ্জয় রাক্ষস হইবে। নিকষা মুনিকে প্রণাম করিয়া বলিল প্রভো আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন ইহাতে প্রফুল্ল হইলাম, কিন্তু আমার সন্তান দুর্জ্জয় রাক্ষস হইবে ইহাতে দুঃখিত হইলাম। অতএব সর্ব্বগুণবিশিষ্ট আর এক পুত্র আমাকে দেউন। মুনি কহিলেন তোমার আর এক সর্ব্বগুণবিশিষ্ট পুত্র হইবে।

এই কথা শুনিয়া নিকষা রাক্ষসী অতিশয় আনন্দিতা হইল। পরে যথাকালে তাহার তিন পুত্র জন্মিল। জ্যেষ্ঠ রাবণ, তাহার দশ মুণ্ড, বিংশতি

বাহু ও বিংশতি লোচন। দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণ, তাহার প্রকাণ্ড শরীর। তৃতীয় সর্ব্বগুণবিশিষ্ট বিভীষণ। রাবণ অত্যন্ত বলবান্ ও দিগ্‌বিজয়ী হইলেন। কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত অলস, অহরহঃ নিদ্রা যাইতেন। বিভীষণ পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, স্বজাতির ন্যায় নরহিংসা বা অন্য অত্যাচার করিতেন না।

রাবণ ক্রমে ক্রমে অনেক দেশ জয় করিলেন, এবং আপনি বাহুবলে লঙ্কা অধিকার করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার অসংখ্য পরিবার হইল, এবং তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মেদিনী কম্পমানা হইল। রামায়ণে ইহাও লিখিত আছে যে, তাঁহার ভয়ে দেবতারা তাঁহার আজ্ঞাকারী হইয়াছিলেন।

এই রাবণের শূর্পণখা নাম্নী এক সহোদরা ছিল। সে কতকগুলা নিশাচর সমভিব্যাহারে অরণ্য ভ্রমণ করিতে করিতে, একদা পঞ্চবটী বনে রাম ও লক্ষ্মণের ভুবন-মোহন রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিতা হইয়া, পরম রমণীয় বেশে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিতি পূর্ব্বক, পাণিগ্রহণের প্রার্থনায় রামের শরণাগত হইল। রাম কহিলেন, দেখ আমার ধর্ম্মপত্নী সঙ্গে, অতএব আমি তোমার কামনা সিদ্ধ করিতে অক্ষম। রাক্ষসী এই কথায় লক্ষ্মণের নিকট গেল। লক্ষ্মণ কহিলেন আমি তপস্বী, আমাকর্ত্তৃক তোমার

মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে না। রাম লক্ষ্মণ উভয়ে এইরূপ নৈরাশ করিলে, শূর্পণখা বিবেচনা করিল যে, সীতার জন্যই আমার কার্য্য সিদ্ধি হইল না। অতএব বদন ব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তাহাতে লক্ষ্মণ সীতাকে রক্ষা করিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তাহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিলেন। শূর্পণখা ঐ ক্রোধে স্বীয় সমভিব্যাহারী রাক্ষসসেনা লইয়া যুদ্ধারম্ভ করিল। রাম ঐ রাক্ষসগণের নিধন করিলেন। তাহাতে শূর্পণখা আরও মনঃপীড়া পাইয়া, স্বীয় সহোদর রাবণের নিকট যাইয়া কহিল, রাজা দশরথের পুত্র রাম ভার্য্যাসহ বনে আগমন করিলে, দেখিলাম যে তাহার পত্নী সীতা অতিরূপবতী এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালে তত্তুল্য সুন্দরী নারী নাই। অতএব তোমার জন্য তাহাকে আনিবার যত্ন করিয়াছিলাম, তাহাতে রাম আমার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছে।

রাবণ শূর্পণখার দুর্দ্দশা দেখিয়া, বিশেষতঃ সীতার রূপের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সীতাহরণাভিলাষী হইয়া, বিবেচনা করিলেন রাম লক্ষ্মণ সর্ব্বদা সীতাকে রক্ষা করে, অতএব কৌশল দ্বারা তাহাকে হরণ করিতে হইবে। মনে মনে এই স্থির করিয়া মারীচ-নামক রাক্ষসকে ডাকিয়া কহিলেন, হে মারীচ, সীতা হরণ-

বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করিতে হইবে। তুমি কোন কৌশলে রাম লক্ষ্মণকে বনে ভুলাইয়া লইয়া যাইবে, আমি তপস্বীর বেশে সীতাকে লইয়া আসিব। এই কর্ম্ম করিলে তোমার যথোচিত পুরস্কার করিব। মারীচ কহিল মহারাজ রাম অত্যন্ত বীর, বাল্যকালে যখন যজ্ঞ নাশ করিতে যাইতাম, তখন তিনি যেরূপ বাণ ক্ষেপণ করিতেন, তাহাতে আমরা অন্ধকার দেখিয়াছিলাম। এখন তাঁহার যৌবনাবস্থা, সুতরাং অধিক বল ও শক্তি হইয়াছে, অতএব আমার দ্বারা এ কর্ম্ম সাধন হইবে না। রাবণ কহিলেন, কি! আমার বাক্য অবহেলা কর, এই কথা বলিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। মারীচ কি করে, রাবণ মারিলেও মরিবে, রাম মারিলেও মরিবে, এই বিবেচনা করিয়া স্বীকার করিল।

তদনন্তর মারীচ পঞ্চবটী কাননে গমন করিল। রাবণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পরে রাম যেস্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সীতাকে লইয়াছিলেন, সেইখানে মারীচ, মায়া বিদ্যা দ্বারা স্বর্ণমৃগ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। সীতা ঐ স্বর্ণমৃগ দর্শনে রামকে কহিলেন, যদি ঐ মৃগ বধ করিয়া আনিতে পার তবে উহার চর্ম্ম বিছাইয়া কুটীর-মধ্যে বসি। রামচন্দ্র সীতার পরিতোষার্থ লক্ষ্মণকে তাঁহার রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া

মায়ামৃগ ধৃত করণার্থ গমন করিলেন। মৃগ তাঁহাকে দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। রাম তাহার পশ্চাদ্‌-গামী হইলেন, কিন্তু কোন প্রকারে ধরিতে না পারিয়া দূর হইতে তাহার প্রতি শর নিক্ষেপ করি-লেন। মায়াবী রাক্ষস, "ভাইরে লক্ষ্মণ মরিলাম," এইরূপ চীৎকার করিয়া ভূমিতে পড়িল। সীতা কুটীর হইতে ঐ শব্দ শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, বুঝি রামের কোন বিপদ ঘটিযাছে, নতুবা লক্ষ্মণকে কেন ডাকি-বেন। ইহা ভাবিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন তুমি যাইয়া দেখ, রামচন্দ্র তোমাকে কেন ডাকেন। বুঝি কোন রাক্ষস তাঁহাকে ধরিয়াছে। লক্ষ্মণ বলিলেন রামকে ধরে ব্রহ্মাণ্ডে এমন কে আছে? যাহাহউক রাম-আমাকে আপনার রক্ষার্থে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমি আপনাকে শূন্য গৃহে একাকিনী রাখিয়া কিরূপে প্রস্থান করি।

সীতা লক্ষ্মণকে ভৎসনা করিয়া বলিলেন, এক ভ্রাতা রামের রাজত্ব লইয়াছে, তুমিও বুঝি আমাকে লইবার মানস করিয়া রামকে রক্ষা করিতে চাহ না? লক্ষ্মণ বলিলেন আমাকে এরূপ ভৎসনা করিবেন না, রামচন্দ্র যদিও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তথাপি তাঁহাকে পিতার স্বরূপ জানি, এবং আপনাকে জননীর তুল্য জ্ঞান কার, অতএব এমত কটু কথা আমাকে আর বলিবেন

না। আমি রামের আজ্ঞাতে এখানে আছি, যদি আপনি আজ্ঞা করেন তবে আমি তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিব না, এখনি যাইব। সীতা বলিলেন তবে, যাইয়া দেখ, রাম তোমাকে কি নিমিত্ত ডাকিলেন। এই কথায় লক্ষ্মণ ধনুষ্কোটি দ্বারা, সীতা যেস্থানে ছিলেন তাহার চতুর্দ্দিকে রেখা দিলেন। তৎপরে সীতাকে বলিলেন আমি রামের উদ্দেশে চলিলাম, আপনি গৃহমধ্যে থাকুন, কদাচ রেখার বহির্গত হইবেন না। সীতা বলিলেন না হইব না, তুমি যাও।

রাবণ এই সকল কথা অন্তর হইতে শুনিলেন। পরে লক্ষ্মণ গমন করিলে, তিনি স্বীয় শকট অন্তরে রাখিয়া ব্রহ্মচারীর বেশে, হস্তে ছাতি ও স্কন্ধে ঝুলি, সীতার কুটীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া সীতার স্থানে ভিক্ষা চাহিলেন। সীতা ভিক্ষুক দেখিয়া কুটীরমধ্যে যে ফল মূলাদি ছিল তাহা লইয়া গণ্ডীর ভিতরে রাখিয়া বলিলেন এই ভিক্ষা লও। ছদ্মবেশী রাবণ রেখাব ভিতর হইতে তাহা লইতে না পারিয়া, সীতাকে বলিলেন তুমি বাহিরে আসিয়া আমাকে ভিক্ষা দাও। সীতা বলিলেন আমি রেখার বাহির হইব না, তুমি এই স্থান হইতে ভিক্ষা তুলিয়া লও। ইহাতে ব্রহ্মচারিবেশী রাবণ কহিলেন আমি তাহা লইব না, তুমি যদি বাহিরে আসিয়া ভিক্ষা না দাও তবে আমি তোমাকে মন্ত্র

করিব। সীতা কি করেন, ব্রহ্মশাপের শঙ্কায় লক্ষ্মণের উপদেশ অবহেলন করিয়া, গণ্ডীর বাহিরে ভিক্ষা দিতে গেলেন। কিন্তু যেমন বাহির হইয়াছেন অমনি রাবণ তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। সীতা বলিলেন অরে পাপিষ্ঠ! তোর এই কর্ম্ম, তুই আমার অঙ্গস্পর্শ করিস্ না। রাবণ বলিলেন সীতে তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই, আমি দশমুণ্ড রাবণ, আমার প্রতি তুমি অনুকূল হও, আমি তোমাকে আমার রাজ্যেশ্বরী করিব, এবং ইন্দ্রের অমরাবতী অপেক্ষা আমার যে উত্তম পুরী তথায় তোমাকে রাখিব। আমার যত রাণী আছে সকলে তোমার দাসী হইয়া সেবা করিবে, তুমি তাহাদিগকে অন্ন দান করিলে তাহারা আহার করিবে। আর আমি তোমাকে স্বর্ণ, মণি, মাণিক্যে ভূষিত করিব। অতএব বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কেন রামের সেবাতে জন্ম বিফল করিতেছ! আইস আমার রাজ্যেশ্বরী হইয়া পরম সুখে থাকিবে।

রাবণের এই কথা শুনিয়া সীতা বলিলেন, অরে দুরাত্মন, তুই রামের নিন্দা কেন করিতেছিস্! রাম কেশরী, তুই শৃগাল। রাম তোকে সবংশে ধ্বংস করিবেন। এই কথায় রাবণ আপন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দন্ত কড়মড়ি-পূর্ব্বক ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে সীতা অত্যন্ত ভীতা হইয়া কোথায় রাম!

কোথায় লক্ষ্মণ! এই বলিয়া রোদন করিতে লাগি- লেন। অনন্তর রাবণ তাঁহাকে রথের উপর তুলিয়া লইয়া লঙ্কাভিমুখে গমন করিলেন। সীতা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে রাম লক্ষ্মণকে ডাকিতে লাগি- লেন, মনে মনে কহিলেন হায়! কেন লক্ষ্মণকে পাঠা- ইলাম, তিনি নিকটে থাকিলে কখন এরূপ দুর্গতি হইত না। অনন্তর, রাম লক্ষ্মণ তাঁহার উদ্দেশ পাইতে পারেন এই অভিপ্রায়ে স্থানে স্থানে অঙ্গাভরণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

রাবণ সতীর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহাকে একবারে সাগরপারে লঙ্কায় লইয়া গেলেন। তথায় যাইয়া তাঁহাকে নানারূপ বুঝাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার চরণ ধারণ-পূর্ব্বক বলিলেন, হে দেবি! তুমি মিছা কেন বিলাপ কর, আমি লঙ্কার ঈশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বরী হইয়া আমার অন্তঃপুরে পরম সুখে বাস কর। সীতা বলিলেন, তুমি এ দুরাশা পরিত্যাগ কর, আমার প্রভু রাম, তিনি আমার পতি, এবং তিনি আমার গতি, তাঁহা ভিন্ন আমি আর কাহাকেও জানি না, তুমি আমাকে হরণ করিয়াছ, তজ্জন্য রাম তোমাকে সবংশে বিনাশ করিবেন।

এই কথা শুনিয়া রাবণ তখন নিরস্ত হইলেন, কিন্তু রাম সীতা অন্বেষণে অবশ্য আসিবেন ইহা দৃঢ় জানিয়া

স্থানে স্থানে রাক্ষসদিগকে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন, এবং সীতাকে অন্তঃপুরে না রাখিয়া, অশোক বনে রাখিলেন। তথায় নানামূর্ত্তিধারিণী ভয়ঙ্করী নিশাচরীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিল, এবং সর্ব্বদা এই মন্ত্রণা দিতে লাগিল, তুমি রাবণের অনুগত হও। ইহাতে যদি সীতা অপ্রিয় উত্তর করিতেন তবে তাহারা তাঁহাকে ভৎর্সনা এবং কেহ কেহ প্রহার করিতেও উঠিত। বিশেষতঃ তাঁহার প্রতি শূর্পণখার অত্যন্ত আক্রোশ, সে সর্ব্বদা তাঁহাকে দন্ত কড়মড়ি করিত, ও প্রহার করিতে চাহিত, কেবল রাবণের ভয়ে পারিত না। এই প্রকার দুরবস্থায় সীতা অশোক বনে বৃক্ষের মূলে থাকিলেন, কদাচিৎ ফলাহার করিতেন, এবং মলিন বেশে ও মুক্ত কেশে রাম স্মরণ করিয়া অহরহঃ রোদন করিতেন।

এদিকে যখন রাম মৃগ বিনাশ করিয়া কুটীরে প্রত্যাগমন করেন তখন পথিমধ্যে লক্ষ্মণকে দেখিয়া এই বলিয়া অনুযোগ করিলেন, ভাই তুমি সীতাকে একাকিনী রাখিয়া কেন আসিলে। লক্ষ্মণ কহিলেন, সীতা আপনকার চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া আমাকে আপনার অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। আমি তাঁহাকে একাকিনী রাখিয়া আসিতে চাহি নাই, কিন্তু তিনি আমাকে অনেক ভৎর্সনা করিলেন, এই জন্য আসিয়াছি। তদ-

নন্তর দুই ভ্রাতা গৃহে চলিলেন। গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সীতা নাই, শূন্য গৃহ পড়িয়া আছে। ইহাতে উভয়ের মস্তকে একবারে বজ্রাঘাত হইল। রাম, শূন্য গৃহ দেখিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তাহার পর সীতে সীতে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, এবং সকল বন ও নদীতীর ও গিরিগুহা অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু কোন স্থানে সীতাকে পাইলেন না। তাহাতে মহা ব্যাকুল হইয়া পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দুই ভ্রাতা আহার নিদ্রা ও আলস্য ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে সীতার অন্বেষণে গমন করিলেন। কতক দূরে গমন করিয়া কুশবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কাননমধ্যে সীতার এক খানা অলঙ্কার পড়িয়া আছে, আরও কতক দূরে যাইয়া তাঁহার নিক্ষিপ্ত বসন দৃষ্টি করিলেন।

এইরূপে দণ্ডকারণ্য ছাড়াইয়া পম্পা নদীর তটে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে নল, নীল, সুগ্রীব, সুষেণ ও হনূমানের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজা ছিলেন, পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বালি রাজা তাঁহাকে রাজ্য ও দার চ্যুত করিয়া আপনি রাজা হয়েন। তাহাতে তিনি নিরুপায় হইয়া ঐ পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন রাবণ এক নারীকে রথারোহণ করাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন, এবং ঐ নারীর নিক্ষিপ্ত

একখান অলঙ্কার তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ অলঙ্কার দেখাইলে রাম জানিলেন যে লঙ্কাধিপতি তাঁহার রমণী হরণ করিয়াছেন। অতএব সুগ্রীবকে আপনার সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। সুগ্রীব বলিলেন তুমি যেমন বিপদগ্রস্ত আমিও তদ্রূপ, অতএব তুমি আমার রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির সহায়তা কর, আমিও তোমার সীতা উদ্ধারের উপায় করিব। রাম তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং অগ্নি সাক্ষী করিয়া উভয়ে সত্য করিলেন। তদনন্তর রাম বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করিলেন। তাহার পর বর্ষাকাল আগত হওয়াতে চারি মাস সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইল। তদনন্তর সুগ্রীব ও দক্ষিণদেশস্থ আর আর ভূপতিগণ আপন আপন সৈন্য সমভিব্যাহারে সাগরতটে গমন করিয়া তথা হইতে হনুমানকে সীতার উদ্দেশ জন্য লঙ্কায় প্রেরণ করিলেন।

হনুমান সমুদ্র পার হইয়া কয়েক দিন পরে লঙ্কায় উপস্থিত হইল। তাহার পর রাক্ষসদিগের শঙ্কায় দিবসে গোপন ভাবে থাকিয়া, রজনীযোগে ছদ্মবেশে রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এক ঘরে কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যাইতেছেন, আর এক ঘরে রাবণ এক পরম রূপবতী নারী সমভিব্যাহারে মণিময় পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত আছেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে শত শত অপূর্ব্ব

বেশভূষা ধারিণী কামিনীগণ নানাবিধ যন্ত্র লইয়া গান বাদ্য করিতেছে। হনুমান রাবণের ক্রোড়ে নারী দেখিয়া বিবেচনা করিল, বুঝি ইনিই সীতা হইবেন, কিন্তু তিনি মন্দোদরী। হনুমান এই প্রকার আর আর ঘরে আর আর অনেক নারী দেখিল, এবং স্বর্ণ মণি মাণিক্যে রাবণের পুরী ইন্দ্রপুরী হইতে অধিক সুশোভিত দেখিল। কিন্তু কোন স্থানে সীতা দেবীর অন্বেষণ পাইল না। তাহাতে প্রাচীরে উঠিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিল, রাবণের পুরীর সংলগ্ন, নানাজাতীয় পুষ্পে সুগন্ধিত নানাবিধ মধুরালাপী ও অতি সুস্বর গানকারী পক্ষীতে পরিপূর্ণ এবং স্থানে স্থানে স্বর্ণ নাট্যশালা সুশোভিত এক রম্য কাননে, ভয়ানকমূর্ত্তি কতকগুলা রাক্ষসী ভ্রমণ ও কলরব করিতেছে। তাহাতে হনুমান বিবেচনা করিল এই খানে সীতা দেবী থাকিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিল, চেটীগণবেষ্টিত এক যুবতী নারী মলিন বসন পরিধানা ম্লানবদনা হইয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া রাম রাম বলিয়া রোদন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া হনুমানের মহাশোক জন্মিল, এক এক বার মনে করিল রাক্ষসীগণকে বিনাশ করিয়া ইঁহাকে লইয়া যাই।

হনুমান এই সকল ভাবনা করিতেছে এমন সময়ে রাবণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখিলেন সুন্দর জ্যোৎস্না হইয়াছে, এবং সুশীতল মন্দ মন্দ বায়ু সঞ্চার হইতেছে। তাহাতে চঞ্চলচিত্ত হইয়া রাবণ মন্দোদরী প্রভৃতি দশ শত কামিনী সমভিব্যাহারে সীতার সমীপে অশোক বনে গমন করিলেন। হনুমান তাহা দেখিয়া, সীতা যে বৃক্ষের মূলে বসিয়াছিলেন সেই বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত ভাবে থাকিল। সীতা রাবণকে দেখিয়া ভয়ে প্রকম্পিতা হইলেন, এবং বস্ত্রে অঙ্গাচ্ছাদন করিয়া বক্ষঃ স্থলে হস্তাবরণ করিলেন। রাবণ বলিলেন, সীতে, এই লঙ্কা দেবতার অগম্য, তোমার শঙ্কা কি। রামের সেবাতে তোমার যৌবন বৃথা যাইতেছিল, এখন তাহাকে কেন ভাবিতেছ, সে নর ভিন্ন অমর নহে, এত দিনে কোন রাক্ষসের উদরে গিয়াছে। অতএব তাহার চিন্তায় শরীরকে আর শীর্ণ করিও না। দেখ আমি লঙ্কার একেশ্বর, আমার ভয়ে দেব দানব ও গন্ধর্ব্ব সশঙ্কিত। তুমি আমার ঈশ্বরী হইয়া সুখে কালযাপন কর। সীতা একথায় কোন উত্তর করিলেন না। রাবণ বলিলেন আমি তোমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি এই জন্য ক্রোধ করিতে পার বটে, কিন্তু রাক্ষসজাতি বলে ও ছলে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে, ইহা আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম, অতএব তজ্জন্য আমার প্রতি অকৃপা করিও না।

ইহা বলিয়া দশানন আপন মস্তক সীতার চরণ-তলে দিয়া কহিলেন দেখ, রাবণের যে মুণ্ড কখন কাহার নিকটে নত হয় নাই তাহা তোমার পদানত, অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও, আর যাতনা দিও না। রাবণ সীতাব সম্মুখে নত হইলে সীতা ফিরিয়া বসিলেন। তাহার পব রাবণকে বলিলেন তুমি যদি আপন মঙ্গল অভিলাষ কর তবে আমাকে বামহস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রণয় কর, নতুবা তিনি তোমাকে সবংশে ধ্বংস ও লঙ্কাপুবী ছারখার করিবেন। আর শুন, গুরুজন ব্যতীত কেহ কাহার পদানত হয় না। অতএব যখন তুমি আমার চরণ ধাবণ করিলে তখন আমাকে কোন কুকথা বলিও না, আমি রামের রমণী এবং রাম বিনা আর কাহাকে জানি না ও জানিব না।

এই কথায় রাবণ ক্রোধাভাসে সীতাকে বলিলেন আমি তোমাকে দশ মাস এখানে আনয়ন করিযাছি, আরও দুই মাস তোমাকে কিছু বলিব না, তাহার পর যাহা হইবার তাহা হইবে। সীতা বলিলেন তোমার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। ইহা বলিয়া তাঁহাকে অনেক মিষ্ট ভৎ'সনা করিলেন। রাবণ তাহাতে জ্বলদগ্নিপ্রায় হইয়া সীতাকে বিনাশার্থ খড়্গোত্তোলন করিলেন। তাহাতে রাবণের সমভিব্যাহা-

বিণী কামিনীগণ সীতাকে ইঙ্গিত করিযা বলিল রাবণ যাহা বলেন তাহাতে সম্মতা হও। সীতা তাহা না শুনিযা রাবণকে পুনঃ পুনঃ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। মদনোন্মত্ত রাবণ তখন খড়্গ নিক্ষেপ করিযা, সীতার অঙ্গে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মন্দোদরী রাণী বলিলেন ইহা করিলে নলকূবরের শাপ তোমাতে ফলিবে, তুমি মরিবে।

এই কথায রাবণ ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু প্রহরী রাক্ষসীদিগকে বলিযা গেলেন, সীতাকে ভাল করিযা বুঝাও। রাক্ষসীগণ তাঁহাকে নানামত বুঝাইতে লাগিল, তাহাতে কেহ খড়্গ কেহ দণ্ড লইযা তাঁহাকে প্রহার করিতে উঠিল, আর বলিল তোর জন্য, আমরা এত ক্লেশ পাইতেছি, তোকে অদ্যই বিনাশ করিব। অধিকন্তু তাঁহার প্রতি শূর্পণখার অত্যন্ত আক্রোশ ছিল, সে বলিল এই বেটীর জন্য আমার নাক কাণ কাটা গিযাছে, বেটীর গলায নখ দিযা ছিঁড়িযা ফেলি, তাহা হইলে আমার খেদ যায়।

নিশাচরীগণ এইরূপ কটু কাটব্য কহিল, সীতা মনে মনে রাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে ত্রিজটা নাম্নী এক রাক্ষসী কোন পরামর্শ জন্য অন্য রাক্ষসীদিগকে ডাকিল। তাহাতে তাহারা সীতার নিকট হইতে অন্তর হইলে, হনুমান বৃক্ষ হইতে অব-

রোহণ পূর্ব্বক সীতার সন্নিকটে গিয়া আপনার পরিচয় দিল। অধিকন্তু, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত রাম যাহা করিতে ছিলেন তাহা সকল কহিল। সীতা এই সকল সংবাদ শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিতা হইলেন এবং হনু-মানকে যথেষ্ট আদর করিলেন। তদনন্তর হনুমানকে এই কথা বলিয়া বিদায় করিলেন আমি কেবল রাম স্মরণ করিয়া দশ মাস পর্য্যন্ত এই অবস্থায় আছি। তিনি যদি আর দুই মাসের মধ্যে আমাকে উদ্ধার করেন তবে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিব, নতুবা এ জন্মের মত তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না। হনুমান বলিল জননি, আর দুই মাসের অপেক্ষায় কি প্রয়োজন, তুমি আমাকে আজ্ঞা কর আমি এই ক্ষণেই তোমাকে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া এখান হইতে লইয়া যাই। সীতা কহিলেন বৎস তাহা কর্ত্তব্য নহে, তাহা হইলে রাব-ণের ন্যায় অপহরণের অপবাদ হইবে, রাবণকে বধ করিয়া আমাকে উদ্ধার কর, তাহা হইলে বীরত্ব প্রকাশ ও সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়।

ইহা শুনিয়া হনুমান সীতার স্থানে বিদায় হইল। পথে যাইতে রাক্ষসগণ তাহাকে ধরিল, কিন্তু সংহারে সমর্থ না হইয়া তাহার লাঙ্গূলে ও মুখে অগ্নি দিয়া ছাড়িয়া দিল। ইহাতে আপনাদেরই মন্দ করিল। কেননা প্রজ্বলিত লাঙ্গূল সহিত হনুমান তাবৎ ঘরে

উঠিয়া অনেক ঘর দগ্ধ করিল, সুতরাং তাহাতে লঙ্কা শ্রীভ্রষ্ট হইল। অনন্তর হনুমান সীতার সংবাদ লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগত হইলে, রাম লক্ষ্মণ সুস্থির হইলেন, এবং সীতা উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হনুমান লঙ্কা হইতে গমন করিলে পর, রাক্ষসগণের মহা শঙ্কা হইল। বিচক্ষণ বিভীষণ কৃতাঞ্জলি হইয়া রাবণকে কহিলেন সীতার জন্যে রাজ্যে মহা বিপদ উপস্থিত, অতএব রাজ্যনাশের মূল এই নারীকে কেন রাখ, ইহাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলে রাজ্যের মঙ্গল, নতুবা আমাদিগকে সবংশে নষ্ট হইতে হইবেক। লঙ্কেশ্বর এই কথায় কুপিত হইয়া বিভীষণকে পদাঘাত করিলেন। বিভীষণ এই অপমানে লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া রামের শরণ লই-লেন। রাম বিভীষণের স্থানে অনেক সন্ধান পাইলেন, এবং তাঁহাকে এই বলিয়া অশ্বাস দিলেন যে, রাবণকে বধ করিয়া তোমাকে লঙ্কাধিপতি করিব।

অনন্তর বানরগণ জলধি পারে গমনের নিমিত্ত, রামের আজ্ঞাতে প্রস্তরময় এক সেতু নির্ম্মাণ করিল। ঐ সেতু সেতুবন্ধ-রামেশ্বর নামে অদ্যাপি খ্যাত আছে। উক্ত সেতু দ্বারা লবণ সমুদ্র পার হইয়া, রাম লক্ষ্মণ সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন।

রাম সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবেশ করিলে, রাবণ রাজা পুরীর দ্বার রুদ্ধ করিলেন। পরে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সবান্ধবে সসজ্জ হইয়া সংগ্রামে আসিলেন। রাবণ যে প্রকারে সজ্জা করিয়া আসিলেন তাহাতে রাম দেখিলেন তাহার ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই। সে যাহা হউক, রাবণ রণস্থলে আগত হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তদনন্তর রাম ও রাবণে সম্মুখ-যুদ্ধ হইয়া, রাম রাবণের মস্তকের রত্নমুকুট চূর্ণ করিলেন। তাহাতে রাবণ লজ্জিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া স্বপুরী প্রবেশ করিলেন। রাম তখন অঙ্গদকে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাঠাইলেন। অঙ্গদ যাইয়া রাবণকে অনেক ভর্ৎসনা করিল। লঙ্কেশ্বর লজ্জিত হইয়া অনেক অনেক সেনাপতি পাঠাইলেন। অনেক যুদ্ধ হইল, এই সকল যুদ্ধে অনেক রাক্ষস হত হইল। তৎপরে রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন, এবং রাম লক্ষ্মণকে নাগ পাশে বন্ধন করিলেন। রাম লক্ষ্মণ বহুকষ্টে এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন। পরে মহাপাশ ও মহোদর ও রাবণের আর চারি পুত্র যুদ্ধে আসিলেন। ইহারাও ক্রমে ক্রমে সসৈন্য সকলে হত হইলেন।

রাবণ রাজা তাহাদের বিনাশ সংবাদে ইন্দ্রজিৎকে সুসজ্জিত করিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামে প্রেরণ করিলেন।

ইন্দ্রজিৎ অতিশয় ধূম ধামে আসিলেন, এবং ঘোরতব যুদ্ধাবম্ভ করিয়া রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি তাবৎ সেনাপতিকে মুগ্ধ করিলেন। বাবণ এই সংবাদে অত্যন্ত উল্লাসিত হইলেন, এবং ইন্দ্রজিৎকে বহু সমাদর করিলেন।

এই যুদ্ধে বামেব অনেক সেনা আহত হইয়াছিল। বিভীষণ এক বৃক্ষমূল আনাইয়া তাহাদিগকে তাহাব আঘ্রাণ দিলেন, তাহাতে ঐ সকল সেনা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার রণসজ্জা করিল। ইহাতে রাবণ মহা শঙ্কিত হইয়া কুম্ভকর্ণেব নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। কুম্ভকর্ণ একাল পর্য্যন্ত নিদ্রায় ছিলেন, যুদ্ধেব বৃত্তান্ত কিছু জানিতেন না। পবে রাবণেব আজ্ঞায় সসৈন্যে সংগ্রামে আসিযা রামেব সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং এক এক বাব দশ বিশ জন সেনাকে ধরিয়া কাহাকে গ্রাস করিয়া ও কাহাকে আছাড় মারিয়া নষ্ট করিতে লাগিলেন। কুম্ভকর্ণের যুদ্ধাড়ম্বর ও প্রকাণ্ড আকার দেখিয়া, বাম অতিশয় ভীত হইলেন, মনে মনে কহিলেন যদি লঙ্কা হইতে এমত মহা মহা বীর সকল যুদ্ধ করিতে আইসে, তবে আমার সীতা উদ্ধারের আকিঞ্চন বৃথা। তৎপরে ধনুঃশর হস্তে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। কুম্ভকর্ণ মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস কবিতে আসিলেন। কিন্তু রাম লক্ষ্য শুদ্ধ করিয়া তাহার প্রতি এমত শর নিক্ষেপ করিলেন যে তাহাতে

একবারে কুম্ভকর্ণের প্রাণ বিয়োগ হইল, তাহাতে সকল সৈন্য পলায়ন করিল।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে রাবণের একবারে উদ্যমভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন যে অনেক সৈন্য মারা পড়িল এবং রামের সেনাগণ লঙ্কাতে গৃহাদি দগ্ধ করিয়া স্বর্ণ লঙ্কা বিবর্ণ করিতেছে। ইহাতে আরও মনস্তাপ পাইয়া স্বীয় পুত্র মকরাক্ষকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। মকরাক্ষও যুদ্ধে হত হইলেন। পরে কুম্ভ নিকুম্ভ নামে কুম্ভকর্ণের দুই পুত্র যুদ্ধে আসিলেন। তাহারা যদিও পিতার তুল্য মহাবীর, কিন্তু সুগ্রীবের হস্তে নিহত হইলেন। এই সঙ্গে অনেক রাক্ষসও হত হইল। তখন ইন্দ্রজিৎ ভিন্ন রাবণের আর সেনাপতি ছিল না, অতএব রাবণ ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন তুমি শত্রু বিনাশ করিয়া আইস। ইন্দ্রজিৎ পিত্রাজ্ঞায় যুদ্ধে আসিয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পরিশেষে পরাস্ত হইয়া লঙ্কার মধ্যে পলায়ন করিয়া, রাম বিনাশার্থে যজ্ঞারম্ভ করিলেন। বিভীষণ তাহা জানিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞারম্ভ করিয়াছে, যদি এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়, তবে তাহাকে বধ করা কঠিন হইবে কিন্তু যজ্ঞ নষ্ট করিতে পারিলে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। এই কথায় হনুমান যজ্ঞ নষ্ট করিল। তৎপরে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিলেন।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে রাবণ অতিশয় কুপিত হইলেন, এবং সসৈন্যে স্বয়ং সংগ্রামে আসিলেন। রাবণ আগত হইলে লক্ষ্মণ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, লক্ষ্মণের সঙ্গে বিভীষণ গমন করিলেন। রাবণ বিভীষণকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন এই পাপাত্মা যত অমঙ্গলের মূল, ইহা হইতেই আমার বংশ ধ্বংস হইল, অতএব ইহাকে অগ্রে নিপাত করিতে হইযাছে। এই বলিয়া লক্ষ্মণের প্রতি শর ক্ষেপণ না করিয়া বিভীষণের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ঐ সকল বাণ স্বীয বাণ দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে লঙ্কাধিপতি বিভীষণকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিলেন। লক্ষ্মণ অসাধারণ সাহস পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাবণ অগ্নিবাণ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল এমত ভেদ করিলেন যে, তাহাতে তাঁহার মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। তদবলোকনে রাম ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম রাবণের ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। রাবণ অতিশয় বল ও সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন, এবং রামকে এক এক বার অস্থির করিলেন, অবশেষে রাম জয়ী হইযা রাবণকে বধ করিলেন।

রাবণ বধ হইলে পর, রাক্ষসগণ পলায়ন করিল।

তখন রাম পূর্ব্ব অঙ্গীকারানুসারে বিভীষণকে লঙ্কাধিপতি করিলেন এবং মন্দোদরী বিভীষণের রাণী হইলেন।

তদনন্তর হনুমান শুভ সংবাদ লইয়া অশোক বনে সীতার সন্নিধানে গমন করিল। সীতা তখন জানেন না যে রাবণ বধ হইয়াছে। হনুমান্ ঐ সংবাদ আনিলে সীতা অত্যন্ত আনন্দে ক্ষণকাল বাক্যশক্তি রহিত হইয়া থাকিলেন। হনুমান কহিল জননি, আমি এমত শুভ সংবাদ আনিলাম, আপনি কোন উত্তর করিলেন না, ইহার কারণ কি? সীতা বলিলেন তুমি যে সংবাদ আনিয়াছ তাহাতে মনি মানিক্য অর্থ কিছু দিয়া তোমার উচিত পুরস্কার করিতে পারি না। হনুমান বলিল আমার অর্থ আভরণের প্রয়োজন নাই। যদি আমাকে প্রকৃত রূপে পরিতুষ্ট করিতে বাসনা করেন তবে আজ্ঞা করুন, এই যে সকল রাক্ষসীরা আপনকার অঙ্গে হস্তোত্তোলন করিয়াছিল, বালুকাতে ইহাদের মুখ ঘর্ষণ-পূর্ব্বক সাগর-তটে প্রস্তরোপরি ইহাদিগকে আছাড়িয়া ইহাদিগের মস্তক চূর্ণ করি। এই কথা বলাতে নিশাচরীগণ রোদন করিতে লাগিল। সীতা কহিলেন বৎস ইহারা আমাকে ক্লেশ দিয়াছে সত্য, কিন্তু আপন ইচ্ছাতে দেয় নাই, রাবণের আজ্ঞাতে দিয়াছে, অতএব ইহাদিগের অপরাধ নাই,

তজ্জন্য দণ্ড অনুচিত। হনুমান এই কথা শুনিয়া সীতাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

তদনন্তর রামের নিকট আসিয়া সংবাদ কহিলে, রাম সীতাকে আনয়নার্থ বিভীষণকে প্রেরণ করিলেন। বিভীষণ সোণার চতুর্দ্দোল লইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিতে গেলেন, এবং তাঁহার কন্যাগণ নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য আনিয়া সীতাকে স্নান করাইয়া অপূর্ব্ব বসন ভূষণ পরিধান করাইল। তৎপরে বিভীষণ তাঁহাকে চতুর্দ্দোলে আরোহণ করাইয়া মহা সমারোহ পুরঃসর রামের নিকটে লইয়া চলিলেন। গমন কালে যাবতীয় নিশাচরনারী তাঁহাকে দেখিবার জন্য বাহির হইল, এবং আপন আপন দুঃখ স্মরণ পূর্ব্বক কহিল হে সুন্দরি, তুমি এইক্ষণে স্বামিসম্ভাষণে চলিযাছ, কিন্তু তোমার জন্য আমরা কেহ পতি, কেহ পুত্র, কেহ ভ্রাতা, কেহ জামাতা ও আপন জ্ঞাতি কুটুম্ব হারাইলাম। তোমার আগমনে স্বর্ণপুরী লঙ্কা ছারখার হইল। এইরূপ অনেক খেদ করিতে লাগিল।

পরে সীতার চতুর্দ্দোল রামের কটকের মধ্যে আসিলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য মহা জনতা হইল। রাম লক্ষ্মণ ও আর আর বন্ধুগণ সকলে একত্র সভা করিয়া বসিয়াছিলেন। সীতা, রামের সম্মুখে আনীতা হইয়া রামকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সভামধ্যে তাঁহার

সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। সীতাকে দেখিয়া রামের আনন্দাশ্রু পতন হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার হর্ষে বিষাদ জন্মিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন সীতা দশ মাস আমার নিকটে ছিলেন না, রাবণ ইহাকে হরণ করিয়া লঙ্কাতে রাখিয়াছিলেন। এখানে সীতা কি করিযাছেন তাহা কে জানে, অতএব ইহাকে পুনর্গ্রহণ করা হইতে পারে না। ইহা বিবেচনা করিয়া রাম তাঁহাকে কহিলেন সীতে, এই এই কারণে আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি না, অতএব তুমি সুগ্রীব রাজা অথবা লঙ্কাধিপতি বিভীষণ যাহার নিকট বাসনা হয় বাস কর, অথবা স্বদেশে ভরত ও শত্রুঘ্ন আছেন তাঁহাদের নিকট যাও, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম।

এই কথায় সীতা রোদন করিতে করিতে কহিলেন হে প্রাণেশ্বর, হে সর্ব্বেশ্বর, আপনি আমাকে কি অপ-রাধে পরিত্যাগ করেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আপনি বাল্যকাল অবধি আমার রীতি প্রকৃতি উত্তমরূপ জানেন। আমি পর পুরুষ কেমন তাহা কখন জানি না। রাবণ আমাকে হরণ করিয়া আনিয়া ছিল ইহাতেই কি আমি অপরাধিনী হইলাম, আমি নিমেষের জন্য অন্য পুরুষকে মনে স্থান দান করি নাই। দিবারাত্র কেবল তোমার চরণ স্মরণ করিয়াছি।

আমি যে অবস্থাতে ছিলাম, হনুমান তাহা বলিয়া থাকিবে। তাহা শুনিয়াও যদি এমন মনস্থ ছিল আমাকে বর্জন করিবেন তবে পূর্ব্বে কেন জানান নাই, তাহা জানিলে আমি বিষ পান অথবা অগ্নি প্রবেশ করিতাম। আর যদি আমাকে অসতী জানিয়াছিলেন তবে সাগর বন্ধন ও রাবণের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আমাকে উদ্ধার করিবার কি প্রয়োজন ছিল। আপনি নিষ্প্রয়োজনে কেন এ সকল ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। আমি নিরপরাধিনী, আপনি অকারণে আমাকে বর্জ্জন করিতেছেন, এবং ইহার উহার সন্নিধানে যাইতে আজ্ঞা করিতেছেন, আমার এত অপমান কেন করেন। আমার প্রাণে এ অপমান সহ্য হয় না। আমার জন্য যদি আপনকার লজ্জা হইয়া থাকে তবে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া দেউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই অপমান সম্বরণ করি।

এই সকল কথা বলিলেও রামের কিছুমাত্র দয়া হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করাইলেন। সীতা সেই কুণ্ড শতবার প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিপ্রবেশে প্রস্তুত হইয়া, অগ্নিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "হে পাবক, হে পাপনাশক, তুমি পাপ পুণ্য সকল দেখিতে পাও; আমি যদি সতী হই তবে তোমার নিকটে অব্যাহতি পাইব। আর যদি আমার শরীরে কিছুমাত্র

পাপ থাকে তুমি আমাকে এক্ষণেই ভস্মসাৎ করিবে।” ইহা বলিয়া সীতা দেবী জ্বলন্ত অনলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদ্দৃষ্টে তাবৎ লোক বিস্ময়াপন্ন হইল। রাম মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায় যে সীতাকে লইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিলাম, যাহার জন্য রাবণের সহিত এত যুদ্ধ করিলাম, শেষে সেই সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, হায় কি হইল, ইহার অপেক্ষা আর অধিক কি দুঃখ আছে। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই প্রকার সকলে অনুতাপ করিতেছে, হঠাৎ দৃষ্ট হইল সীতা কুণ্ডের মধ্যে বসিয়া আছেন, তাঁহার শরীরে অগ্নির আভাও লাগে নাই, এবং তাঁহার মস্তকের পঞ্চ পুষ্প যেমন প্রফুল্ল ছিল সেইরূপ রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাবৎ লোক বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন রাম সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া আপন সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন।

এই প্রকারে সীতার উদ্ধার ও তাঁহার সতীত্বের পরীক্ষা করণানন্তর চতুর্দ্দশ বৎসরের পর রাম স্বদেশে গমনাভিলাষী হইয়া, বিভীষণের স্থানে বিদায় লইলেন এবং সৈন্য সামন্ত ও যে সকল রাজ্যাধিপতিরা তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন তৎসমভিব্যাহারে রথারোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইয়া অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। গমন করিতে করিতে জনস্থান প্রভৃতি যে যে স্থানে

যাহা হইয়াছিল একে একে তৎসমুদয় সীতাকে দেখাইতে লাগিলেন। এই ভাবে পঞ্চবটী বন ও চিত্রকূট পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া শ্রবণ করিলেন যে, ভরত রাজসিংহাসনে তাঁহার পাদুকা সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে ছত্র ধরিয়া তাঁহার প্রতিনিধির স্বরূপ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, যদবধি রাম বনবাস করিয়াছেন তদবধি তিনি ঐশ্বর্য্যসুখে বিমুখ হইয়া বল্কল পরিধান, জটা ধারণ ও ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক কোন রূপে প্রাণধারণ করিয়া আছেন।

এই সকল কথা শ্রবণানন্তর রাম অযোধ্যা নগরে দূত প্রেরণ করিলেন, এবং তৎপশ্চাৎ আপনিও সসৈন্যে-যাত্রা করিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন তাঁহার আগমন সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, অযোধ্যা-নগরস্থ তাবৎ প্রজা সমভিব্যাহারে তাঁহাকে লইতে আসিলেন। চারি ভ্রাতার পরস্পর সন্দর্শনে যে আনন্দোদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত। রাম লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং স্ব স্ব মাতা ও বিমাতাকে প্রণাম করিলেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রা সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া, তাঁহার দুঃখেতে যেমন দুঃখিতা ছিলেন তাঁহার প্রত্যাগমনে তদ্রূপ আনন্দিতা হইলেন। রামের আগমনে অযোধ্যা নগরে মহা

আনন্দ পড়িল, এবং ঘরে ঘরে সকলে মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। এই প্রকার পুনর্ম্মিলনের পর চারি ভ্রাতা চতুর্দ্দশ বৎসরের জটা ও বল্‌কল পরিত্যাগ করিয়া উত্তম পরিচ্ছদ পবিধান করিলেন। তৎপরে রাম রাজা হইলেন, প্রজাগণ তাঁহার রাজ্যে পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে সীতা অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। পরে তাঁহার পঞ্চ মাসের গর্ভ হইলে, রাম তাঁহাকে এক দিবস কহিলেন, সীতে, তুমি গর্ভবতী হইয়াছ, এখন তোমার কি আহার করিবার বাসনা হয়। সীতা উত্তর করিলেন যদি আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসিলেন তবে আপনার স্থানে এক নিবেদন করি, আমার কোন দ্রব্য আহার করিতে অভিলাষ নাই, কিন্তু বনবাস কালে যখন যমুনায় স্নান করিতে যাইতাম তখন এই মানস করিয়াছিলাম, স্বদেশাগমনের পর তপোবনে মুনিপত্নী গণের সহিত সাক্ষাৎ করিব। অতএব যদি আপনার অনুমতি হয় তবে আমি যমুনাকূলবর্ত্তী তপোবনে গমন করি। রাম বলিলেন তাহার বাধা কি, কল্য তপোবনে গমন করিবে।

ইহা বলিয়া রাম রাজসভায় গমন করিলেন। তখন সভাসদ্‌গণ সীতাহরণের কথা উল্লেখ করিয়া এইরূপ কহিতেছিলেন, যে রাবণ সীতাকে দশ মাস আপন

পুরীতে লইয়া রাখিয়াছিলেন তথাপি রাম তাঁহার সঙ্গে সহবাস করিতেছেন, অতি আশ্চর্য্য। রাম এই সকল কথা শুনিতে না পাইয়া, সভায় অধ্যাসীন হইয়া সভাসদ্গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সভ্যগণ, পিতার রাজ্য অতি ধর্ম্মের রাজ্য ছিল, আমার রাজ্যে প্রজা-গণ কেমন আছে বল। এই প্রশ্নে সকল সভ্য নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। পরে ভদ্র নামে এক অমাত্য গাত্রো-খান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, ধর্ম্মাবতার, আমি বহুকালাবধি আপনকার প্রধান মন্ত্রী এবং চির-কাল আপনার রাজ্যের কুশল আকাঙ্ক্ষা করি, আমি দেখিয়াছি রাজা দশরথের রাজত্ব কালে প্রজাগণ স্বর্ণ-পাত্রে ভোজন করিয়া নিত্য নিত্য ঐ স্বর্ণপাত্র পরি-ত্যাগ করিত। এক্ষণে তাহারা এক এক দিন অন্তর পাত্র পরিত্যাগ করে। ইহাতে বোধ হয়, রাজ্য ক্রমে নির্দ্ধন হইতেছে। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার কারণ কি। রাজা পুণ্যবান হইলে প্রজারা সুখে থাকে, রাজা অধার্ম্মিক হইলে প্রজার সুখ থাকে না। আমার রাজ্যে কি অবিচার আছে যে প্রজারা তাহাতে অসুখী হইয়াছে। ভদ্র বলিলেন প্রভো, আমি কিঙ্কর, প্রভুর সাক্ষাতে সকল কথা বলিতে সাহস হয় না। রাম বলিলেন, শঙ্কা কি, তুমি যাহা জান নির্ভয়ে বল। ভদ্র উত্তর করিলেন তবে অপরাধ মার্জ্জনা হউক,

লোকে এই কথা বলিয়া থাকে যে, যে সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া রাখিয়াছিল তাহাকে আপনি কি প্রকারে পুনর্গ্রহণ করিলেন। এ কথা কেহ আপনাকে সাহস করিয়া বলিতে পারে না, কিন্তু ইহাতেই আপনকার অখ্যাতি।

রাম এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং তাহা মনোমধ্যে চিন্তা করিতে করিতে স্নানার্থ গমন করিয়া দেখিলেন, পুষ্করিণীর এক পার্শ্বে দুই জন রজক বস্ত্র ধৌত করিতে কবিতে দ্বন্দ্ব করিতেছে, ঐ দুই জনের মধ্যে এক জন শ্বশুর, দ্বিতীয় জন জামাতা। শ্বশুর বলিতেছে দেখ বাপু, তোমার পিতা ধনে মানে কুলে শীলে বড় বিখ্যাত ছিলেন, এই কারণ আমি তোমাকে কন্যাদান করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি কন্যাকে এমত নিদারুণ প্রহার কবিয়াছ যে তাহাতে সে তোমার গৃহ হইতে পলায়ন কবিয়া আমাব গৃহে গিয়াছে। যুবতী কন্যা পিতৃগৃহে থাকে ইহা শাস্ত্র ও লোকাচার বিরুদ্ধ। জামাতা উত্তর করিল, তোমার কন্যা পতিসহবাসে বিরতা, পিতৃবাসে থাকিতে ভাল বাসে, অতএব তাহাকে কি প্রকারে লইব। রামের পত্নীকে রাবণ হরণ করিয়াছিল, রাম তাহাব ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি রাজা, সকলই করিতে পারেন। আমরা

হীন জাতি, তাহা করিতে পারি না, তাহা করিলে জ্ঞাতি বন্ধুর নিকট নিন্দার ভাজন হইতে হয়।

এই কথোপকথনে রামের প্রতীতি হইল, ভদ্র যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অলীক নহে। বিশেষতঃ, সেই দিবস সীতার কেশ বন্ধন করিতে করিতে তাঁহার এক সহচরী জিজ্ঞাসা করিল হে দেবি, রাবণ তোমাকে লঙ্কাতে লইয়া গিয়াছিল, শুনিয়াছি তাহার দশ মুণ্ড, বিংশতি লোচন ও বিংশতি বাহু ছিল। অতএব ঐ রাবণের মূর্ত্তি ভূমিতে অঙ্কিত করিয়া আমাদিগকে দেখাও দেখি। সীতা এই কথায় রাবণের মূর্ত্তি ভূমিতে চিত্রিত করিলেন। দৈবাৎ ঐ সময়ে রাম অন্তঃপুরে গমন করিয়া দেখিলেন, সীতা রাবণের অবয়ব এমন উত্তমরূপে লিখিয়াছেন যে তাহার প্রকৃত মূর্ত্তির সহিত চিত্রের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। ইহাতে তিনি মনে করিলেন যদি সীতা রাবণকে ভালরূপে না জানিবে, তবে তাহার মূর্ত্তি এমন শুদ্ধ করিয়া লেখা কখনই সম্ভব নহে।

এইরূপ ঘটনা দ্বারা তাঁহার সংশয় আরো দৃঢ় হইল। তখন তিনি ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে আহ্বান পূর্ব্বক তাবৎ বিবরণ কহিয়া, সীতার বনবাস নির্দ্ধারিত করিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, কল্য সীতা বাল্মীকি মুনির তপোবনে গমনার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন,

অতএব এই সুযোগে তুমি সীতাকে তপোবনে রাখিয়া আইস, আর তাহাকে গৃহে রাখা কর্ত্তব্য নহে। এই আজ্ঞায় তিন ভ্রাতা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন, ইহাও বলিলেন যদি সীতাকে নিতান্ত পরিত্যাগ করেন তবে অরণ্যে প্রেরণ না করিয়া স্বতন্ত্র কোন স্থানে রাখুন। রাম বলিলেন সীতার জন্যই আমার অপযশঃ, অতএব তাহাকে স্বতন্ত্র রাখিলে আমার অখ্যাতি দূর হইবে না, একারণ বনবাস দেওয়াই উচিত।

রাম এই প্রকার আদেশ করিলে, লক্ষ্মণ কি করেন, রামের আজ্ঞা অবহেলন করিতে না পারিয়া সীতার সন্নিধানে গিয়া কহিলেন, দেবি, কল্য আপনি বাল্মীকির তপোবনে মুনিকন্যাগণের দর্শনার্থ গমনের বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, অতএব আপনাকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য রথ প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি। সীতা মহা আহ্লাদে বস্ত্রাভরণ পরিধান করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। বনপ্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন যে, রামের আজ্ঞাতে আমি আপনাকে বনবাস দিতে আনিয়াছি। সীতা এই কথা শ্রবণ মাত্র একবারে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, ক্ষণকাল পরে চেতনা পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, হে লক্ষ্মণ,

রাম ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, তাঁহার যশঃ জগদ্ব্যাপি, কিন্তু আমাকে প্রতারণা কেন করিলেন, তিনি অগ্রে আমাকে এ কথা কেন বলিলেন না। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন যদি এমন মনস্থ ছিল তবে আমার পরীক্ষা করিলেন কেন, আর যদি মনের সন্দেহ দূর না হইয়াছিল তবে প্রথমাবধি আমাকে একবারে বর্জ্জন না করিলেন কেন, আমি এই অপমানে আর প্রাণ ধারণ করিব না, আমি তোমার সম্মুখে যমুনায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু আমি গর্ভবতী, আমার বিনাশে রামের সন্তানও বিনষ্ট হইবে। অতএব কি করি, কেমন করিয়া এ প্রাণ ধারণ করি। রাম আমার তুল্য অনেক রমণী পাইবেন, কিন্তু আমি নিরপরাধিনী, বিনা অপরাধে তিনি আমার এ দুর্গতি কেন করিলেন!

সীতা এইরূপ অনেক বিলাপ করিলেন। লক্ষ্মণ কি করেন, সেই অরণ্যমধ্যে তাঁহাকে রাখিয়া বিদায় হইলেন। সীতা একাকিনী বনমধ্যে, ভীষণমূর্ত্তি বিবিধ বনচর দর্শনে অতিশয় ভীতা হইয়া আরও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি মুনি তপস্যান্তে শিষ্য সমভিব্যাহারে সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাকে এই প্রকার অসহায় দেখিয়া বিধিমত সান্ত্বনা করিলেন, এবং নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে লইয়া গিয়া, আপন পত্নীর স্থানে

সমর্পণ করিলেন। মুনিপত্নী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সমাদর পূর্ব্বক গৃহে রাখিলেন।

লক্ষ্মণ সীতাকে বনবাস দিয়া অযোধ্যাতে প্রত্যাগমন করিলে পর রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমার প্রাণাধিকাকে কোথায় রাখিয়া আসিলে, সীতা আমা বিনা এক দিবসও স্থানান্তরে থাকিতে পারেন না। তিনি একাকিনী কোথায় থাকিবেন, আমি তাঁহাকে না দেখিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব। সীতা-বিরহে আমার রাজ্য ও সিংহাসন বিফল। জনক রাজা শুনিয়া আমাকে কি বলিবেন, আমি কি দোষে তাঁহার দুহিতাকে বনবাস দিলাম। রাম এই প্রকার অনেক খেদ করিলেন। তদনন্তর এক স্বর্ণময়ী সীতা নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া সীতা চিন্তা সার করিয়া যাবজ্জীবন শোকসাগরে মগ্ন থাকিলেন।

এদিকে সীতা দেবী বাল্মীকি মুনির আশ্রমে থাকিয়া রাম-বিরহে অতিশয় মনোদুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। মুনিপত্নী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেন। কালক্রমে সীতা দেবীর দুই যমজ পুত্র জন্মিল। যৎকালে এই দুই পুত্র ভূমিষ্ঠ হয় তখন বাল্মীকি মুনি তপস্যাতে ছিলেন, শিষ্যগণ তাঁহাকে সীতার প্রসববার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে, মুনি ঐ দুই পুত্রকে

লবণ ও কুশে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে বলিলেন। সীতা তদনুরূপ করিলেন। তদনন্তর বাল্মীকি কুমারদিগকে দেখিতে গিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন, লবণ ও কুশে আচ্ছাদন হেতু এক জনের নাম লব ও আর এক জনের নাম কুশ রাখিলেন। পরে এই দুই পুত্রের যেমন বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমন তাহাদিগকে সঙ্গীত ও ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। তাঁহারা অতি ত্বরায় অস্ত্র ও সঙ্গীত বিদ্যাতে সুপণ্ডিত হইলেন।

কিয়ৎকালানন্তর রাম বহুসমারোহ পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া শত্রুঘ্নকে অশ্বরক্ষার ভার দিলেন। দৈবাৎ একটা অশ্ব জয়পতাকা শুদ্ধ চিত্রকূট পর্ব্বতে পলায়ন করিল, তাহাতে শত্রুঘ্ন তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বাল্মীকি মুনি লব ও কুশকে তপোবন রক্ষার আদেশ করিয়া তপস্যায় গমন করিয়াছিলেন। রামের অশ্বমেধের অশ্ব তপোবনে প্রবেশ করিলে, লব ও কুশ ঐ ঘোটককে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। পরে শত্রুঘ্ন আসিয়া ঐ অশ্ব চাহিলেন, কিন্তু লব ও কুশ তাহা দিলেন না। তাহাতে তাহাদের সহিত তাঁহার মহাযুদ্ধ হইল। ঐ যুদ্ধে শত্রুঘ্ন পরাজিত হইলেন। তৎপরে ভরত ও লক্ষ্মণ ঐ অশ্ব আন-

য়ন জন্য অনেক ধুম ধামে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহারাও অপরিচিত ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বয়ের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইলেন। অনন্তর রাম স্বয়ং সংগ্রাম সজ্জায় অশ্ব আনয়নার্থ তপোবনে গমন করিলেন।

রামের সৈন্যগণের কোলাহল শ্রবণে লব কুশ পরস্পর এই কথা বলিতে লাগিলেন, দেখ ভাই অশ্বের জন্য বুঝি আর কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে আসি-য়াছেন, অতএব চল আমরা তাহাকে মারিয়া আইসি। সীতা এই বাক্য শ্রবণে জিজ্ঞাসা করিলেন হে বৎস, তোমরা কোথায় যাইবে, দেখিও কাহার সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিও না, তোমরা বালক, কে মারিবে কে ধরিবে, আমার সর্ব্বদা এই ভাবনা অত্যন্ত। লব, কুশ, ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন জননি, নিত্য নিত্য কোথা-কার রাজা সকল মৃগয়া করিতে আসিয়া তপোবন ভগ্ন করে, তাহাতে আমরা অত্যন্ত অসুখী হই। বোধ করি অদ্য কোন ব্যক্তি তপোবন নষ্ট করিতে আসিয়াছে, আমরা তাহাকে তাড়াইয়া দিতে চলিলাম, ইহাতে বিবাদ হয় হইবে, তাহার ভয় কি, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমরা জয়ী হইয়া আসিব, কখন হারিব না।

মাতাকে এইরূপ বুঝাইয়া দুই সহোদর সংগ্রাম স্থলে গমন করিলেন। তাহারা রণস্থলে উপস্থিত হইলে, রামের সেনাপতিগণ তাহাদিগকে রামের ন্যায়

অভেদাকার দেখিয়া পরস্পর কহিল, রাম গর্ভবতী সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন, অতএব এই দুই পুত্র অবশ্য তাঁহার গর্ভে জন্মিয়া থাকিবে। রামও মনে মনে করিলেন তাহা অসম্ভব নহে। পরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহার পুত্র, তোমাদের পিতার নাম কি। তিনি আরো বলিলেন, তোমাদের আকারে বোধ হয় তোমরা আমার পুত্র, অতএব যদি আমার পুত্র হও তবে অনর্থক সংগ্রাম করিও না। লব ও কুশ মনে মনে ভাবিলেন যে আমরা পিতার নাম জানি না, অতএব কি প্রকারে পরিচয় দিব। কল্য মাতার স্থানে জনকের নাম জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় দিতে পারি। কিন্তু তাহা হইলে এ ব্যক্তি অদ্যই পলায়ন করিবে; তাহা হইতে দিব না। ইহা ভাবিয়া তাঁহারা বলিলেন তুমি যুদ্ধে আসিয়াছ, তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি। আর তুমি আমাদিগকে পুত্র বলিয়া কটূক্তি কর ইহা অতি অনুচিত। তুমি বুঝি যুদ্ধে ভয় পাইয়াছ, এই জন্য পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া পলায়নের অনুষ্ঠান করিতেছ।

এই প্রকার উত্তর প্রত্যুত্তর হইলে ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। লব ও কুশ ধনুর্ব্বিদ্যায় অতি পারগ ছিলেন, এবং যুদ্ধে অসাধারণ সাহস পূর্ব্বক রামের অসংখ্য

সৈন্য বিনাশ করিলেন। রামও যুদ্ধবিশারদ ছিলেন, কিন্তু অপরিচিত পুত্রদ্বয়কে পরাজয় করিতে না পারিয়া, পুনর্ব্বার তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে, আমাকে যথার্থ করিয়া বল, চাতুরী করিও না। লব ও কুশ উত্তর করিলেন চাতুরীর প্রয়োজন কি, আমরা বাল্মীকি মুনির শিষ্য, তাঁহার তপোবন রক্ষা করি এবং তাঁহার অন্নে পালিত। এই কথোপকথন কালে বাল্মীকি মুনি সশিষ্য তপস্যা করিয়া তপোবনে উপস্থিত হইলেন, এবং পিতা পুত্রের যুদ্ধ দেখিয়া লব ও কুশকে স্থানান্তর করিয়া রামকে নির্জ্জনে বলি-লেন তুমি অশ্ব লইয়া অযোধ্যাতে গমন কর, ইহার পর লব কুশের পরিচয় পাইবে।

রাম মুনির বাক্যানুসারে অশ্ব লইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলেন। তদনন্তর নানা দেশ হইতে বিপ্রগণ দক্ষিণা লইতে আসিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বাল্মীকি মুনি আপন শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় গমন করিয়া, লব ও কুশকে বলিলেন তোমরা আমার নিকট অস্ত্র ও সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, তন্মধ্যে এক বিদ্যার অর্থাৎ অস্ত্র বিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীত বিদ্যার পরীক্ষা দাও নাই। অতএব রামের যজ্ঞে নানাদেশীয় ভূপতিগণের সমাগম হইয়াছে, এই সময়ে তোমাদের গুণের পরীক্ষা হউক। এবং আমি

বহু পরিশ্রম করিয়া যে রামায়ণ রচনা করিয়াছি তাহাও প্রকাশ হউক।

বাল্মীকি মুনির এইরূপ উপদেশ হইলে, লব ও কুশ পর দিবস তপস্বীর বেশে অর্থাৎ মস্তকে জটা বন্ধন ও বল্কল পরিধান করিয়া বীণা বাদন পূর্ব্বক রামের সম্মুখে রামসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, এবং ঐ কবিতা এমন সুচারুরূপে পাঠ করিতে লাগিলেন যে সভাস্থ সমস্ত পণ্ডিত ও নৃপতিগণ তৎশ্রবণে মুগ্ধ হইলেন। এবং রাম তুষ্ট হইয়া বালকদিগকে স্বর্ণ ও রত্নাভরণ পুরস্কার দিতে আজ্ঞা করিলেন। বালকদ্বয় তাহা গ্রহণ না করিয়া কহিল আমরা তপস্বী, ফল মূল আহারে জীবন ধারণ করি, আমাদিগের রত্নালঙ্কারে প্রয়োজন কি। রাম শিশুবাক্যে তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বালকদ্বয় এ কবিতা কাহার রচিত। বালকেরা উত্তর করিল এই কবিতা বাল্মীকি মুনির রচিত। এই কথা বলাতে রাম পুনর্ব্বার তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে, কাহার পুত্র। তাহাতে বালকদ্বয় কহিল আমরা বাল্মীকি মুনির শিষ্য, পিতার নাম অবগত নহি, কিন্তু সীতা আমাদের গর্ভধারিণী। এই কথায় রাম তাহাদিগকে আপন পুত্র জানিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইলেন, এবং সীতাকে বর্জ্জন হেতু বিলাপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর

বাল্মীকি মুনিকে কহিলেন, হে মুনিবর আপনি এতাবৎ জানিয়া আমাকে কেন বিডম্বনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক এইক্ষণে পৃথিবীব যাবতীয় নৃপতিগণ এই সভায় উপস্থিত আছেন, অতএব যাহাতে সীতা ইঁহাদের সম্মুখে পবীক্ষা দিয়া গৃহে আইসেন তাহা করুন।

পবীক্ষাব কথায় তাবৎ সভাস্থ লোক অসম্মতি জ্ঞাপন কবিলেন, এবং কৌশল্যা ও সুমিত্রা প্রভৃতি দশবথমহিষীগণ বলিলেন সীতাব একবাব পবীক্ষা হইয়াছে, অতএব দ্বিতীয়বার পবীক্ষা অনাবশ্যক। তাঁহারা আবো বলিলেন পুনর্ব্বার পরীক্ষা হইলে জনক রাজা মনস্তাপ পাইবেন। রাম বলিলেন কাহারও উপরোধ শুনিলে অন্তঃকবণে প্রবোধ জন্মিতে পাবে না। বিশেষতঃ পূর্ব্বে যে পরীক্ষা হইয়াছিল তাহা এই সকল রাজারা দেখেন নাই। অতএব ইঁহাদের সম্মুখে পরীক্ষা হইলে ইঁহারা সীতাব সতীত্ব বিষয়ে আর কোন কথা বলিতে পাবিবেন না। বিশেষতঃ রাজার ধর্ম্ম কেবল অন্যের বিচার করিবেন এমত নহে, আপন স্ত্রী ও আত্মীয়গণেরও বিচাব করিবেন, না করিলে ধর্ম্মতঃ পতিত হইতে হয়।

এই প্রকাব তর্ক কবণানন্তর রাম বাল্মীকি মুনিকে সীতা আনয়নার্থ আজ্ঞা করিলেন। বাল্মীকি মুনি রামের আজ্ঞায় সীতা-সমীপে গিয়া তাঁহাকে সমস্ত

বিবরণ কহিলেন। সীতা পরীক্ষার কথায় অত্যন্ত খিন্ন হইলেন, কহিলেন, আমি একবার পরীক্ষা দিয়াছি অতএব পুনর্ব্বার পরীক্ষা চাহেন ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ। কিন্তু কি করেন, পরীক্ষায় অসম্মত হইলে দুর্নাম হইবে, এই শঙ্কায় মুনিসমভিব্যাহারে অযোধ্যায় চলিলেন। গমন কালে মুনিপত্নী তাঁহার বিচ্ছেদ জন্য অনেক খেদ করিয়া, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর অযোধ্যাতে সীতার আগমন হইলে অযোধ্যাবাসী তাবৎ লোক আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইল, এবং নানা প্রকার মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল। যখন সীতা বাহন হইতে অবরোহণ করিলেন তখন তাঁহার অলৌকিক রূপ দর্শনে সভাস্থ সমস্ত রাজগণ চমৎকৃত হইলেন। তদনন্তর সীতা রাজসভায় রামাগ্রে কর-পুটে দণ্ডায়মানা হইলে, রাম বলিলেন, সীতে, পূর্ব্বে সাগর-পারে তোমার পরীক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু তখন এই সকল নৃপতিগণ উপস্থিত ছিলেন না। এইক্ষণে ইহাঁরা উপস্থিত, অতএব তুমি পুনরায় পরীক্ষা দিয়া গৃহ-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। সীতা বলিলেন আমি একবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছি, তাহার পর কি অপরাধে আমাকে বনবাস দিলেন তাহা আমি জ্ঞাত নহি, আর বনবাস দিয়া আমার কোন তত্ত্ব করেন নাই, পরে লব ও কুশ দ্বারা উদ্দেশ হইয়াছে। যাহাহউক আমি

আপনকার আজ্ঞা পালন করিয়াছি, এবং এ কয়েক বৎসর ফল মূল আহারে জীবন ধারণ করিয়াছি। ইহাতেও আপনার মনের মালিন্য দূর না হইয়া, এই ভদ্র সমাজে আমাকে ব্যভিচারিণীর ন্যায় পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিতে চাহেন, আমি জানিলাম আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট, আমি জীবন যৌবন আপনাকে সমর্পণ করিয়াও আপনকার নিকট কলঙ্কিনী থাকিলাম। অতএব আমার জীবন ধারণ কেবল অসুখের কারণ। আমি এ প্রাণ আর রাখিব না। আমি মরিলে আপনার অযশ থাকিবে না, যে পাপীয়সীর জন্য এত ক্লেশ পাইলেন আর তাহার মুখাবলোকন করিতে হইবে না, আপনার সকল দুঃখ ঘুচিবে।

সীতা এই প্রকার অনেক বিলাপ করিলেন। তদনন্তর স্বীয় গর্ভধারিণী ধরণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, মাতঃ, আমি এই সভায় বড় লজ্জা পাইলাম, এই লজ্জায় মুখ উত্তোলন করিতে পারি না, অতএব আমাকে স্থান দান কর, আমি তোমার ক্রোড়ে গিয়া লুকাই। এই কথা বলিয়া সীতা হঠাৎ ভূমিতে পতিত হইলেন, পতনমাত্র তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। সভাস্থ নৃপতিগণ এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, তাবৎ অযোধ্যা নগরে মহা ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল। রাম জানিলেন সীতার এইরূপ মৃত্যু কেবল

তাঁহার নিষ্ঠুর আজ্ঞায় হইল। অতএব তিনি আপনাকে তাঁহার মরণের মূল জানিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। কিয়ৎ কাল পরে তিনিও লীলা সম্বরণ করিলেন। তাহার পর লব ও কুশ দুই ভ্রাতা রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া পাঠকগণের অবশ্য এই বিবেচনা হইবে, সীতা যে প্রকার সতী ও পতিপরায়ণা ছিলেন, তাহাতে রাম তাঁহার প্রতি ভাল ব্যবহার করেন নাই। রাম যখন বনগমন করেন তখন সীতা অনায়াসে আলয়ে থাকিতে পারিতেন। তিনি তাহা করেন নাই, তিনি জানিতেন পতি অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর মূল্যবান ধন নাই, অতএব পতি-পদ সার জানিয়া সম্পদাদি পরিত্যাগ করিয়া, পতি সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তৎপরে লঙ্কাধিপতি তাঁহাকে অনেক প্রলোভ দিয়াছিলেন, তাহাতেও লোভ না করিয়া অহরহঃ রামের জন্য রোদন করিয়াছিলেন, এবং আপনাকে অনেক শারীরিক যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। তথাচ রাম তাঁহাকে অসতী জ্ঞান করিয়া পরীক্ষা করিলেন, ইহা অনুচিত। যাহাহউক সীতা ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছিলেন, এবং রাম তাঁহাকে সাধ্বী ও পতিব্রতা জানিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি রাবণের প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়াছিলেন ইহাতে

অসতী বোধ করিয়া, তাঁহাকে বনবাস দেওয়া অতি নিষ্ঠুর কর্ম্ম হইয়াছিল। সীতা তাহাতেও রামের অযশঃ করেন নাই। তিনি বনবাসের ধর্ম্ম প্রতি-পালন করিয়াছিলেন এবং ফল মূল ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য আহার করেন নাই। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া রাম তাঁহাকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা দিতে আজ্ঞা করিলেন ইহা, রামরাজ্যের যে প্রকার বিচার তদুপযুক্ত হয় নাই। ফলতঃ সীতার সতীত্বের বিষয়ে কোন গ্রন্থকর্ত্তার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তিনি সতীর মধ্যে অগ্রগণ্যা ছিলেন এবং তাঁহার যে সকল গুণ ছিল তাহা এক নারীতে কদাচ সম্ভবে না।

সাবিত্রী।

—০—

পূর্ব্বকালে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন, সাবিত্রী তাঁহার কুমারী। ঐ রাজা সন্তানাদি অভাবে সতত নিরানন্দ থাকিতেন। পরে অনেক দেবারাধনা করিয়া অবশেষে এই কন্যা হইয়াছিল। তাহাতে ঐ কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং বহু যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছিলেন। এই কন্যা জ্ঞানশাস্ত্রে অতি বিচক্ষণা হইয়াছিলেন, এবং শিল্প কর্ম্মও উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, সাবিত্রী পরম সুন্দরী ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি রাজার একমাত্র কন্যা, আর সহোদর কিম্বা সহোদরা ছিল না। এই জন্য পিতা মাতার অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী ছিলেন।

ইদানীন্তন নারীগণকে অন্তঃপুর স্বরূপ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখার যে কুরীতি হইয়াছে, পূর্ব্বকালে এ রীতি ছিল না। সাবিত্রী যথাতথা যাইতেন, এবং রাজা তাঁহার সেবার জন্য এক শত সমবয়স্কা পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা নিয়ত তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

এই সকল পরিচারিকা সমভিব্যাহারে সাবিত্রী, এক দিবস তপোবনে মুনিগণের সহিত সাক্ষাৎ ও শাস্ত্রালাপ করিতে গিয়াছিলেন। তপোবন হইতে প্রত্যাগমন কালে, দেখিলেন অরণ্যমধ্যে এক কুটীরে এক অন্ধ, এক বৃদ্ধা নারী ও এক যুবা পুরুষ আছেন। তত্রস্থ লোকদিগকে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, দমসেন নামে অবন্তীর রাজা শেষ অবস্থায় অন্ধ হইয়াছিলেন এবং সত্যবান নামে তাঁহার পুত্র অতি শিশু ছিলেন। এই কারণ তাঁহাকে হীনবল দেখিয়া তদীয় শত্রুগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার রাজ্যাপহরণ করে। রাজা দমসেন পুত্র ও ভার্য্যাকে লইয়া মুনিগণের আশ্রয়ে আসিয়া তপোবনে বাস করিতেছেন। সাবিত্রী সত্যবানের মনোহর রূপ অবলোকনে এবং তাঁহার পরিচয় শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন, এবং তাঁহার এতদ্রূপ দুঃখ-দশা দেখিয়াও, সত্যবানকে উপযুক্ত পাত্র জ্ঞান করিয়া, পিতা মাতার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া, মনে মনে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।

অনন্তর সাবিত্রী স্বালয়ে প্রত্যাগতা হইয়া জননীকে আনুপূর্ব্বিক তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। তাঁহার গর্ভধারিণী দুহিতার এবম্ভূত বিবাহের কথায় চমৎকৃতা হইয়া, রাজাকে তাবৎ বিবরণ জানাইলেন।

রাজা স্বাভিমতের বিরুদ্ধ কার্য্যের সঙ্ঘটন হেতু, যাহাকে সাবিত্রী বিবাহ করিবেন সে সদ্বংশোদ্ভব কি না এবং সুপাত্র কি কুপাত্র, এই সকল ভাবিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন।

কিয়দ্দিবস পরে মহর্ষি নারদ তন্নিকেতনে আগত হইলে, রাজা তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে সাবিত্রী হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। নারদ সাবিত্রীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্ এই কন্যা কাহার। রাজা বলিলেন এই কন্যা আমার। নারদ পুনর্ব্বার কহিলেন এই কন্যার লক্ষণে বোধ হইতেছে ইনি সতী লক্ষ্মী। ইনি দত্তা কি অদত্তা। তখন রাজা, তপোবনে সত্যবানের সহিত তাঁহার মানসিক বিবাহের কথা জ্ঞাপন করিয়া, মুনিকে কহিলেন, হে মহর্ষে, আমি পাত্রের পরিচয়াদি কিছুই অবগত নহি। আমার সৌভাগ্যক্রমে আপনার আগমন হইয়াছে। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার শুভাশুভ বলিতে আজ্ঞা হউক। এই কথা বলাতে, নারদ সাবিত্রীর প্রতি নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে পাত্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সাবিত্রী সত্যবানকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার যে পরিচয় শুনিয়াছিলেন তাহা সমুদয় বিস্তার পূর্ব্বক কহিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত

নারদ মুনি, তাহা শুনিয়া বলিলেন এ বিবাহ সদ্বিবাহ হয় নাই, অতএব তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পাত্রান্তরকে বরণ কর।

এই কথায় সাবিত্রী ক্ষুন্ন হইয়া বারম্বার মুনির সহিত বিতর্ক করিয়া, তাঁহার এতদ্রূপ নিষেধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি তর্ক খণ্ডন না করিয়া পুনঃ পুনঃ পূর্ব্ববৎ নিষেধ করিতে লাগিলেন। তখন অশ্বপতি ভূপতি নারদের এবম্ভূত নিষেধে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া, তাঁহাকে তদ্বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে কহিতে বলিলেন। নারদ কহিলেন দ্যুমৎসেন রাজা সূর্য্যবংশোদ্ভব, এবং বহুকাল অবন্তীর ভূপতি ছিলেন। পরে তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ হইলে, তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করে। রাজা নিরাশ্রয় হইয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া বনবাস করিয়াছেন। রাজপুত্র সত্যবান অতি সুন্দর পুরুষ, এবং সদ্গুণান্বিত, কিন্তু অল্পায়ুঃ, এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই সমস্ত কথা বলিয়া, নারদ কহিলেন আপনাকে সকল কথা ব্যক্ত করিয়া কহিলাম, এক্ষণে আপনার যেরূপ সদ্বিবেচনা হয় করুন।

রাজা মুনি-প্রমুখাৎ এতদ্রূপ ভয়ানক কথা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কন্যাদান জনক জননীরই শাস্ত্রবিহিত অধিকার, তবে কন্যা মুগ্ধতাবশতঃ একটা কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার শুভাশুভ বোধ

কি আছে। আমি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, কন্যা কদাপি তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবে না। অতএব অন্য সুপাত্রের অন্বেষণ করা যাউক। এই চিন্তা করিয়া কন্যাকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। কন্যা উত্তর করিলেন, আমি সত্যবানকে মন অর্পণ করিয়াছি, তাহা কিরূপে অন্যথা হইবে। রাজা বলিলেন, যদিও তাহাকে মনোনীত করিয়াছ, কিন্তু তাহার সঙ্গে বিবাহ হয় নাই। ঐ রাজকুমার সর্ব্বাংশে তোমার যোগ্য বটে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার পরমায়ুঃ অধিক নহে, এক বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইবে। তখন তুমি পতিহীনা হইবে। পতি নারীর ভূষণ, পতি বিনা রমণীর জীবনধারণ বৃথা। অতএব এই বিবাহে আমি কিরূপে সম্মতি দান করিতে পারি। তুমি অল্পবয়স্কা, আপনার হিতাহিত বিবেচনায় এখন পর্য্যন্ত অশক্ত। কন্যার সুখে পিতা মাতার আনন্দ, এবং তাহার দুঃখে তাঁহাদের দুঃখ, এই জন্য পিতা মাতা সুপাত্র অন্বেষণ করেন। অল্পায়ুঃ পাত্রে পিতা মাতা কন্যাদান করিতে পারেন না। বিশেষতঃ বৈধব্য অবস্থাতে যেরূপ যন্ত্রণা তাহা, পতিহীনা নারী ব্যতিরেকে আর কাহার বোধগম্য নহে। অধিকন্তু পতিহীনা হইলে কেবল স্ত্রীলোকেরই দুঃখ এমত নহে, পিতা মাতারও তদ্রূপ দুঃখ। পতিহীনা কন্যা পিতা মাতার অন্তঃ-

শূল এবং কুলনাশের মূল। অতএব যাহাতে তোমার আপনার চিরযন্ত্রণা ও জনক জননীর সুখাস্বাদনের হানি, তাহা করিও না। পিতা মাতার বাক্য অবহেলন অকর্ত্তব্য। যদি স্বয়ম্বরা হইবার বাসনা হয় কহ, তাহা হইলে ভারতভূমির তাবৎ নৃপতিগণের সমীপে সংবাদ প্রেরণ করি। তাঁহারা সমাগত হইলে যাহাকে বরণ করিতে অভিলাষ হয় করিবে। কিন্তু সত্যবান এরূপ অল্পায়ুঃ জানিয়া তাহাকে বিবাহ করিও না। এই প্রকার অশ্বপতি ভূপতি দুহিতাকে নানামত বুঝাইলেন।

সাবিত্রী সবিনয়ে পিতাকে কহিলেন তাত, আপনি এবিষয়ে কোন চিন্তা করিবেন না, অন্য কোন পাত্রেরও অন্বেষণের প্রয়োজন নাই। আমি সত্যবানকে স্বামী বলিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছি, অল্পায়ু বা দীর্ঘায়ু হউন, তিনিই আমার স্বামী। তদ্ব্যতীত আমি অন্য কাহাকে গ্রহণ করিতে পারি না। যদি জগদীশ্বর আমার অদৃষ্টে বৈধব্য যন্ত্রণা লিখিয়া থাকেন তবে তাহা খণ্ডন করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। ফলতঃ, এই অনিত্য সংসারে কিছুই নিত্য নহে, সকল মনুষ্যকেই মরিতে হইবে। তবে কেহ অগ্রে কেহ পশ্চাৎ মরিবেন। কোন ব্যক্তিই মৃত্যু এড়াইতে পারিবেন না; কেননা শরীরের সঙ্গেই মৃত্যুর উৎপত্তি। তাহাতে ভয়ের

প্রয়োজন কি? এই শরীর ধারণের সার কর্ম্ম ধর্ম্ম, তদনুশীলনই আমাদিগের প্রধান কর্ম্ম, তাহা না করিলে নরক ভোগ হয়। অতএব তাহাই আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, শারীরিক সুখ অসুখ মিথ্যা।

সাবিত্রীর এই প্রকার উত্তর শুনিয়া নারদ মুনি অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা তাহার পরও দুহিতাকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন। কিন্তু সাবিত্রী কোন প্রকারে সত্যবানকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। তাহাতে রাজা যদিও দুঃখিত হইলেন, তথাপি কন্যার সন্তোষার্থ কানন হইতে সত্যবানকে আনয়ন করিয়া তাহার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিলেন।

বিবাহান্তে সত্যবান সাবিত্রীকে লইয়া তপোবনে গমন করিলে, তদীয় জনক জননী পুত্রের বিবাহবার্ত্তা শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইলেন। তপোবনবাসিনী ব্রাহ্মণকন্যারা সাবিত্রীর পরম মনোহর রূপ লাবণ্য দর্শনে অনেক প্রশংসা করিলেন। এই সকল যশোশব্দে, রাণীর মনে অত্যন্ত বিষাদ জন্মিল। তিনি কহিলেন হায়, জগদীশ্বর কি বিড়ম্বনা করিয়াছেন। কোথায় সত্যবানের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূকে রাজমহিষী করিব, না সেই প্রিয়তমা নৃপবালাকে তরুমূল-নিবাসিনী করিতে হইল। কোথায় ভাবিয়াছিলাম, রাজপ্রাসা-

দোপরি রত্নবিভূষিত পর্য্যঙ্কে অধ্যাসীন হইয়া, পুত্র-বধূর মুখচুম্বন করিব, না তদ্বিপরীত তৃণশয্যায় বসিয়া সেই চন্দ্রানন মলিন দেখিতে হইল। হায়! কি পরিতাপ, এই কোমলাঙ্গী বিধুমুখীও আমাদের দুরদৃষ্টের দুঃখভাগিনী হইলেন।

রাণী এইরূপ খেদ প্রকাশ করিলে, সাবিত্রী তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। তিনি বলিলেন জননি, আপনি রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য বাস করিতেছেন, ইহাতে অবশ্য আপনার দুঃখ হইতে পারে। কিন্তু আমাদের সুখদুঃখদাতা, বিধাতা, তিনি যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অখণ্ডনীয। তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করাতে কেবল ঈশ্বর-নিন্দা করা হয় এমত নহে, অনর্থক শোকের আধিক্যও হয়, এবং সেই শোকে অভিভূত থাকিলে আমাদের উচিত কর্ম্মেরও হানি জন্মে। কিন্তু রাজসিংহাসন ও তৃণশয্যাতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। আমি বিবেচনা করি যদি এই অরণ্য মধ্যে আপনাদের এবং পতির চরণ সেবা করিতে পাই, তবে তাহাতেই চরিতার্থতা জ্ঞান করি। পতি বিনা রাজসিংহাসনও কন্টকতুল্য বোধ হয়।

সাবিত্রীর এইরূপ সুশীলতার বাক্য শুনিয়া, ঋষি-নন্দিনীগণ তাঁহার অশেষ গুণানুবাদ করিলেন। এবং সত্যবানের এরূপ গুণবতী ভার্য্যা প্রাপ্তির জন্য তাঁহা-

কেও ভাগ্যবান বিবেচনা করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সত্যবান সাবিত্রীর সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজা রাণী পুত্রের সুখে সুখী হইলেন।

সত্যবান পূর্ব্ব নিয়মানুসারে প্রত্যহ বন হইতে ফল মূল কাষ্ঠাদি আনয়ন পূর্ব্বক নগরে বিক্রয় করিয়া, বৃদ্ধ মাতা পিতা ও পতিব্রতা পত্নীর ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সংবৎসর কাল অতীত হইলে, এক দিবস দিবাবসান কালে গৃহে খাদ্য দ্রব্যাদির অভাব প্রযুক্ত সত্যবান কুঠার গ্রহণ পূর্ব্বক বনগমনে উদ্যত হইয়া, জনক জননীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা রাণী তৎকালে বনগমনে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সত্যবান তাঁহাদিগকে সন্তোষ বাক্যে নিরস্ত করিয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সাবিত্রী, স্বামির অপরাহ্নে বনগমন অমঙ্গলের কারণ বিবেচনা করিয়া, নারদের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক অতিশয় চিন্তাকুলা হইলেন। আর মনে মনে ভাবিলেন, বুঝি ইহাঁর আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে, সেই জন্য অসময়ে অরণ্যে গমন করিতেছেন। অতএব যদি ইহাঁর কোন ভদ্রাভদ্র ঘটে তবে আমার ইহাঁর নিকটে থাকা উচিত, ইহা ভাবিয়া, পতিপরায়ণা সাবিত্রী কাহাকেও কোন কথা না কহিয়া, স্বামির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে

লাগিলেন। সত্যবান তাঁহাকে পশ্চাদ্গামিনী দেখিয়া বারম্বার নিষেধ করিলেন। সাবিত্রী তদ্বাক্য অবহেলন করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রাণী সাবিত্রীর বনগমনের সংবাদ পাইয়া সত্বরে তাঁহাকে আনিতে গেলেন, কহিলেন বৎসে, তুমি কোথায় গমন করিতেছ। তুমি যুবতী নারী, কল্য অবধি আহার কর নাই, তুমি কোথায় যাইবে, আইস, গৃহে ফিরিয়া চল, তোমার স্বামী এখনি ফল লইয়া আসিতেছেন। ভূপতিতনয়া কহিলেন, জননী, আমাকে অনুমতি করুন, আমি পতিসমভিব্যাহারে কানন দর্শন করিয়া আইসি। শাস্ত্রেও বিধি আছে, নারী কখন পতিসঙ্গ ত্যাগ করিবে না। অতএব আমি পতি সঙ্গে চলিলাম! আপনি চিন্তা করিবেন না, আমরা এখনি ফিরিয়া আসিতেছি। এই কথায় রাজরাণী নিরুত্তর হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

সাবিত্রী গহনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, নানাবিধ কৌতুক দর্শন করিলেন। রাজকুমার বহুবিধ ফল মূল আহরণ করিলেন। ফলাহরণ হইলে সত্যবান সাজি ও আঁকসি সাবিত্রীর হস্তে দিয়া, কাষ্ঠ আহরণার্থ কুঠার লইয়া বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। পরে বৃক্ষের একটা শুষ্ক শাখা ছেদন করিতে করিতে সত্যবানের অতিশয় শিরঃপীড়া বোধ হইল। তাহাতে তিনি অত্যন্ত কাতর

হইয়া বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলেন, এবং ভার্য্যাকে কহিলেন আমি শিরোবেদনাতে অধৈর্য্য হইয়াছি। এই কথায় সাবিত্রী বুঝিলেন যে তাঁহার কাল পূর্ণ হইল। অতএব মনে মনে অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া আপন অঞ্চল পাতিয়া বৃক্ষতলে তাঁহাকে শয্যা করিয়া দিলেন, এবং আপন ঊরুদেশে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

সত্যবান ক্রমে ক্রমে শিরোবেদনা ও অঙ্গদাহে অধিক অধৈর্য্য হইলেন, সাবিত্রী নানাপ্রকার শুশ্রূষা করিয়াও তাঁহার যাতনা নিবারণ করিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহার অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়াদি অবশ হইল। ইহাতে, যদিও সাবিত্রীর এমন বোধ হইল যে তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত, তথাপি সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা করিতে ক্ষান্ত না হইয়া, তাঁহার আরোগ্যের জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার নাড়ী বিচ্ছেদ হইয়া প্রাণ বিয়োগ হইল। সাবিত্রী অতিশয় শোকাকুলা হইয়া মনে মনে কহিলেন, কৃতান্ত যদি আমাকে এতই দুঃখ দিলেন, কিন্তু তিনি সত্যবানকে কি প্রকারে লইয়া যান, দেখিতে হইবে।

ইহা বলিয়া সাবিত্রী সেই তামসী যামিনীতে একাকিনী মৃত স্বামীর শরীর ক্রোড়ে করিয়া থাকিলেন। কিয়ৎকাল পরে শমন সত্যবানকে আনয়নার্থ দূত

প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দূতেরা সাধ্বী পতিব্রতা রমণীর বিগ্রহনিঃসৃত তেজঃপুঞ্জ দর্শনে, সত্যবানের শব লওয়া দূরে থাকুক, তাহা স্পর্শ করিতেও পারিল না। তদনন্তর তাহারা পরাঙ্মুখ হইয়া কৃতান্তসদনে গিয়া সবিশেষ নিবেদন করিল, তাহাতে যম স্বয়ং দূতগণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। সাবিত্রী তাঁহাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, এবং কোথা হইতে আগত হইলেন। যম উত্তর করিলেন, আমি যমরাজ, তোমার স্বামীর কালপ্রাপ্তি হইয়াছে, অতএব উহাকে লইতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া সাবিত্রী স্বামিদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে দণ্ডায়মানা হইলেন। তখন যমদূতগণ যমরাজের আজ্ঞাতে সত্যবানকে বন্ধন করিয়া লইয়া চলিল। সাবিত্রী স্বামির এতদ্রূপ দুরবস্থা বিলোকনে অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যমরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে, তুমি আমার সঙ্গে কি জন্য আসিতেছ। আমি কি করিব, তোমার স্বামীর কাল পূর্ণ হইয়াছে, এই জন্য আমি ইহাকে লইয়া যাইতেছি। তুমি মিথ্যা চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক গৃহে গিয়া স্বামীর উদ্ধারের পথ চিন্তা কর।

সাবিত্রী কহিলেন প্রভো, আপনি যাহা কহিলেন

আমি সকলি অবগত আছি। এই সংসার সমুদায় মায়াময়, ভাই বন্ধু স্বামী প্রভৃতি কেহ চিরজীবী নহে, কালে সকলকেই কাল প্রাপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব আমি এই প্রার্থনা করি, আপনি সত্যবানের পরিবর্ত্তে আমাকে গ্রহণ করিয়া সত্যবানকে জীবন দান করুন। কৃতান্ত কহিলেন পতিব্রতে আমি তোমার বাক্যে তুষ্ট হইলাম, সত্যবানের জীবন ব্যতীত তোমার অন্য যে প্রার্থনা থাকে বল। সাবিত্রী মনে মনে ভাবিলেন আমি সত্যবানকে কখনই পরিত্যাগ করিব না। তবে ধর্ম্মরাজ আমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন, অতএব পিতা অপুত্রক, তাঁহার বংশ লোপ না হয় ইহা প্রার্থনীয় বটে। সাবিত্রী মনে মনে এই চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, প্রভো, যদি মৎপ্রতি সদয় হইয়া থাকেন তবে আমার অপুত্রক পিতাকে পুত্র দান করিয়া পিতৃকুল উদ্ধার করুন।

যমরাজ সাবিত্রীর প্রার্থনানুসারে অশ্বপতি ভূপতির পুত্র হওনের বর প্রদান করিলেন, অর্থাৎ যেরূপে পুত্র হইবে তাহার পন্থা বলিয়া দিলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার সাবিত্রীকে গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলেন। সাবিত্রী কহিলেন প্রভো, আপনকার সৎ সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে আমার এক তিলার্দ্ধ বাঞ্ছা হইতেছে

না। আপনকার সহিত কথোপকথনে আমি সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছি, আপনি ব্যতিরেকে এই ভবসিন্ধু পার হইবার অন্য উপায় দেখি না। অতএব আমি আপনার সঙ্গ কদাচ পরিত্যাগ করিব না, আপনার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কৃতান্ত সাবিত্রীর বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে যদি তোমার আর কোন অভিলাষ থাকে বল। সাবিত্রী ভাবিলেন, শ্বশুর অন্ধ, যদি এই সুযোগে আমার দ্বারা তাঁহার অন্ধত্ব মোচন হয় তবে তাহা না করি কেন। ইহা চিন্তা করিয়া বলিলেন হে ধর্ম্মরাজ, আমার শ্বশুর দ্যুমসেন ভূপতির অন্ধত্ব দূর হওনের যদি কোন উপায় থাকে তাহা করুন। যমরাজ সাবিত্রীর এই প্রার্থনাও পূর্ণ করিলেন, অর্থাৎ অন্ধত্ব মোচনের উপায় বলিয়া দিলেন। তদনন্তর তিনি তাঁহাকে বলিলেন, সাবিত্রি রাত্রি অধিক হইয়াছে, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও।

ইহা বলিয়া যমরাজ প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রী গৃহে না গিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কতক দূর গমনের পর কৃতান্ত পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, তখনও সাবিত্রী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। তাহাতে তাঁহাকে পুনর্ব্বার নিষেধ করিলেন। সাবিত্রী উত্তর করিলেন, ধর্ম্মাবতার, আমার সংসারের বাসনা নাই। পতিই নারীর জীবন ও ভূষণ, অতএব স্বামী

যদি সংসার ত্যাগ করিলেন তবে সংসারে আমার আর কি প্রয়োজন। আপনি এই আশীর্ব্বাদ করুন, ধর্ম্মে আমার মতি থাকে। কৃতান্ত নরেন্দ্র-নন্দিনীর নিতান্ত ব্যাকুলতা দেখিয়া বাৎসল্যভাবে অশেষ রূপে সান্ত্বনা করিলেন।

সাবিত্রী যমরাজের কারুণিক বচনে নিরস্ত না হইয়া রোদন করিতে করিতে সংসার আশ্রমে বিশেষ ঔদাস্য প্রকাশ পূর্ব্বক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন পৃথিবী তাবৎ মায়াময়, মনুষ্যবর্গ মায়ায় মোহিত হইয়া সংসার রূপ মহা বিপদ-সাগরে মগ্ন হয় এবং ভ্রান্তি প্রযুক্ত পৃথিবী শুদ্ধ সকল বস্তুই আমার কহে। এই সংসারে অতি প্রিয় যে পতি, পুত্র, পিতা মাতা ও শ্বশুর শাশুড়ী তাঁহারা সকলেই অনর্থের মূল। কেননা তাঁহাদের জন্য অধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে হয়। পরন্তু চক্ষুঃসত্ত্বেও মনুষ্য অন্ধ, এবং গুটি পোকা যেমন আপনাদের সূত্রে আপনাদিগকে বন্ধন করে, শেষে বাহির হইতে পারে না, মনুষ্য সেই প্রকার নেত্র থাকিতে আপন মঙ্গল দৃষ্টি না করিয়া, বিষয় রূপ জালে আপনাকে বদ্ধ করে, তাহাতে অবশেষে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। অতএব আমি একবারে সংসার বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছি, আমি আপনার সঙ্গে চলিলাম। যম তাঁহার

এই সকল বাক্য শ্রবণে অতিশয় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিশেষ রূপে প্রশংসা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বর প্রদান করিতে চাহিলেন। কিন্তু ভূপালবালা কোন প্রার্থনা প্রকাশ না করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বিনী থাকিলেন। তাঁহার নয়ন যুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। যমরাজ তদ্দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহাকে বারম্বার বর প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিলেন। নৃপনন্দিনী কৃতান্তের সদয়তা বুঝিতে পারিয়া, সত্যবানের ঔরসে মদীয় গর্ব্ভে এক শত পুত্রের জন্ম হউক, এই প্রার্থনা করিলেন।

যমরাজ এই কথায় মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন, কেননা যদিও স্পষ্টতঃ সত্যবানের জীবন প্রার্থনা করিলেন না, কিন্তু প্রকারান্তরে তাহাই প্রার্থনা করা হইল। যমরাজ কতক্ষণ পর্য্যন্ত মৌন হইয়া থাকিলেন, পরে তাহাই হইবে, এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রীও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কতক দূর যাইয়া যম পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, সাবিত্রী তখনও আসিতেছেন। তাহাতে পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রস্থান করিতে কহিলেন। সাবিত্রী উত্তর করিলেন প্রভো, আপনি আজ্ঞা করিয়াছেন সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ব্ভে শত পুত্র হইবে, আপনার বাক্য কখন অন্যথা হয় না। কিন্তু কিরূপে আমার এই অভিলষিত সিদ্ধ

হইবে তাহা আজ্ঞা করুন, তাহা হইলেই আমি প্রস্থান করি।

যমরাজ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, মনুষ্যের আয়ুঃ শেষ হইলে কখন পুনর্জীবিত হয় না, কিন্তু তুমি অতি পতিব্রতা, আমি তোমার গুণে অতিশয় বশীভূত হইয়াছি, অতএব তোমার পাতিব্রত্যের পুরস্কার করিতেছি। তোমার এক প্রার্থনায় দুই প্রার্থনা পূর্ণ হইল। তোমার পতিকে লইয়া যাও, এবং উভয়ে সুখে কালযাপন কর। যাবজ্জীবন এই চতুর্দ্দশী রাত্রিতে ব্রত করিবে। এই চতুর্দ্দশীর নাম সাবিত্রী চতুর্দ্দশী হইল। এই রজনীতে যে নারী ব্রত করিবে সে তোমার ন্যায় সতী হইবে।

এই কথা বলিয়া মৃত্যুপতি সত্যবানের মৃত দেহে জীবন দান করিয়া তাঁহাকে সাবিত্রীহস্তে অর্পণ করিলেন। সাবিত্রী মৃত পতির প্রাণ দানে কৃতান্তের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক বিবিধ প্রকারে স্তব করিলেন। অনন্তর যমরাজ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন *।

---

* এই ঘটনা প্রকৃত ঘটিয়াছিল এমত সম্ভব নহে। কিন্তু সাবিত্রী অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন, অতএব তাঁহার পতিপরায়ণতা উত্তমরূপে প্রকাশার্থ বিজ্ঞ গ্রন্থকার তাঁহার পতির পরলোক কল্পনা করিয়া তাঁহার পুনর্জ্জীবনকে তাঁহার সতীত্বের পুরস্কার স্বরূপ করিয়া লিখিয়াছেন।

সাবিত্রী স্বামীর সমীপে আগতা হইলে, সত্যবান নিদ্রা হইতে জাগরিত প্রায়, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উঠিয়া বসিলেন এবং সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভার্য্যাকে কহিলেন প্রিয়ে, কি কারণে তুমি এত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমার নিদ্রা ভঙ্গ কর নাই। এ ঘোর তামসী যামিনীতে তুমি একাকিনী কিরূপে এখানে ছিলে। চল এক্ষণে গৃহে গমন করা যাউক, নতুবা বৃদ্ধ জনক জননী আমাদিগের অনুপস্থানে চিন্তাকুল হইয়া, সমস্ত যামিনী যাতনা প্রাপ্ত হইবেন। সাবিত্রী উত্তর করিলেন, প্রভো নিদ্রাভঞ্জনে পাতক জন্মে এই বিবেচনায় আপনকার নিদ্রা ভঙ্গ করি নাই। এজন্য আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। সম্প্রতি এ নিবিড় অরণ্যানী মধ্য দিয়া গৃহে গমন করা বিহিত নহে। সিংহ ব্যাঘ্র বরাহাদি বিবিধ হিংস্র জন্তুগণের গ্রাসে পতিত হওনের আটক নাই। অতএব উভয়ে এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া যামিনী যাপন করি, রজনী প্রভাতা হইলে গৃহে গমন করিব। এই স্থির করিয়া, পতি পত্নী উভয়ে বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক সে রজনী কোন মতে যাপন করিলেন।

এ দিকে সত্যবানের পিতা অন্ধের যষ্টির ন্যায় একমাত্র পুত্রের অনুপস্থিতিতে ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই অন্ধকার রজনীতে পুত্র কোথায়

রহিলেন, কি খাইলেন এবং যে পুত্রবধূ কখন গৃহের বাহির হন না, তাঁহারই বা কি হইল। কখন কখন ইহাও ভাবিতে লাগিলেন বুঝি কোন হিংস্রক জন্তু তাহাদিগকে নষ্ট করিল। এই প্রকার নানা ভাবনায় সমস্ত নিশা যাপন করিলেন। অরণ্যবাসী ঋষিগণ তাঁহাদিগকে নানা মতে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

শর্ব্বরী প্রভাতা হইলে সত্যবান ফল মূল ও কাষ্ঠ-ভার স্কন্ধে লইয়া প্রিয়তমা ভার্য্যার সহিত আপনা-দের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও রাজমহিষী তাঁহাদিগকে প্রত্যাগত দেখিয়া মৃত দেহে জীবন প্রাপ্তের ন্যায় অত্যন্ত উল্লাসিত হইলেন। রাজরাণী পুত্র ও পুত্রবধূর মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। প্রতি-বাসী ঋষি ও ঋষিকন্যাগণ তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিলেন। পরে সাবিত্রীর প্রমুখাৎ যাবতীয় দুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনন্তর সাবি-ত্রীকে যথেষ্ট প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া ঋষিকন্যা-গণ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সাবিত্রী উক্ত শুভ দিবসের স্মরণার্থ তদবধি বর্ষে বর্ষে ঐ চতুর্দ্দশী তিথিতে ব্রত করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি স্ত্রীলোকেরা ঐ চতুর্দ্দশীতে ঐরূপ ব্রত করিয়া থাকেন। ঐ চতুর্দ্দশীকে সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী বলে।

যমরাজের বরমাহাত্ম্যে, সাবিত্রীর পিতা পুত্রবান্ হইলেন, এবং দ্যমৎসেন ভূপতির অন্ধতা দূর হইল, আর সাবিত্রীর গর্ব্ভে ক্রমশঃ মহাবল পরাক্রান্ত শত পুত্র উৎপন্ন হইলেন। এই সকল পুত্রের বয়োবৃদ্ধি হইলে, সত্যবান প্রবল বীর্য্যশালী পুত্রগণ সহায় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিলেন, এবং পতিপরায়ণা সাবিত্রীর সহিত পঞ্চশত বর্ষ রাজত্ব ভোগ করিলেন। সাবিত্রীর কি প্রকারে মৃত্যু হইয়াছিল তাহা কোন গ্রন্থে প্রকাশ নাই।

সাবিত্রী স্বামীর সঙ্গে পঞ্চশত বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়াছেন। এ কথা অনেকের অসম্ভব বোধ হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বকালে মনুষ্যের অধিক পরমায়ু ছিল, অতএব সাবিত্রী পঞ্চশত বৎসর জীবিত ছিলেন আশ্চর্য্য নহে।

—০—

শকুন্তলা।

—o—

শকুন্তলা বিশ্বামিত্র মুনির কন্যা। তাঁহার জন্ম ও রক্ষার বিবরণ অতি আশ্চর্য্য। কথিত আছে বিশ্বামিত্র মুনি অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবতাগণ মহা ভীত হইয়া, মন্ত্রণা পূর্ব্বক তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করণার্থ, মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে স্বর্গ হইতে তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। মেনকা পরম রমণীয় বেশে তপোবনে মুনির সম্মুখে ক্রীড়া করিতে লাগিল। মুনি তাহার মোহন রূপে মোহিত হইয়া তপ জপে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার সঙ্গে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। পরে এক দিবস সন্ধ্যার সময় বিশ্বামিত্র মুনি সায়ংসন্ধ্যা করণার্থ মেনকাকে কোশা কুশী ও বারি আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে মেনকা ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিল ঋষিরাজ এত দিনের পর অদ্য আপনার মনে সন্ধ্যার আবির্ভাব হইল, এ কি আশ্চর্য্য। এই ব্যঙ্গ্যোক্তিতে তপোধন অত্যন্ত কুপিত হইলেন। মেনকা ভয় প্রযুক্ত পলায়ন করিল।

ইতিমধ্যে মেনকা অন্তর্বত্নী হইয়াছিল, অতএব কাননমধ্যে গমন করিতে করিতে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে, এক কন্যা প্রসব করিয়া, তাহাকে অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিল। ঈশ্বরেচ্ছায় নিয়তি প্রযুক্ত ঐ ত্যক্ত কন্যা কিয়ৎকাল এক শকুন্ত কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা হইল। পরে মালিনীতীরস্থ আশ্রমবাসী পরম কারুণিক কণ্বনামা এক মহর্ষি ঐ অরণ্যে ফলান্বেষণে গিয়া, ঐ কন্যাকে অনাথা দেখিয়া, আপন আশ্রমে আনয়ন করিলেন, এবং শকুন্ত কর্ত্তৃক রক্ষিতা প্রযুক্ত শকুন্তলা নাম দিয়া, কন্যার ন্যায় লালন পালন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মুনিপালিত বালিকার যেমন ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমনি তাহার রূপ লাবণ্যাদি সুধাংশুকলার ন্যায় উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হইতে লাগিল। শৈশব কালাতিক্রম হইলে শকুন্তলা, অরণ্যবাসিগণের নিয়মানুসারে বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিতেন, কিন্তু তাহাতে শরীরশোভার কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, বরঞ্চ শৈবাল সঙ্গে কমলিনী যেরূপ এবং কলঙ্ক সম্পর্কে কলানিধি যেরূপ সৌন্দর্য্যাতিশয় ধারণ করে, তাদৃশ, বল্কল ধারণে তাঁহার শরীরমাধুরী অত্যন্ত মনোহারিণী হইয়াছিল।

কণ্বমুনি তাঁহাকে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে

লাগিলেন, তাহাতে শকুন্তলা নানা বিদ্যায় বিদ্যাবতী হইলেন। শকুন্তলা শৈশবাবস্থা হইতেই কণ্ব মুনির আদেশানুসারে তন্নির্ম্মিত পুষ্পকাননের সেবায় অতিশয় ঔৎসুক্যবতী ছিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা নাম্নী সমবয়স্কা দুই প্রতিবাসিনীর সমভিব্যাহারে প্রত্যহ সায়ং ও প্রাতঃকালে বৃক্ষ লতাদিতে জল সেচন করিতেন এবং তাবৎ বৃক্ষের প্রতি সহোদর তুল্য স্নেহ করিতেন।

এক সময়ে কুলপতি কণ্বমুনি শকুন্তলাকে গৃহে রাখিয়া সোম তীর্থে গমন করিলেন। ইত্যবসরে দুষ্মন্ত নামধেয় পুরুবংশীয় এক মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতি সসৈন্যে মৃগয়ার্থ গমন করিয়া, নানা অরণ্যে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বহুতর জীব জন্তু বধ করিতে করিতে, হিরণ্যারণ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তথায় এক পর্ণশালা আছে, তন্নিকটে এক পুষ্পবনে নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, পুষ্পপ্রলীন অলিগণ মধুপানে মত্ত হইয়াছে, মধুরালাপী পক্ষিগণ মধুরস্বরে গান করিতেছে, কিয়দ্দূরে মালিনীতটে ঋষিগণের যজ্ঞবেদী হইতে অগ্নিহোত্রাদির ধূম সমুদায় গগন স্পর্শ করিতেছে এবং মুনিগণ বেদপাঠ করিতেছেন।

রাজা এই সকল অবলোকন করিয়া, সৈন্যগণকে কহিলেন তোমরা সকলে এই স্থানে অবস্থান কর,

আমি মুনিদিগকে প্রণাম করিয়া আসি। ইহা বলিয়া রাজা, কুলপতি কণ্বমুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। তৎকালে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা এই দুই সহচরীর সহিত শকুন্তলা পুষ্পোদ্যানে জল-সেচন এবং পরস্পর রহস্যালাপ করিতেছিলেন। রাজা তাহাদের আলাপ-শ্রবণে ও অঙ্গভঙ্গী দর্শনে কৌতুকী হইয়া, বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং মুনিকন্যাগণের নানাবিধ বাক্যকৌশল শ্রবণ ও রূপমাধুরী অবলোকনে পরমানন্দিত হইয়া তাহাদের সম্মুখে আসিবার উদ্‌যোগে থাকিলেন। ইতিমধ্যে একটা ভ্রমর পুষ্পবৃক্ষে জল সেচন জন্য অস্থির হইয়া, পুনঃপুনঃ শকুন্তলার কমলাননে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে ব্যাকুলিতা করিল। তাহাতে শকুন্তলা সহচরীগণের নিকট দুষ্ট-মধুকর-হইতে পরিত্রাণের প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহারা তাহাতে কৌতুকাবিষ্টা হইয়া উত্তর করিল যে, তপোবনের রক্ষাকর্ত্তা রাজা, পরিত্রাণের বিষয়ে আমাদের কি শক্তি, দুষ্মন্ত রাজাকে স্মরণ কর, তিনি রক্ষা করিবেন।

এইরূপ বচনোপন্যাস করিলে, রাজা সহর্ষ হইয়া বিবেচনা করিলেন ইহাদের সমক্ষগত হইবার এই এক উত্তম সময়। ইহা ভাবিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শকুন্তলা রাজাকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা কহিলেন, হে সুন্দরি

আমি দুষ্মন্ত রাজা, কণ্ব মুনির সহিত সাক্ষাৎ করণা-কাঙ্ক্ষায় এখানে আসিয়াছি, মুনিরাজ কোথায় ? শকুন্তলা রাজার পরিচয়ে আপনাকে এবং তপো-বনকে শ্লাঘ্য জ্ঞান করিয়া, তাঁহার উপবেশনার্থ কুটীর হইতে কুশাসন আনিয়া দিয়া, বলিলেন মুনিরাজ তীর্থে গমন করিয়াছেন, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি তাঁহার দুহিতা, আপনার সেবা করিতেছি।

রাজা এই কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে রূপ-বতি আমি তোমার অনুপম রূপাবলোকনে তুষ্ট হই-লাম। কিন্তু মুনিরাজ পরম ধার্ম্মিক, ফলমূলাহারী, দারত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী। তুমি কিরূপে তাঁহার কন্যা, আমাকে স্বরূপ বাক্যে বল। ইহাতে শকুন্তলা মুনিপ্রমুখাৎ শ্রুত স্বকীয় জন্ম-বৃত্তান্ত আনু-পূর্ব্বীক সকল কহিলেন। রাজা তাহা শুনিয়া তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি কতিপয় দিবস ঐ ধর্ম্মারণ্যে অবস্থিতি করিলেন। তাহাতে পরস্পরের সদ্ব্যবহার ও রূপ লাবণ্যে পরস্পর মোহিত হইলেন। অনন্তর রাজা এক দিবস শকুন্তলাকে কহিলেন, শকুন্তলে তুমি এমন রূপবতী, তাপস-কুটীরে ঈদৃশ দুঃখিনীর বেশে অবস্থান করাতে এতদ্রূপ অনুপম সৌন্দর্য্যের মলি-নতাই বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব মৎপ্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে বরণ করিয়া আমার রাজ-

মহিষী হও, এবং বৃক্ষবল্কল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পট্টাম্বর পরিধান কর।

শকুন্তলা রাজার এই বাক্যে লজ্জিতা হইলেন, কিন্তু রাজার রূপ ও সদ্ব্যবহারাদি দর্শনে তাঁহারও মনে প্রণয় সঞ্চার হইয়াছিল, অতএব অনায়াসে পাণিদানে সম্মতা হইলেন। তদনন্তর শুভ ক্ষণে গান্ধর্ব্ব-বিধান দ্বারা দুষ্মন্ত রাজা শকুন্তলাকে বিবাহ করিলেন। পরে ধর্ম্মারণ্যে কিয়ৎকাল মুনিকন্যার সহিত একত্রে অবস্থিতি করিয়া, স্বহস্তস্থিত স্বনামমুদ্রিত এক অঙ্গুরীয় প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে গমন করিলেন।

রাজার গমনান্তে শকুন্তলা তদ্বিরহে অত্যন্ত কাতর হইলেন। এক দিবস তিনি কুটীর মধ্যে একাকিনী অনন্যমনা হইয়া একান্তে পতিচিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দুর্ব্বাসা নামক এক অত্যুগ্র তপস্বী তথায় উপস্থিত হইয়া শকুন্তলার স্থানে আতিথ্য যাচ্ঞা করিলেন। কিন্তু শকুন্তলা স্বীয় স্বামীর ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন, তাহাতে অতিথির বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। মহর্ষি, অতিথির প্রতি অনাদর করিল, এই বিবেচনায় কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, যাহাকে একান্ত চিত্তে চিন্তা করত আমাকে অনাদর করিলে, তোমার চিন্তার আধার সেই ব্যক্তি চেতিত হইলেও তোমাকে স্মরণ করিবে না।

ইহা বলিয়া দুর্ব্বাসা মুনি তথা হইতে সত্বর গতিতে প্রস্থান করিলেন।

ঐ সময়ে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা সহচরীদ্বয় পুষ্পোদ্যানে পুষ্প-চয়ন করিতেছিল, তাহারা ঐ শাপশব্দ শ্রবণ করিয়া দেখিল সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান কোপ স্বরূপ দুর্ব্বাসা শাপ প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছেন। অতএব অনসূয়া দ্রুতগমন পুরঃসর ঋষি-সমীপে গিয়া তাঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক, শকুন্তলার অনবধানের কারণ বিস্তারিত রূপে বিজ্ঞাপন করিল এবং বহুতর বিনয় দ্বারা তাঁহার ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত যত্ন করিল। মুনিবর তাহার বিনয়ে বশীভূত হইয়া উত্তর করিলেন, যাহা কহিয়াছি তাহা কদাচ অন্যথা হইবে না, তবে যদি শকুন্তলা রাজার দত্ত কোন চিহ্ন সন্দর্শন করাইতে পারে তাহা হইলে, রাজা তাহাকে চিনিতে পারিবেন। এই কথা বলিতে বলিতে মুনিরাজ অন্তর্হিত হইলেন। পরে দুই সখী একত্র হইয়া মুনির মন্যুবিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে, এক জন কহিল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, কিন্তু ইহা নিতান্ত খেদের বিষয় নহে। যেহেতু রাজদত্ত এক অঙ্গুরীয় শকুন্তলার হস্তে আছে, তাহা প্রদর্শন করাইলেই রাজা অবশ্য ইহাকে চিনিতে পারিবেন। যাহা হউক, একথা সম্প্রতি প্রকাশ করণের প্রয়োজন নাই, কেননা শকুন্তলা একে পতি-

বিরহে কাতরা, তাহাতে এই শাপের কথা শুনিলে তাহার দুঃখাগ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইবে।

এইরূপ কথোপকথনের পর সখীদ্বয় শকুন্তলার কুটীরে আগমন করিয়া দেখিল তিনি বামহস্তে বদনার্পণ পূর্ব্বক চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলা হইয়া পতি-চিন্তা করিতেছেন। তাহারা উভয়ে তাঁহাকে নানা-প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিল। এইরূপে কিয়ৎ দিবস গত হইল।

পরে কণ্বমুনি তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাগত হইয়া দুষ্মন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার বিবাহের বৃত্তান্ত অব-গত হইয়া, তাহাতে কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না, বরঞ্চ সুপাত্রের সহিত সংমিলন হওয়াতে, সেই সঙ্ঘটনকে সৌভাগ্য ও সুখজনক জ্ঞান করিয়া আহ্লাদিত হইলেন, এবং শকুন্তলার বিবেচনার বিস্তর প্রশংসা করিলেন।

এ দিকে দুষ্মন্ত রাজা নিজালয়ে গমন অবধি শকুন্তলার তত্ত্বান্বেষণ করিলেন না। কণ্বঋষি মনে মনে এই বিবেচনা করিলেন যে, পিতৃগৃহে যুবতী কন্যা থাকা উচিত নহে। কেননা তাহাতে অধর্ম্ম, অপযশ ও চরিত্রদোষ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। তরুণী কন্যা পিত্রালয়ে বহু ধর্ম্ম শালিনী হইলেও পবিত্রা নহে। এই সকল বিবেচনায়, বিশেষতঃ শকুন্তলার গর্ব্ভ লক্ষণ

দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে স্বামি-সদনে প্রেরণ করা স্থির করিলেন, এবং তাঁহাকে পতিগৃহে লইয়া যাইবার জন্য স্বীয় ভগিনী গৌতমীকে এবং শারঙ্গরব ও সারদ্বত নামা দুই শিষ্যকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা শকুন্তলাকে হস্তিনা নগরে রাজার নিকটে লইয়া যাও। এই আজ্ঞা পাইয়া গৌতমী ও শিষ্যদ্বয় গমনের সজ্জাদি করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা যে পতির বিচ্ছেদে সতত বিমর্ষযুক্তা থাকিতেন, তাঁহার সহিত পুনর্মিলনের আশায় যদিও হৃষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহাতে অরণ্যবাসিনী প্রতিবাসিনী তপস্বিনীদিগের সহিত বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় খিদ্যমানা হইলেন। পরে একে একে সকল সঙ্গিনী ও প্রতিবাসিনীর স্থানে বিদায় হইতে গেলেন। তাহাতে তাঁহারা কেহ, রাজার পরম প্রেয়সী হও, কেহবা বীরপ্রসবিনী হও, এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং কণ্ব মুনি যদিও বনবাসী ও জিতেন্দ্রিয়, তথাপি, শকুন্তলাকে এতকাল পালন করিয়াছিলেন এখন তিনি পতিগৃহে গমন করিবেন আর সাক্ষাৎ হইবে কি না, এই ভাবিয়া, অতিশয় কাতর হইয়া নানাপ্রকার খেদ করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া পিতৃচরণে প্রণিপাত করিলে, মুনিবর তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, যযাতি রাজার পত্নী

শর্ম্মিষ্ঠা যাদৃশ প্রেয়সী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও পতির প্রিয়পাত্রী হইয়া এক রাজরাজেশ্বর পুত্র লাভ কর।

এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিলে পর, শকুন্তলা মুনিশিষ্য সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। মুনি যদিও বিদায় দিলেন তথাপি স্নেহবশতঃ কন্যার সঙ্গে সঙ্গে কতক দূর চলিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয়ও তাঁহার সঙ্গে গমন করিল। এই ভাবে সপরিবারে কিয়ৎ দূর গমন করিয়া এক সরোবর তীরে উপনীত হইয়া তত্রস্থ এক বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া সকলে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর শারঙ্গরব প্রভৃতি সঙ্গী শিষ্যগণ কণ্বমুনিকে কহিলেন হে আচার্য্য, আপনি আর কত দূর গমন করিবেন, এই স্থান হইতে প্রতিগমন করুন, আমরা শকুন্তলাকে লইয়া যাইতেছি। কণ্বমুনি কহিলেন হে শারঙ্গরব আমার প্রতিনিধি স্বরূপ তুমি শকুন্তলাকে রাজার সমক্ষে উপনীত করিয়া রাজাকে কহিবে, তপস্যা মাত্র আমাদের ধন, আর আপনার অতি উৎকৃষ্ট বংশ, এবং আপনাতে এই শকুন্তলার স্বতঃ প্রণয়প্রবৃত্তি হইয়াছিল, এইসমস্ত বিবেচনা করিয়া অন্যান্য স্ত্রীতে যাদৃশ অনুরাগ করেন তত্তুল্য ভাবে ইহার প্রতিও কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। অতঃপর দৈবাধীনে যাহা ঘটে তাহা স্ত্রীবন্ধুগণের প্রার্থনাতীত।

পরে শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে এক্ষণে তোমাকে উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর। পতিগৃহে গিয়া গুরু-সম্পর্কীয় জনগণের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীসমূহের সহিত সখিতাচরণ করিবে, এবং স্বামী কোন কারণ-বশতঃ রুষ্ট হইলেও অভিমান করিবে না। অপর পরিজনের প্রতি সর্ব্বদা অনুকূল দৃষ্টি রাখিবে, এবং ঐশ্বর্য্য বস্ত্রালঙ্কারাদি সুখ সম্ভোগে অনাসক্তচিত্তা হইবে। এবম্প্রকার সদ্ব্যবহার করিলে যুবতীরা কুল-লক্ষ্মী স্বরূপ গৃহিণী-শব্দ-বাচ্যা হয়।

এইরূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কণ্ব মুনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন। শকুন্তলা জনকের এই সকল উপদেশ শ্রবণে এবং অবিলম্বে বিশ্লেষ সম্ভা-বনায়, অত্যন্ত ব্যাকুলিতা হইয়া কহিলেন জনকের অঙ্কভ্রষ্টা হইয়া আমি কিরূপে দেশান্তরে জীবন ধারণ করিব। কণ্বমুনি কহিলেন বৎসে তুমি কি জন্য কাতর হইতেছ। বহু পরিজন বিশিষ্ট স্বামীর গৃহিণীপদে অভিষিক্ত হইয়া, গৃহকার্য্যের বাহুল্য প্রযুক্ত নিরন্তর ব্যস্ত থাকিয়া এবং প্রাচীদিকের ন্যায় সূর্য্যতুল্য তনয় প্রসব করিয়া, আমার বিরহ-জনিত শোক বিস্মৃত হইবে।

অনন্তর শকুন্তলা পিতাকে প্রণাম করিয়া সখীদ্বয়কে আলিঙ্গন করিলেন। সখীদ্বয় তদ্বিরহ জন্য মনোদুঃখ

প্রকাশ করিয়া কহিল, সখি যদি দৈবায়ত্ত মহারাজ তোমাকে সহসা চিনিতে না পারেন তবে রাজদত্ত তন্নামাঙ্কিত তোমার অঙ্গুরীয়ক দেখাইবে, তাহা হইলে তিনি তোমাকে চিনিতে পারিবেন। শকুন্তলা কহিলেন সখি এই কথায় আমার অন্তঃকরণ ত্রাসযুক্ত হইতেছে। সখীদ্বয় কহিল ভয় নাই, স্নেহপ্রযুক্ত এই আশঙ্কা মাত্র।

এই প্রকার কথোপকথন কালে শারঙ্গরব কহিলেন আচার্য্য, বেলা হইয়া উঠিল, অতএব সত্বর হউন। ইহাতে শকুন্তলা পিতাকে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া কহিলেন হে জনক পুনর্ব্বার কত দিনে আমি আপনকার চরণ ও এই তপোবন দর্শন করিব। মুনি উত্তর করিলেন বৎসে আসমুদ্র-ক্ষিতিপতির পত্নী হইয়া উপযুক্ত পুত্র প্রসব করিয়া, তাহাকে রাজ্যভারার্পণ পূর্ব্বক স্বামীর সহিত শান্তির নিমিত্ত এই আশ্রমে প্রত্যাগমন করিবে, সম্প্রতি শুভ যাত্রা কর, পরমেশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। ইহা বলিয়া সকলে শোকাবিষ্ট চিত্তে স্ব স্ব উদ্দেশ্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।

শকুন্তলা, গৌতমী ও কণ্বশিষ্য দ্বয় সমভিব্যাহারে কয়েক দিবস গমনানন্তর হস্তিনা নগরে উপনীত হইয়া তত্রস্থ নদীতে স্নানাদি করিলেন। স্নানকালে, শকুন্তলার অঙ্গুলীতে রাজদত্ত যে অঙ্গুরীয়ক ছিল, তাহা

নদীতে পড়িল। শকুন্তলা তাহা জানিতে পারিলেন না। পতির সহিত পুনর্ম্মিলনের সুখচিন্তায় বিহ্বল-প্রায় হইয়া হস্তে অঙ্গুরীয় আছে কি না একবারও তাহা ভাবিলেন না। স্নানাদির পর সকলে একত্র হইয়া রাজদ্বারে গমনপূর্ব্বক দৌবারিককে কহিলেন আমরা কণ্বমুনির আজ্ঞাবহ, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব; অতএব রাজাকে আমাদের সংবাদ দাও। দৌবারিক রাজসাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকা বাসী সস্ত্রীক ঋষিগণ কণ্বমুনির আজ্ঞাবহ হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত, মহারাজের দর্শন প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব যেমন আজ্ঞা হয়। রাজা সস্ত্রীক ঋষিগণের আগমন সংবাদে বিস্ময়াপন্ন হইয়া আজ্ঞা করিলেন পুরোহিতকে কহ তিনি তপস্বিগণকে যথাবিহিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাঁহা-দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপযুক্ত স্থানে আনয়ন করেন, আমিও তথায় আসিতেছি।

ইহা শুনিয়া দৌবারিক প্রস্থান করিল। রাজাও নিরূপিত স্থানে আসিয়া মুনিগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং মুনিকন্যাদিগের আগ-মনের কারণ অনুমান করিতে না পারিয়া, বেত্র-বতী নাম্নী পরিচারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন বেত্রবতি কি নিমিত্ত ভগবান্ কণ্ব ঋষিদিগকে আমার নিকট

শ্রবণ করিয়াছেন। কোন দুরাত্মা কি তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন কিম্বা ধর্ম্মারণ্যবাসিদের কাহার প্রতি অত্যাচার করিতেছে, আমি ইহার কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না, তাহাতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি। পরিচারিণী কহিল মহারাজ আপনকার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে কুত্রাপি কোন বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। বোধ হয় আত্মীয়তা হেতু ঋষিগণ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া থাকিবেন।

উভয়ে এবম্বিধ আলাপ হইতেছে, এমন সময়ে পুরোহিত শকুন্তলা ও তৎসমভিব্যাহারীদিগকে রাজার নিকট লইয়া আসিলেন। আসিতে আসিতে শকুন্তলা দক্ষিণ নেত্র স্পন্দনে অশুভাশঙ্কায় ভীতা হইয়া গৌতমীকে তাহা জানাইলেন। গৌতমী, বৎসে তোমার অমঙ্গল দূর হইয়া সুখ বৃদ্ধি হউক, ইহা কহিয়া সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর সকলে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, রাজা শকুন্তলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রতীহারীকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন ঋষিগণমধ্যে অবগুণ্ঠনবতী এবং ঈষৎব্যক্তলাবণ্যা এই কামিনী কে? প্রতীহারী কহিল মহারাজ পরম সুন্দরী, দর্শনের উপযুক্ত পাত্রী। রাজা কহিলেন পরস্ত্রী দর্শনীয় নহে।

অনন্তর রাজপুরোহিত রাজার সহিত ঋষিগণের সাক্ষাৎ ও আলাপাদি করাইয়া দিলেন। পরে কণ্ব-

শিষ্য আশীর্ব্বাদ জানাইয়া কহিলেন, যে, আমাদের উপাধ্যায় মহাত্মা কণ্বঋষি আজ্ঞা করিয়াছেন, মহারাজ গোপনে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি আনন্দিত হইয়াছেন, কেননা যে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে পাণিগ্রহণ সমাধা হয়, তিনি যদি তুল্যগুণ বর কন্যার পরস্পর মিলন করিয়া দেন, তবে কদাচ নিন্দনীয় হন না। অতএব সম্প্রতি অন্তঃসত্ত্বা এই শকুন্তলাকে সহধর্ম্মাচরণার্থ গ্রহণ করুন। গৌতমী কহিলেন, বৎস এই শকুন্তলা বিবাহকালে স্বীয় গুরুজনের অনুমতি অপেক্ষা করে নাই, তুমিও বন্ধু জনকে কিছু মাত্র জিজ্ঞাসা কর নাই। অতএব তোমাদের উভয়ের পরস্পরানুরাগ বিষয়ে তোমরাই প্রমাণ।

দুষ্মন্ত রাজা শকুন্তলাকে ধর্ম্মারণ্যে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কিছুমাত্র স্মরণ ছিলনা, অতএব কণ্বশিষ্য ও গৌতমীর বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, তোমরা কি কথা কহিতেছ, ইহা আমার উপন্যাস জ্ঞান হইতেছে। এই কথা শুনিয়া শকুন্তলা মনে মনে কহিলেন, হা, রাজার আকার দ্বারা বোধ হইতেছে ইনি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছেন। শারঙ্গরব রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন কি, ইহা উপন্যাস কহা যাইতেছে, মহারাজই ইহার সমস্ত বিবরণ অবগত আছেন। যাহা হউক, যুবতীগণ যদিও যথার্থতঃ

সতী হউন তথাপি নিবন্তব পিতৃগৃহে বাস কবিলে লোকে অন্যথা আশঙ্কা কবিযা থাকে, এই কাবণ বন্ধু-বর্গেব কর্ত্তব্য যে, পতিব নিকট তাহাদিগকে প্রেরণ কবিয়া কন্যাভাব হইতে উত্তীর্ণ হন। ইহা শুনিযা রাজা কহিলেন, কি, ইহাকে আমি বিবাহ কবিয়াছি! এই বাক্যে শকুন্তলা অতিবিস্মিতা হইযা মনে কবিলেন, হা ঈশ্বব, মনে মনে যে আশঙ্কা হইয়াছিল তাহাই ঘটিল। শাবঙ্গবব কহিলেন প্রথমে এক কার্য্য কবিযা পশ্চাৎ তাহাব প্রতি ঘৃণা কবাতে ধর্ম্মেব প্রতি দ্বেষ কবা হয়, তাহা কি বাজাব উচিত কর্ম্ম। রাজা বলি-লেন আপনি আমাব প্রতি কেন এমন অসৎ কল্পনীয প্রস্তাব কবিতেছেন। শাবঙ্গবব ক্রোধভাবে বলিলেন, ঐশ্বর্য্যশালী হইলেই প্রায এই প্রকাব মত্ততা হইযা থাকে। রাজা কহিলেন এতাদৃক্ কটু কষায বাক্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

পবস্পব এই প্রকাব বাগ্বিতণ্ডা হইলে, গৌতমী শকুন্তলাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি লজ্জিতা হইও না, তোমাব মুখাববণ বসন উত্তোলন কবি, তাহা হইলে রাজা তোমাকে চিনিতে পাবিবেন। ইহা কহিযা গৌতমী তদ্রূপ করিলেন। রাজা তাঁহাব পবম মনোহব রূপ সন্দর্শনে মনে মনে চিন্তা কবিতে লাগি-লেন, আমি ইহাকে পূর্ব্বে বিবাহ কবিয়াছি কি না, স্মবণ

হইতেছে না। কিন্তু ভ্রমর যেমন নিশাবসানে শিশিরাবৃত কুন্দ কুসুম মধু সম্ভোগ করিতে পারে না, পরিত্যাগ করিতেও পারে না, তাদৃশ আমি এই যুবতী অনুপমলাবণ্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীকে এক্ষণে গ্রহণ করিতেও পারি না, পরিত্যাগ করিতেও পারি না। রাজা মৌনভাবে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে শারঙ্গরব কহিলেন—মহারাজ, ইহাকে কি পরস্ত্রী জ্ঞান করিতেছেন। রাজা বলিলেন, হে তপোধন, নানাবিধ চিন্তা করিয়াও স্মরণ হইতেছে না যে ইহাকে পরিণয় করিয়াছি, অতএব কিরূপে আপনাকে ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গারস্বরূপে স্বীকার করিয়া গর্ব্ভলক্ষণাক্রান্তা এই রমণীকে গ্রহণ করিব।

রাজার এই বাক্য শ্রবণে শকুন্তলার শিরে যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি মনে মনে কহিলেন, হা ঈশ্বর, বিবাহেতেই যদি রাজার সংশয় হইল, তবে আর অন্য আশাসমূহ সুতরাং নিষ্ফল হইল। শারঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ, শকুন্তলার প্রতি এরূপ অত্যাচার করণে অতি অন্যায়াচরণ হইতেছে, কেননা যাহার যে বস্তু তাহাকে তাহা সমর্পণ করিতে উদ্যত যে মহর্ষি কণ্ব মহাশয়, তাঁহার অপমান করা হইল। সারদ্বত কহিলেন, শারঙ্গরব আর কোন কথার প্রয়োজন নাই এক্ষণে ক্ষান্ত হও। পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, ভগিনি,

আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলা হইল, রাজা যাহা কহিলেন তাহা শ্রবণ করিলে, এক্ষণে তোমার যাহা বক্তব্য থাকে তাহা জানাও।

শকুন্তলা মনে মনে ভাবিলেন, রাজা যে সকল কথা বলিলেন তাহাতে আর পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া দিলে কি ফলোদয় হইবে, যাহা হউক তথাপি আপনার পরিশুদ্ধতা প্রকাশার্থ কিঞ্চিৎ বলি, ইহা আলোচনা পূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে স্বামিন্, কিন্তু স্বামী শব্দ উচ্চারণ করিয়াই অতিশয় লজ্জিতা হইলেন, কেননা বিবেচনা করিলেন, যাহার বিবাহেতে সন্দেহ প্রকাশ হইতেছে, তাহার প্রতি এরূপ সম্বোধন এক্ষণে লজ্জাকর। অতএব তাহা সংশোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পুরুবংশপ্রধান তোমার কি স্মরণ নাই, অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া কণ্বমুনির কুটীরে উপস্থিত হইলে, মুনির তীর্থ গমন হেতু যে তোমাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, এবং তুমি সদ্ভাবদ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া যাহার হৃদয়-কবাট নিঃশেষে উদ্‌ঘাটন করিয়া মনোহরণ করিয়াছিলে, যাহাকে সুমধুর প্রণয়ালাপ দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলে, সম্প্রতি এরূপ বিদারুণ হইয়া নীরস বচনে লোকসমাজে তাহার এপ্রকার অপমান করা অনুচিত।

রাজা এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া হস্ত দ্বারা কর্ণদ্বয়

আচ্ছাদিত করিয়া, রাম রাম শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন, যেমন সিন্ধু প্রবল তরঙ্গ দ্বারা স্রোতের ভ্রম জন্মায় এবং তটস্থ তরুকে পতিত করে, তদ্রূপ তুমি ছল দ্বারা আমাকে ভ্রান্ত ও পতিত করিতে কেন চেষ্টা করিতেছ। ইহা শুনিয়াও শকুন্তলা পুনর্ব্বার কহিলেন, ভাল যদি পরিণয় বিষয়ে নিতান্ত সন্দিগ্ধ হইয়া এরূপ কহিতেছ তবে কোন চিহ্ন দ্বারা তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি। রাজা কহিলেন উত্তম কল্প বটে। অনন্তর শকুন্তলা রাজদত্ত অঙ্গুরীয়ক তত্ত্ব করিতে ব্যগ্রা হইয়া, অঙ্গুরীয়স্থান সন্ধান করিয়া দেখিলেন যে অঙ্গুলী অঙ্গুরীয় শূন্য, তাহাতে নিতান্ত বিষণ্ণা হইয়া গৌতমীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গৌতমী কহিলেন, বুঝি শক্রাবতারে শচীতীর্থের জল বন্দনা করণকালে তথায় অঙ্গুরীয় পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকিবে।

ইহাতে রাজা কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, এ কেবল স্ত্রীজাতির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মাত্র। শকুন্তলা কহিলেন, বিধাতার বিড়ম্বনাতে এই সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। এক দিবস বেতস লতার মণ্ডপ মধ্যে তোমার হস্তে পদ্ম-পত্র-পুটে জল ছিল। তৎকালে এক মৃগশাবক সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাতে তুমি কহিলে যে এই শাবক জল পান করুক। ইহা বলিয়া জল পান করিতে দিলে। কিন্তু শাবক তাহা

পান করিল না। অনন্তর তোমার হস্ত হইতে সেই জল আমি লইলে, সে আনন্দে আমার হস্তে পান করিল। ইহা দেখিয়া তুমি কৌতুক করিয়া কহিলে যে সকলেই স্বজনে বিশ্বাস করিয়া থাকে, যেহেতু তোমরা উভয়েই বনবাসী। রাজা কহিলেন আহা, আত্মকার্য্যসাধনতৎপরা স্ত্রীজাতি মনোহর রূপ ধারণ পূর্ব্বক অমৃতবাক্য দ্বারা বিষয়িগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। গৌতমী কহিলেন এতাদৃশ অনুচিত বাক্য কদাচ উচ্চারণ করিবেন না। তপোবনে প্রতি-পালিত ব্যক্তি ছল চাতুরীতে স্বভাবতঃ অনভিজ্ঞ। রাজা কহিলেন, হে প্রাচীনে, পশুজাতি-স্ত্রীরও শিক্ষা-পটুতা দেখা যায়, তাহার প্রমাণ কোকিলাগণ শাবক সকলের উড্ডয়ন শক্তি জন্মিবার পূর্ব্বে, অন্য পক্ষি-দ্বারা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। যাহা-দিগের বোধাধিকার আছে তাহাদের কথা কি কহিব, অরণ্যে থাকিলেও তাহাদের শঠতা যায় না। এই বাক্যে শকুন্তলা কুপিতা হইয়া কহিলেন হে অবিচক্ষণ তুমি আপনার মত সকলকেই বিবেচনা করিতেছ, তোমার ন্যায় তৃণাচ্ছন্ন কূপের সদৃশ কপটধর্ম্মচারী আর কে হইবে।

এই কথায় রাজা মনে মনে কহিলেন ইহাকে বিবাহ করিয়াছি তাহা আমার স্মৃতি না হওয়াতে, নির্জ্জনে

যে প্রণয় হইয়াছিল, কহিতেছে, তাহা অমান্য করণে ইহার ক্রোধোদয় হইয়া নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছে। এই প্রকার পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা কহিলেন হে মান্যে, দুষ্মন্তের চরিত্র প্রজাসমীপে প্রচার আছে, তুমি এইমাত্র দর্শনে তাহার কি বিবেচনা করিবে। শকুন্তলা বলিলেন লোকের ধর্ম্মাচরণের বৃত্তান্তের প্রমাণ তোমরাই জান, লজ্জাভিভূত মহিলাগণ তাহার কি জানিবে। কিন্তু হে সত্তম এক্ষণে তোমার নিকটে আত্মকার্য্যসাধিনী হইয়া গণিকারূপে গণিতা হইলাম। কিন্তু তোমার কি কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় নাই, তুমি রাজ্যেশ্বর, রাজ্যভোগে ক্ষুদ্র কথা বিস্মৃত হওয়া তোমার সম্ভব। কিন্তু একথা তাদৃশ নহে, তুমি মনে ভাবিয়া দেখ, আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, তোমা ব্যতিরেকে আমি আর অন্য কোন মনুষ্যকে জানি না। হে মহারাজ, তুমি আরো বিবেচনা করিয়া দেখ, মনুষ্যের জ্ঞাতসারে মিথ্যা কহা উচিত নহে। যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে সে জগতের অমান্য হয় এবং চরমে পরম পদার্থ হারাইয়া নরকগামী হয়। গোপনে মিথ্যা কহিলে তাহা মানব-মণ্ডলী মধ্যে প্রকাশ হয় না বটে, কিন্তু সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নিকট অপ্রকাশিত থাকে না। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বহ্নি, পৃথিবী, জল, আকাশাদিও সকলে তাহা দেখিতে পায়। সন্ধ্যা প্রাতঃ

ইহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রমাণ-স্বরূপ হইয়া ভবিষ্যতে সাক্ষ্য প্রদান করে, ধর্ম্মরাজ তদনুসারে তাহার দণ্ড বিধান করেন। অতএব মিথ্যা অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ নাই। মহারাজ কখন মিথ্যা কহিও না। আমি পতিব্রতা নারী, আমাকে নীচ বিবেচনায় অবজ্ঞা করিও না। পণ্ডিতগণ কুলপালিকা প্রেয়সীর বহু দোষেও তাহাকে ক্ষমা করেন। পত্নী পতির অর্দ্ধ শরীর, তাহার আনুকূল্যে সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। দার-বিহীন গৃহ অরণ্যপ্রায়, জায়া সহ কাননে থাকিলেও গৃহস্থ আখ্যায় আখ্যাত হয়। ভার্য্যাহীন লোক সর্ব্বত্র অবিশ্বাসী, সর্ব্বদা দুঃখী এবং সতত উদাসচিত্ত, ভার্য্যা-বন্ত লোকেরা পরম সুখে কাল ক্ষেপণ করিয়া, নির্দ্ধন হইয়াও মহাদুঃখে বিমোচন পায়। পতি বর্ত্তমানে পতিব্রতা পত্নী লোকান্তরগত হইলেও, সে স্বামীর আগমনে, সুধাকাঙ্ক্ষী চকোরের ন্যায়, পথ চাহিয়া থাকে, তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইলে তাহাকে পরিত্রাণ করিয়া স্বর্গভোগী করে, ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে। বিশেষতঃ ভার্য্যা দ্বারা পুত্র উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা লোক-সমূহ ইহলোকে পরম সুখ, এবং মরণান্তেও উদ্ধার পায়। কিন্তু পত্নী বিনা দেবতারাও সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন না। মহারাজ, তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রের পার-দর্শী, বিজ্ঞ, বিশারদ, ও সুপণ্ডিত, অতএব আমাকে

অবজ্ঞা করিও না। যদি নিতান্ত অবজ্ঞা কর তবে বিবেচনা করিয়া দেখ, মদীয় গর্ভে ভবদীয় ঔরসজাত সন্তান আছে, আমাকে অবহেলা করিলে আপনার সন্তানকেও অবহেলা করা হইবে।

এই সকল বাক্য শুনিয়াও রাজার এমন মনে হইল না যে এই নারী আমার ভার্য্যা, অতএব প্রত্যুত্তর করিলেন তুমি কেন বারম্বার স্বকপোলকল্পিত কৈতব-বাক্য দ্বারা আমাকে প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিতেছ, আমি ইহার কিঞ্চিন্মাত্রও অবগত নহি।

গৌতমী কহিলেন, বৎসে, তুমি এই পাষাণহৃদয় পুরুবংশীয়ের মিষ্ট বাক্যে ভ্রান্তা হইয়াছিলে, ইহার শরীরে কিছুমাত্র দয়া নাই। এই বাক্যে শকুন্তলা বসনাঞ্চলে বদনাচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শার্ঙ্গরব কহিলেন এ সকল কর্ম্ম পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়াই করা কর্ত্তব্য। কেননা পুরুষের অন্তঃকরণ জ্ঞাত না হইয়া প্রণয় করিলে, ঐ প্রণয়ে অবশেষে শত্রুতা হইয়া উঠে। রাজা কহিলেন কি চমৎকার, তোমরা এই নারীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, আমাকে বিনাপরাধে দূষিত করিয়া আক্ষেপ অনুযোগ করিতেছ। এই কথায় শার্ঙ্গরব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন তোমরা ইঁহার কুৎসিত বাক্য শ্রবণ করিলে, যে ব্যক্তি জন্মাবধি কখন শঠতা শিক্ষা করে নাই, তাহার বাক্য প্রমাণ হইল না,

আব পবপ্রতাবণা অভ্যাসকাবী ব্যক্তিবাই সত্যবাদী। রাজা কহিলেন ভাল, আপনাবাই সত্যবাদী হইলেন, কিন্তু বলুন দেখি, ইহাকে প্রতাবণা কবিয়া আমাব কি লাভ হইবে। শাবঙ্গবব কহিলেন নিপাত লাভ হইবে। রাজা কহিলেন পুরুবংশসন্তানমধ্যে এমন কুসন্তান কেহ এপর্য্যন্ত জন্মে নাই। তোমাব বাক্যের প্রতি আমাব অশ্রদ্ধা হইল। শাবঙ্গবব কহিলেন, শুন বাজা, আর বৃথা উত্তবেব প্রয়োজন নাই, আমবা আজ্ঞানুরূপ অনুষ্ঠান কবিলাম এবং ক্ষান্তও হইলাম, এই শকুন্তলা আপনাব পত্নী, ইহাকে পবিত্যাগই কব বা গ্রহণই কব, ভার্য্যাতে বিবাহকর্ত্তার সর্ব্বতোভাবে প্রভুতা আছে। গৌতমীও এইরূপ কহিয়া, চল বলিযা প্রস্থানোদ্যত হইলে, শকুন্তলা কহিলেন আমি এই ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক নিরাসিতা হইলাম, তোমবাও আমাকে পবিত্যাগ করিতেছ, ইহা কহিয়া বোদন করিতে কবিতে গৌতমীর অনুগামিনী হইলেন।

গৌতমী অবস্থিতি পূর্ব্বক মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, বৎস শারঙ্গবব শকুন্তলা পশ্চাৎ আগমন করিতেছে, স্বামী বিবেচনাপবাঙ্মুখ ধূর্ত্ত হইলেন, এক্ষণে এ দুর্ভাগিনী কি করে। শাবঙ্গবব রুষ্ট হইযা কহিলেন, আঃ দুর্ব্বৃত্তে, এ কি স্বাধীনেব ব্যবহাব কবিতেছ। এই তিরস্কার বাক্যে শকুন্তলা কম্পান্বিতকলেবর হইলেন।

শারঙ্গরব বলিলেন শুন শকুন্তলে, রাজা যাহা কহিতেছেন যদি তুমি সেই প্রকার হও তবে তুমি কুলটা, তোমাতে আমাদের কি কার্য্য, আর যদি তুমি আপনার শুচি ব্রত নিশ্চয় জান তবে পতিগৃহে তোমার দাসীত্বও ভাল, অতএব এই স্থানে সুখে থাক, আমরা গমন করি। ইহাতে রাজা কহিলেন, হে তপস্বিগণ ইহাকে কেন তোমরা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ, দেখ চন্দ্রই কুমুদিনীকে প্রস্ফুটিতা করেন, এবং সূর্য্যই পদ্মিনীকে বিকসিতা করিয়া থাকেন, অতএব বলি, সৎপুরুষের স্বভাব এই যে, পরস্ত্রীস্পর্শে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। শারঙ্গরব পুনরপি কহিলেন, মহাশয় যদি কোন কারণ বশতঃ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া থাকেন তবে, আপনি ধর্ম্মভীরু, কেন দার পরিত্যাগ করেন।

রাজা কহিলেন, ভাল, আপনারা সৎ অসৎ সকলি জ্ঞাত আছেন, অতএব আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমিই যেন বিস্মৃত হইয়াছি, অথবা ইনি মিথ্যা কহিতেছেন, এমন সংশয়স্থলে আমি দারত্যাগী হই, কি পরস্ত্রীস্পর্শ-দোষে দূষিত হই, ইহার ব্যবস্থা কি। ইহাতে পুরোহিত বিচার পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ, এইরূপ হউক, অর্থাৎ এই গর্ভবতী প্রসব-কাল পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি করুন। রাজা কহিলেন কি নিমিত্তে। পুরোহিত কহিলেন মহারাজ, আপনার

পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করণে, আপনার প্রতি পূর্ব্বে আদেশ হইয়াছে, যে আপনি প্রথমে এক চক্রবর্ত্তি-লক্ষণাক্রান্ত পুত্র লাভ করিবেন। অতএব মুনিদৌহিত্র যদি তাদৃশ লক্ষণান্বিত হয, তবে মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক উৎসব করিয়া ইহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইবেন, তাহার অন্যথা হইলে ইহার পিতৃগৃহে গমনই স্থির আছে। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, যাহা আপনাদের অভিরুচি হয় তাহা করুন। অনন্তর পুরোহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বৎসে, এই দিকে আমার সহিত আগমন কর। সেই সময়ে শকুন্তলা অত্যন্ত আক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন হে বসুন্ধরে তুমি বিদীর্ণা হইয়া আমাকে স্থান দান কর। শকুন্তলা এই প্রকার কহিয়া রোদন করিতে করিতে পুরোহিত, তপস্বিগণ এবং গৌতমীর সহিত প্রস্থান করিলেন।

রাজা তাহাদের গমনের পর. চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মুনিতনয়াকে পূর্ব্বে কিছু কহিয়াছিলাম ইহা স্মরণ যেন হইতেছে, কিন্তু বিবাহ করা স্মরণ হয় না। যাহা হউক এই সকল ব্যাপারে আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত খিদ্যমান ও ব্যাকুল হওয়াতে, বোধ করি মুনিকন্যা যাহা কহিয়াছে তাহা সত্যই বা হইবে, এই প্রকার পর্য্যালোচনা করিতে করিতে শয়নার্থে গমন করিলেন।

শকুন্তলা গৌতমী ও কণ্বশিষ্যগণ সমভিব্যাহারে নগরে থাকিলেন। তাঁহারা সকলে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায় রাজার এ কি ব্যবহার, তিনি বিবাহিত পত্নীকে চিনিতে পারিলেন না, এবং তাঁহার বিবাহ অস্বীকার করাতে গর্ভবতী সতী লজ্জায় একবারে মৃতপ্রায় হইয়া থাকিল। রাজাও অনেক চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না যে তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন, এবং অঙ্গুরীয়ের কথা উক্ত হওয়াতেও তাঁহার এমন স্মরণ হইল না যে ধর্ম্মারণ্য হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি শকুন্তলাকে স্বীয় হস্তাঙ্গুরীয় প্রদান করিয়াছিলেন। কবি কালিদাস দুর্ব্বাসা মুনির শাপকে এই বিস্মরণের হেতু করিয়া লিখিয়াছেন। যাহা হউক অবশেষে রাজার ভ্রান্তি বিমোচন হইয়াছিল। তাহার বৃত্তান্ত এই।

এক দিবস রাজা সভায় বসিয়া বিচার করিতেছেন এমন সময়ে নগরপাল এক ব্যক্তির হস্তদ্বয় বন্ধন পূর্ব্বক সূচক ও জালুক নামে দুই জন রক্ষক সমভিব্যাহারে রাজদ্বারে উপনীত হইল। রক্ষকদ্বয় ঐ ব্যক্তিকে প্রহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, অরে দুরাত্মন্ তুই এই মহামূল্য রত্নে উজ্জ্বল নামাক্ষরান্বিত রাজকীয় অঙ্গুরীয়ক কোথায় পাইয়াছিস্ বল্। ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত ভীত হইয়া উত্তর করিল, দোহাই ধর্ম্মাবতার!

আমি এমন কুকর্ম্ম করি নাই। ইহাতে এক রক্ষক কহিল তবে কি তোমাকে উত্তম ব্রাহ্মণ বলিয়া রাজা এই অঙ্গুরীয় সম্প্রদান করিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি কহিল শ্রবণ কর, আমি শক্রাবতারবাসী ধীবর। এই কথা কহিবামাত্র অন্য রক্ষক কহিল অবে বিটলা তোমাকে কি আমরা জাতি আর বসতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। ইহাতে নগরপাল বলিল ভাল ইহাকে ক্রমে ক্রমে সকল কহিতে দাও। রক্ষক যে আজ্ঞা বলিয়া ধীবরকে কহিল আচ্ছা বল্। ধীবর বলিল জাল বড়িশ প্রভৃতি মৎস্য মারণ উপায় দ্বারা আমি কুটুম্ব প্রতিপালন করিয়া থাকি। এক দিবস একটী রোহিত মৎস্য প্রাপ্ত হইলাম এবং তাহা বিক্রয়ার্থে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার উদরমধ্যে এই সুশোভন রত্নাঙ্গুরীয় দর্শন করিলাম। পশ্চাৎ এই স্থানে বিক্রয়ার্থে ক্রেতাগণকে দর্শন করাইতেছি ইত্যবসরে ইহাদের কর্ত্তৃক ধৃত ও গৃহীত হইয়াছি। এই মাত্র আমার বিবরণ। এক্ষণে আপনারা আমাকে প্রহারই করুন বা বধই করুন।

এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া নগরপাল ঐ অঙ্গুরীয়ের আঘ্রাণ লইয়া কহিল, অহে জাম্বুক, ইহা যে মৎস্যোদরে ছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কেননা ইহাতে আমিষের গন্ধ পাইতেছি। অতএব এই আগম দ্বারা এ ব্যক্তি মার্জ্জনা প্রাপ্ত হইতে পারিবে। যাহা হউক, আইস

সকলে বিচারালয়ে গমন করি। ইহা কহিয়া নগর-পাল রাজবাটীর পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া, রক্ষকদ্বয়কে তথায় অপ্রমত্ত ভাবে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং বিচারমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল, এবং রাজগোচরে অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্তির সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল।

রাজা অঙ্গুরীয় দর্শন মাত্র জানিতে পারিলেন যে ইহা আমার অঙ্গুরীয়। এবং তৎক্ষণাৎ শকুন্তলা-বৃত্তান্ত তাঁহার মনোমধ্যে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। তাহাতে স্বভাবতঃ গম্ভীর হইয়াও রাজা সভামধ্যে কিঞ্চিৎকাল অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু তৎকালে তদ্ভাব সংগোপনার্থে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন এবং অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া তন্মূল্য তুল্য সুবর্ণমুদ্রা ধীবরকে পারিতোষিক দিলেন।

তদনন্তর রাজা শকুন্তলা ও কণ্বশিষ্য গণের অন্বেষণে দূত প্রেরণ করিলেন। শকুন্তলা ও কণ্বশিষ্যগণ নগর মধ্যে এক সামান্য স্থানে ছিলেন, রাজদূতগণ তাঁহাদিগকে অঙ্গুরীয়ের পুনঃপ্রাপ্তির বিবরণ অবগত করাইলে, তাঁহারা মনে মনে বিবেচনা করিলেন রাজধানীর সন্নিকটে নদীতে স্নান পূজা কালে অঙ্গুরীয় অবশ্য জলে পতিত হইয়া থাকিবে, তাহা না হইলে মৎস্যোদরে কি প্রকারে যাইবে। যাহা হউক ঐ সংবাদে তাঁহারা পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং

তৎক্ষণাৎ দূত সমভিব্যাহারে রাজ-সদনে উপস্থিত হইলেন। রাজা কণ্ব-শিষ্যগণকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করিলেন, এবং আপনার দোষ স্বীকার করিয়া শকুন্তলাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক পাটেশ্বরী করিলেন।

এই ব্যাপারে গোতমী ও শারঙ্গরব প্রভৃতি কণ্ব শিষ্যগণ মহা সন্তুষ্ট হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে পরমাদরে কয়েক দিবস আপন ভবনে রাখিয়া বহু সমারোহপূর্ব্বক কণ্ব মুনির সদনে প্রেরণ করিলেন।

শকুন্তলা রাজার পরম প্রিয়তমা হইয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। শকুন্তলার স্বভাব অতি রমণীয় ছিল, বনমধ্যে মুনির আশ্রমে প্রতিপালিতা ও শিক্ষিতা হইয়া তিনি মিথ্যা প্রবঞ্চনা কিছুই জানিতেন না। তাঁহার স্বভাব স্বভাবশুদ্ধ এবং অন্তঃকরণ অতি নির্ম্মল ছিল। তিনি সতত বিদ্যালোচনা করিতেন এবং স্বামীকে পরম গুরু জানিয়া সতত তাঁহার সেবা করিতেন। কখন তাঁহাকে উচ্চ বাক্য কহিতেন না। তিনি আপন গুণে রাজাকে এমত বশীভূত করিয়াছিলেন যে তিনি সতত তাঁহার পরামর্শ লইয়া সকল রাজকর্ম্ম করিতেন।

অনন্তর শকুন্তলার গর্ব্ভে এক পুত্র জন্মিল। রাজা ঐ পুত্রের নাম ভরত রাখিয়া তাহাকে উত্তমরূপ বিদ্যাভ্যাস করাইলেন। তাহাতে ঐ পুত্র অত্যন্ত পণ্ডিত ও

বুদ্ধিমান হইলেন। পরে দুষ্মন্ত নৃপতি তাঁহাকে রাজ্য ভার দিয়া শকুন্তলার সহিত তপস্যার্থে বন গমন করিলেন। ভরত সিংহাসনাভিষিক্ত হইয়া অনেক সৎকর্ম্ম ও অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই রাজা অত্যন্ত খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার নামানুসারে এই রাজ্যের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে।

দময়ন্তী।

—০—

বিদর্ভ নগরে ভীমসেন নামে এক নরপতি ছিলেন, তিনি অপত্যাভাবে সতত নিরানন্দ চিত্তে কাল যাপন করিতেন। পরে দমনক নামক এক ঋষি তাঁহার সভায় উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহার যথোচিত সম্মান করিয়া তাঁহার নিকটে পুত্রের কামনা জানাইলেন। মুনিবর রাজার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন তোমার সর্ব্বসুলক্ষণা পরম সুন্দরী এক দুহিতা জন্মিবে। এবং তদর্থে যাহা কর্ত্তব্য তাহার উপদেশ দিলেন। অনন্তর মহীপালের এক কন্যা জন্মিল। রাজা কন্যাকে দেখিয়া পরম সুখী হইলেন, এবং দমনক ঋষির বর-প্রসাদাৎ তাঁহার জন্ম হইয়াছে এইহেতু তাঁহার নাম দময়ন্তী রাখিলেন। তৎপরে ঐ কন্যাকে নানা বিদ্যায় সুশি-ক্ষিতা করাইলেন। কন্যা যেমন রূপবতী তেমনি গুণ-বতী হইলেন। এবং তাহার অতুল্য রূপ ও গুণের সৌরভ দেশ বিদেশে বিখ্যাত হইল।

নিষধ রাজ্যাধিপতি বীরসেন রাজার পুত্র নল, দময়ন্তীর রূপ গুণের প্রশংসা শ্রবণে তদভিলাষী হই-

লেন, এবং তাহাকে কিরূপে প্রাপ্ত হইবেন অহর্নিশি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দময়ন্তীর রূপ গুণের পরীক্ষার্থ এক দূত প্রেরণ করিলেন। নৈষধ কাব্যে এই দূতকে হংসরূপী করিয়া লিখিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে লেখেন যে, নল ভূপতি এক দিবস স্বীয় বয়স্য গণের সহিত উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময় উদ্যানস্থ সরোবরে স্বর্ণ-পক্ষ যুক্ত এক মনোহর হংস বিচরণ করিতেছিল। রাজা তাহার মনোহর পাখা দেখিয়া আক্রমণ করাতে হংস কহিল মহারাজ আমাকে নষ্ট করিবেন না, আপনি যে দময়ন্তীর প্রীতি বাঞ্ছা করেন আমি তাহার সঙ্গে আপনকার সংমিলন করিয়া দিব। রাজা হংসের বাক্যে চমৎকৃত হইয়া অসাধারণ হংস জ্ঞান করিয়া দময়ন্তীর রূপ লাবণ্যের বিশেষ তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। হংস তাহা বিস্তারিত রূপে কহিল। ইহাতে রাজা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া স্বকার্য্য সাধনার্থে তাহাকে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

হংসরাজ প্রতিশ্রুত পালনার্থ বিদর্ভ নগরে গমন পূর্ব্বক দময়ন্তীর অন্তঃপুরস্থ সরোবরে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। দময়ন্তী অট্টালিকা হইতে হংসকে দেখিয়া সহচরীগণ সমভিব্যাহারে সরোবরে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং সরোবরে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে ধরি-

বার উপক্রম করিলেন। হংসবর আপনাকে বিপন্ন দেখিয়া দময়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে রাজ-নন্দিনি, আমাকে ধৃত করিও না, আমি নিষধ নগরের নল রাজার সঙ্গে তোমার মিলন করাইব। ঐ রাজা অতি সুপুরুষ, তাঁহার এমন মনোহর রূপ যে, কন্দর্প তাঁহার নিকটে পরাভব মানেন। অধিকন্তু তিনি সর্ব্বগুণবিশিষ্ট ও অতি সুশীল ও ধার্ম্মিক এবং সর্ব্বাংশে তোমার যোগ্য পাত্র। অতএব আমাকে ছাড়িয়া দাও, অঙ্গীকার করিলাম যাহাতে তাঁহার সহিত তোমার বিবাহ হয় তাহা করিব। সর্ব্বগুণান্বিত নল রাজা তোমার পতি হইলে তুমি শ্লাঘা মানিবে। দময়ন্তী নলের রূপ গুণের কথা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন, এবং মনে মনে মন সমর্পণ করিয়া, হংসকে বিশেষ সমাদর পূর্ব্বক নল রাজার সহিত তাঁহার সংমিলনের উপায় চিন্তা অর্থাৎ তাঁহাকে এই কর্ম্মের ঘটকতা করিতে আজ্ঞা করিলেন।

হংস রাজকন্যার নিকট হইতে নল সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইল। নল রাজা দময়ন্তীর অভিমত বাক্য শ্রবণ করিয়া আরো চঞ্চলচিত্ত হইলেন।

এদিকে দময়ন্তী হংসকে ঘটকরূপে প্রেরণ করিয়া হংসের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় রহিলেন, দিন-

যামিনী কেবল নল গুণ চিন্তনে চিন্তাকুলা হইযা সদা সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুলা ও বিমনা হইতে লাগিলেন। সহচরী গণ নৃপবালার এতাদৃশ অবস্থা দর্শনে, প্রথমতঃ নানা প্রকার সান্ত্বনা করিল, পরে রাজমহিষীকে যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত করাইল। রাণী সেই সকল কথা ভূপতিকে জানাইলেন, এবং কন্যার স্বয়ম্বরের সভা করিতে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিলেন। রাজা ঐ পরামর্শ শুনিযা তখনি দিগ্দিগন্তরে নৃপসমূহকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

ঐ সকল নৃপতি দময়ন্তীর রূপ ও গুণের কথা পূর্ব্বাবধি শ্রুত ছিলেন, অতএব তাঁহার স্বয়ম্বরের সংবাদে পুলকিতচিত্তে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হস্তী, অশ্ব, রথ ও লোকে বিদর্ভ নগর পরিপূর্ণ হইল। বিদর্ভরাজ ঐ সকল রাজাদিগের যথোচিত সমাদর করিলেন।

পরন্তু নৈষধকাব্য-রচনা কারক, দময়ন্তীর রূপের গৌরব জন্য ইহাও লিখিয়াছেন যে, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ এই চারি দেবতা ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারা নল রাজার অতি মনোহর রূপ দর্শনে কি জানি যদি রাজকন্যা নলকে বরণ করেন এই আশঙ্কায়, তাঁহাকে ছলনার্থ কহিলেন, হে সাধো পরোপকারিন্ রাজন্, তুমি আমাদিগের যদি কিঞ্চিৎ সাহায্য

কর তবে আমরা কৃতার্থ হই। নল রাজা স্বভাবতঃ অতি সরল, দেবগণের চাতুরী বুঝিতে অসমর্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন। তাহাতে সুরপতি আজ্ঞা করিলেন তুমি আমাদিগের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দময়ন্তীকে আমাদিগের আগমনবার্ত্তা কহ, এবং তিনি যে উত্তর প্রদান করেন তাহা আসিয়া আমাদিগকে বিজ্ঞাপন কর। এই কার্য্য করিলে আমরা তোমার নিকটে বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিব।

দেবতাগণের এই আজ্ঞাতেই হউক অথবা নল রাজার স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারেই হউক, তিনি দময়ন্তীর সদনে ছদ্মবেশে গমন করিলেন। তখন দময়ন্তী সখীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া উপবিষ্টা ছিলেন। নল রাজা গিয়া দেখিলেন দময়ন্তী সাক্ষাৎ ভুবনমোহিনী, এবং তাঁহার রূপ লাবণ্যের যে প্রশংসা শুনিয়াছিলেন সকলই সত্য। দময়ন্তীও নল রাজার পরম মনোহর রূপ দর্শনে সাতিশয় পুলকিতা হইলেন। পরে তাঁহার পরিচয় শুনিয়া, চিরপ্রার্থিত বিষয় প্রাপ্তে যাদৃশ আনন্দের উদ্ভব হয়, তদনুরূপ আনন্দিতা হইলেন, এবং যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তদনন্তর নল ভূপাল ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বরুণের যে সংবাদ লইয়া আগমন করিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাপন করিলেন। দময়ন্তী কহিলেন দেবতাগণ সকলের পূজ্য, তাঁহাদিগের চরণে

কোটি কোটি প্রণাম, কিন্তু আমি ইতঃপূর্ব্বে ভবদীয় গুণ-কীর্ত্তি শ্রবণে তোমাকে মানসিক বিবাহ করিয়াছি। অতএব অধুনা ইন্দ্রাদি দেবতাকে আর কিরূপে বরণ করিব।

নল, দময়ন্তীর এতদ্রূপ্ বাক্য শ্রবণে ইন্দ্রাদি দেবগণের পক্ষ হইয়া রাজসুতার সহিত বারম্বার বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন, এবং ইন্দ্রাদি ত্রিদশগণের দুঃসাধ্য শক্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণন পূর্ব্বক বহু প্রকারে প্রলোভ প্রদর্শন করাইলেন। কিন্তু সাধ্বী দময়ন্তী তৎ-সমুদয় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, কহিলেন আমি পূর্ব্বে যাঁহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি তিনি আমার পতি, তাঁহাকে পরিহার পূর্ব্বক পাত্রান্তরকে বরণ করিতে পারি না, তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ কর তবে আমি বিষপান করিব, অথবা জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিব।

দময়ন্তীর এই প্রকার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া নল, সুর-গণের নিকটে তাবদ্বিবরণ কহিলেন। তাহাতে দেবগণ ক্ষোভিত হইলেন, এবং বিবাহের ব্যাঘাত ঘটাইবার নিমিত্তে অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু সকল নিষ্ফল হইল, কেননা দময়ন্তী সর্ব্বসমক্ষে নলের গলে মাল্য প্রদান করিলেন। নলরাজা আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া অঙ্গীকার করিলেন আমি তোমাকে একাত্মা জ্ঞান করিব, এবং কখন তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। দময়ন্তী

নলকে মাল্য দান করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং যাবতীয় নৃপতিগণ নিরাশ হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে নল রাজা দময়ন্তীকে লইয়া স্বদেশে গমন করিলেন, এবং তাঁহার সহিত পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। ইহার মধ্যে রাজার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। পুত্রের নাম ইন্দ্রসেন, ও কন্যার নাম ইন্দ্রসেনা। ইহাদিগকে রাণী যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

পুষ্কর নামে নলরাজার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পাশক্রীড়ায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন। নল রাজাও পাশাখেলা জানিতেন, তাহাতে তাঁহার কেমন দুর্ম্মতি হইল কনিষ্ঠের সহিত পাশা খেলিয়া তাহাকে পরাস্ত করিবার মানস করিলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটিয়া উঠিল, কেননা একবারও জয়ী হইতে না পারিয়া ক্রমাগত তাহার নিকটে পরাজিত হইতে লাগিলেন। ইহাতে ক্রমশঃ তাঁহার রাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রাজকোষে যে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে সমস্ত হারিলেন। নল রাজার বন্ধু বান্ধব ও মন্ত্রিগণ তাঁহাকে নিরস্ত করণার্থ অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই নিবারণ করিতে না পারিয়া, অবশেষে রাজ্য নাশের আশঙ্কায় দময়ন্তীর

নিকটে গিয়া এই নিবেদন করিলেন যে, রাজা অক্ষ ক্রীড়াতে সকল ক্ষয় করিতেছেন, অতএব আপনি ইহার সদুপায় করুন, নতুবা রাজ্য নাশ হইবে।

দময়ন্তী এতাবদ্বিবরণ অবগত হইয়া স্বামীর অশুভ ক্রীড়া শান্তি করণের নানামত চেষ্টা করিলেন, এবং রাজাকে বিধিমতে বুঝাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। রাজা ক্রমাগত পাশ ক্রীড়ায় মত্ত থাকিলেন। দময়ন্তী তাহাতে বিষম বিপদ জ্ঞান করিয়া প্রিয়তমা দাসীকে, সুশীলনামা সারথিকে শীঘ্র ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন। সারথি আজ্ঞা-মাত্র রাজমহিষীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাণী অশ্রু-পূরিত নয়নে সারথিকে বলিলেন, হে সুশীল সারথে, মহারাজ জ্ঞানশূন্য হইয়া সর্ব্বস্বান্ত করিতে বসিয়াছেন, আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে। সম্প্রতি, তুমি ইন্দ্রসেন এবং ইন্দ্রসেনাকে আমার পিত্রালয়ে রাখিয়া আইস। সারথি আজ্ঞা মাত্রেই রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে রথারোহণ পূর্ব্বক বিদর্ভরাজ-ভবনে লইয়া গেল।

এ দিকে নল রাজা পাশা খেলায় উন্মত্ত হইয়া পুষ্ক-রের স্থানে ক্রমে ক্রমে রাজ্য ও ধন সকল হারিয়া অব-শেষে উত্তরীয় বস্ত্র পর্য্যন্ত হারিলেন। পরে যখন কেবল পরিধেয় বস্ত্র মাত্র আছে তখন পুষ্কর ব্যঙ্গ্য

করিয়া কহিলেন তুমি সকল হারিয়াছ, যদি ভার্য্যা পণ করিতে পার তবে আইস। রাজা এই কথায় অত্যন্ত কুপিত হইলেন, কিন্তু কি করেন সর্ব্বস্ব গিয়াছে, দাস দাসী সকলি হাবিয়াছেন। অতএব ভ্রাতাকে কিছু বলিতে না পারিযা, শুদ্ধ পবিধেয় বস্ত্র মাত্র পরিধান করিয়া আলয় হইতে বহির্গত হইলেন। রাজার এই দুববস্থার বিবরণ অন্তঃপুবে প্রকাশ হইলে, পুষ্কবের অনুচবগণ দময়ন্তীর অলঙ্কাবাদি কাড়িয়া লইল। দময়ন্তী একবস্ত্রা হইযা স্বামীব পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কবিলেন।

পুষ্কব এই বিশাল বাজ্যের অধীশ্বব হইযা সমস্ত রাজ্যে ঘোষণা কবিয়া দিলেন অদ্যাবধি নল রাজাকে যে ব্যক্তি স্থান দান করিবে তাহাব প্রাণদণ্ড হইবে। প্রজাগণ কি কবে, প্রাণেব ভয়ে নল রাজাকে বাস-স্থান দেওয়া দূরে থাকুক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও করিল না। নল বাজা কুত্রাপি আশ্রয় না পাইযা তিন দিবস অনাহারে থাকিলেন। চতুর্থ দিবসে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত এবং তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া এক নদীতে গিযা অঞ্জলি করিয়া বারি পান কবিলেন। পরে নদীতটে বজনী বঞ্চন করিয়া নিশাবসানে ভার্য্যাসহ নিবিড অরণ্যে প্রবেশ কবিয়া বনজ সুস্বাদ ফল চয়ন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কয়েক দিবস অতীত হইলে এক দিন কনকপক্ষযুক্ত এক বিহঙ্গ নল রাজার দৃষ্টিগোচর হইল। ভূপতি তৎপক্ষী অবলোকনে পরমানন্দিত হইয়া ভাবিলেন, এই সুদৃশ্য বিহঙ্গমকে কোনরূপে ধৃত করিতে পারিলে আমাদিগের ক্লেশের অনেক লাঘব হইতে পারিবে, কেননা ইহার পক্ষ সকল স্বর্ণনির্ম্মিত, তাহা বিক্রয় করিয়া কিছু দিন অনায়াসে দিনপাত করিতে পারিব, এবং ইহার মাংসও ভোজন করিব। এই বিবেচনা করিয়া পক্ষীকে ধরিবার উপক্রমণ করিয়া, স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র তাহার গাত্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু যেমন বস্ত্র তাহার উপর ফেলিয়া দিয়াছেন অমনি পক্ষী বস্ত্রসহিত শূন্যে উড্ডীয়মান হইল। ইহা দেখিয়া রাজা আরও বিস্মিত হইলেন, এবং খেদ করিয়া কহিলেন ইহার পর অদৃষ্টে আরো কি দুঃখ আছে বলিতে পরি না। পরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভার্য্যাকে কহিলেন হে প্রেয়সি, তুমি দেখিলে পরমেশ্বরের কেমন বিড়ম্বনা, আমার রাজ্য ধন সকল গিয়াছে, অবশেষে যে পরিধের বস্ত্র ছিল তাহাও গেল। তুমি স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ কোমল, আমার সহিত বনবাস করিলে অত্যন্ত দুঃখ পাইবে। অতএব তুমি এই স্থান হইতে বিদর্ভ নগরে পিতৃভবনে গমন কর। যদি কালক্রমে আমার অবস্থা পরিবর্ত্তন হয় তবে পুনর্ব্বার মিলন হইবে।

দময়ন্তী নলের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হে স্বামিন্, আপনি এমন নিদারুণ বাক্য কি প্রকারে কহিলেন, আপনকার অসন্নিধানে পিতৃ-ভবনে কি ইহা অপেক্ষা সুখী হইব, সুখাদ্য ভোজন বা সুখশয্যায় শয়ন কি আপনকার অপেক্ষা অধিক সুখকর হইবে, কদাচ হইবে না। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না, তাহা করিলে অরণ্যমধ্যে অনেক ক্লেশ পাইবেন। আমি নিকটে থাকিলে আপনার কোন ক্লেশ থাকিবে না। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমি আপনাকে ত্যাগ করিতে পরি না। যদি নিতান্ত পরিত্যাগ করেন, তবে আমি এই স্থানে আত্মঘাতিনী হইব। এক্ষণে আমি আপনাকে এক পরামর্শ কহি, আপনি আমার পিত্রালয়ে চলুন, তাহা হইলে আপনার কোন দুঃখ থাকিবে না, বরং পিতা আপনাকে দেবতার তুল্য আদর করিবেন। নল বলিলেন হে প্রেয়সি! তুমি জান, বিবাহ-কালে আমি কি প্রকার সমারোহে গমন করিয়াছিলাম। এখন এই দীন বেশে শ্বশুরালয়ে গেলে অপমানিত হইব ও লোকে হাস্য করিবে, তদপেক্ষা অরণ্যমধ্যে অনাহার থাকা ভাল, এই বেশে শ্বশুরের দেশে কদাচ গমন করিব না।

দময়ন্তী বিদর্ভ নগরে গমনার্থ স্বামীকে আরো

অনেক প্রকার বুঝাইলেন, কিন্তু যখন নল তাহাতে কোন প্রকারে সম্মত হইলেন না, তখন দময়ন্তী তাঁহাকে আপনার বস্ত্রের অর্দ্ধভাগ পরিধান করিতে দিলেন। দময়ন্তী মনে মনে ভাবিলেন দুই জনে এক বস্ত্র পরিয়া থাকিলাম, সুতরাং রাজা আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না।

এই রূপে উভয়ে এক বস্ত্র পরিধান করিয়া, দ্রুত গমনে অশক্ত হইয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। কতক দূরে যাইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া উভয়ে এক তরু-তলে শয়ন করিলেন। দময়ন্তী, নল কোন স্থানে প্রস্থান না করেন এই জন্য ভয়াতুরা হইয়া তাঁহাকে ভুজদ্বয়ে বন্ধন করিয়া থাকিলেন, কিন্তু সমস্ত দিবস পদ-চালনা প্রযুক্ত কাতরা হইয়াছিলেন, নিদ্রাগতা হইলেন। নল রাজা, রাজ্যনাশ ও সঙ্গে নারী, এই সকল দুর্ভাবনা হেতু ক্ষণ কালের নিমিত্তও সুস্থির ছিলেন না, তাহাতে নিদ্রা আইসে নাই। মহিষীকে নিদ্রিতা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন এই গহন কাননে রমণী সমভিব্যাহারে থাকিলে আমার দুঃখে ইহার অত্যন্ত ক্লেশ হইবে। অতএব যদি আমি ইহাকে ত্যাগ করি তবে কোন প্রকারে পিতৃভবনে যাইতে পারিবে, অধিক ক্লেশ পাইবেক না। আমি একাকী যথা ইচ্ছা তথা গমন করিব, কেহ আমার

প্রভৃতি বল বিক্রম প্রকাশ করিতে পারিবে না, আমি একমত স্বচ্ছন্দে থাকিব।

এই চিন্তা করিয়া রাজা দময়ন্তীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু উভয়ে এক বস্ত্র পরিধৃত, তাহাতে গাত্রোত্থান করিলে কি জানি দময়ন্তীর নিদ্রা ভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় কিঞ্চিৎ কাল স্থগিত হইলেন। পরে বস্ত্র খান ছিন্ন করিয়া অর্দ্ধ খণ্ড আপনি পরিলেন, এবং অন্যার্দ্ধ ভার্য্যার অঙ্গে রাখিয়া নিদ্রাগতা রমণীকে একাকিনী ফেলিয়া গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমনানন্তর প্রেয়সী কি করিতেছেন দেখিয়া আইসি ইহা বলিয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন, এবং তাঁহাকে নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হায়, এই অরণ্য মধ্যে শত শত সিংহ ব্যাঘ্র আছে। আমি পরম প্রিয়তমা পত্নীকে কিরূপে তাহাদের মুখে দিয়া যাই। ইহা বলিয়া কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন, তৎপরে বনদেবতা-গণকে নারী সমর্পণ করিয়া নল রাজা তথাহইতে প্রস্থান করিলেন। কতক দূর গিয়া পুনর্ব্বার ফিরিলেন। তখনও দময়ন্তী নিদ্রিতা, রাজা তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, হে প্রিয়তমে, তোমাকে ত্যাগ করিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তথাপি আমি তোমাকে অনাথা করিয়া চলিলাম, বিধাতা যদি নির্ব্বন্ধ

করান তবে তোমাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিব। ইহা বলিয়া দয়া, মমতা, সকল ত্যাগ করিয়া নল রাজা উন্মত্তপ্রায় নিবিড় কাননাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

কিয়ৎকালানন্তর দময়ন্তী জাগরিত হইয়া স্বসমীপে নল রাজাকে না দেখিয়া ধূলায় ধূষর হইয়া শিরে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া চতুর্দ্দিকে নল রাজার অন্বেষণ করিতে করিতে কহিলেন, হে নাথ! হে প্রাণেশ্বর! আমাকে একাকিনী অরণ্যে রাখিয়া কোথায় গেলে। আমি তোমার নিকটে কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে তুমি আমার এইরূপ দণ্ড বিধান করিলে। তুমি বিবাহকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে প্রাণ থাকিতে আমাকে পরিত্যাগ করিবে না। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া কিরূপে আমাকে পরিত্যাগ করিলে। তোমার বিচ্ছেদে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে, আমাকে কেন আর দুঃখ দিতেছ, শীঘ্র আইস। এই প্রকার বিলাপপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এক এক বার ইহাও ভাবিতে লাগিলেন যে, এই অরণ্য সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ, গণ্ডার ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ, কি জানি রাজা ক্ষুধা নিবারণার্থ ফলান্বেষণে যাইয়া থাকিবেন, তাহারা নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু ছিন্ন বস্ত্র অবলোকনে তাঁহার মনে এক প্রকার বিশ্বাস

জন্মিল যে, নল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তিনি আরো ব্যাকুলিতা হইলেন, এবং শোকে বিহ্বল হইয়া পাগলিনীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এই রূপ ভ্রমণ করিতে করিতে দময়ন্তী এক প্রকাণ্ড অজগরের সম্মুখে পড়িলেন। ভুজঙ্গ তাঁহাকে দেখিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ফণা ধরিয়া গ্রাস করিতে উঠিল। দময়ন্তী ঐ ভয়ানক সর্প দর্শনে ভয়াকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভিলেন। ঐ রোদন নিনাদ, নিকটস্থ এক ব্যাধের কর্ণগোচর হওয়াতে, সে তত্র সমাগত হইয়া তীক্ষ্ণ শর দ্বারা অজগরকে নষ্ট করিল। ভুজঙ্গম বিনাশ করণানন্তর ব্যাধ দময়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, হে কুরঙ্গনয়নে, তুমি কে, এবং এই ভয়ানক অরণ্য-মধ্যে কেন একাকিনী ভ্রমণ করিতেছ? দময়ন্তী এই কথা শুনিয়া আপনার তাবৎ পরিচয় দিলেন। ব্যাধ তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শনে বিমোহিত এবং তাঁহাকে অনাথিনী দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় গৃহিণী করণাভিলাষে বিবিধ প্ররোচনা প্রদর্শন করিতে লাগিল। দময়ন্তী ব্যাধের বিরুদ্ধ ভাব অববোধে তাহাকে পিতৃ-সম্ভাষণে আহ্বান করিলেন। পাষণ্ড কিরাত তাহাতেও ক্ষান্ত হইল না, এবং আক্রমণের উপক্রম করিতে লাগিল। দময়ন্তী দেখিলেন মহা বিপদ, ধর্ম্ম নষ্ট হয়, অতএব

জগদীশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক অশেষ প্রকারে বিনতি করিতে লাগিলেন, এবং চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বহ্নি প্রভৃতিকে সাক্ষী করিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক সজল নয়নে কহিলেন, যদি আমি যথার্থ পতিব্রতা নারী হই, তবে মদীয় সতীত্ব বিধ্বংস করণোদ্যত এই পাষণ্ড কিরাত এই দণ্ডেই ভস্মসাৎ হউক। দময়ন্তীর এই বাক্যে ব্যাধ রাগান্ধ হইয়া ধনুকে শর সংযোগ পূর্ব্বক তাঁহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু পরমেশ্বরের কি অপার মহিমা, ঐ শর হঠাৎ তাহার আপন-বক্ষে লাগিয়া, সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

দময়ন্তী আসন্ন বিষম বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়া জগদীশ্বরের স্তব করিতে করিতে তথা হইতে পতির অন্বেষণে চলিলেন। পথিমধ্যে কোন মানবের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়াতে উন্মত্তা প্রায় হইয়া বনচর-বর্গ ও পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, সরোবর প্রভৃতি সকলকেই পতির উদ্দেশ বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নদি, তুমি বলিতে পার, আমার প্রাণেশ্বর পিপাসাতুর হইয়া এখানে জলপান করিতে আসিয়াছিলেন কি না। এইরূপ সকল স্থানে অন্বেষণ করিতে করিতে চলিলেন। পরে এক উচ্চ পর্ব্বত দেখিয়া মনে করিলেন যে ইহার উপর হইতে অনেক দূর দৃষ্টি হয়,

ইহাতে উঠিয়া দেখি প্রাণনাথ কোন্ দিকে যাইতে-ছেন। ইহা ভাবিয়া ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি আরো-হণ করিলেন, কিন্তু কোন দিকে নলকে দেখিতে পাই-লেন না। তৎপরে উত্তর মুখে গমন করিতে লাগি-লেন, কতক দূরে এক ঋষির পর্ণকুটীর দেখিয়া তথায় গমনপূর্ব্বক মুনিগণকে প্রণিপাত করিয়া আপনার যাবতীয় দুরবস্থার বিবরণ কহিলেন, এবং নলরাজার নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

ঋষিগণ নৃপাঙ্গনার কাতরতা দর্শনে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন এবং নলরাজার উদ্দেশার্থ শিষ্যগণকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা সন্ধান হইল না। তাহাতে তাঁহারা দময়ন্তীকে বিশেষ রূপে আশ্বাস দিয়া লোকালয়ে গমন করিতে উপদেশ দিলেন। রাজসুতা মুনিগণের উপদেশক্রমে তথা হইতে নগরাভিমুখে গমন করিতে করিতে, এক নদী-তটে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন কতক গুলিন বণিক এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছে, দময়ন্তী তাহাদিগকে আত্ম-বৃত্তান্ত কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এই পথে নল রাজাকে যাইতে দেখিয়াছ। তাহারা উত্তর করিল আমরা দেখি নাই। পরে তাহাদের মধ্যে এক জন তাঁহার দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে কন্যা সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, আমরা সুবাহু নগরে বাণিজ্যার্থ গমন

করিতেছি, যদি তুমি তথায় যাইতে চাহ তবে আমাদের সঙ্গে আইস।

রাজকন্যা বণিকদিগের ভদ্রতা দর্শনে তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর দিবাবসান হইলে, বণিকগণ এক সরোবরতীরে তরুতলে অবস্থিতি করিল, এবং পথশ্রান্তি প্রযুক্ত ক্রমে ক্রমে সকলেই নিদ্রাগত হইল। নিশীথ সময়ে একটা হস্তী তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের কোন কোন ব্যক্তিকে পদতলে দলিতে লাগিল, তাহাতে অন্যান্য সকলে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। দময়ন্তী অনন্যগতি হইয়া এক বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া সভয় চিত্তে রজনী যাপন করিলেন। রজনী প্রভাতা হইলে বণিকগণ পুনর্ব্বার একত্র হইল, দময়ন্তী বৃক্ষ হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক তাহাদের সঙ্গে চলিলেন।

এইরূপে সুবাহু নগরে উত্তীর্ণ হইয়া, বণিকেরা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিল। দময়ন্তী রাজপথে একাকিনী অর্দ্ধবাসা, মুক্তকেশা, উন্মত্তা বেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পথিক লোকেরা তাঁহাকে যথার্থ উন্মত্তা জ্ঞান করিয়া তাঁহার অঙ্গে কর্দ্দম ও ধূলি প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। দৈবাৎ সুবাহু রাজার রাণী তৎকালে অট্টালিকার উপরে ছিলেন, তিনি অনুপম-লাবণ্যবিশিষ্ট রমণীর এতাদৃশ দুর্গতি দর্শনে দয়ার্দ্র-

চিত্ত হইয়া, দাসীগণকে আজ্ঞা করিলেন উহাকে রাজ-সদনে লইয়া আইস। দাসীগণ আজ্ঞামাত্র তাঁহাকে মহিষীর নিকটে লইয়া আসিল। রাজ্ঞী যথোচিত সমাদর-পূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দময়ন্তী কহিলেন, আমি সৈরিন্ধ্রী, আমার স্বামী পাশা খেলায় সর্ব্বস্ব হারিয়া বনপ্রবেশ করিয়াছিলেন, আমি বনমধ্যে তাঁহার নিকটে শয়ন করিয়া ছিলাম। সেই নিদ্রাবস্থায় তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, আমি তাঁহার অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছি। এই বলিয়া দময়ন্তী রোদন করিতে লাগিলেন।

রাজমহিষী দময়ন্তীর দুঃখের আখ্যায়িকা শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, বলিলেন তোমার স্বামীর অন্বেষণার্থ আমি দূত প্রেরণ করিতেছি, যাবৎ অন্বেষণ না হয়, তুমি আমার আলয়ে বাস কর। দময়ন্তী রাণীর এই অনুগ্রহে কৃতার্থম্মন্য হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কহিলেন, আমি আপনার দাসী হইলাম, কিন্তু আমার এক ব্রত আছে, আমি কোন পুরুষের নিকট যাইব না, এবং উচ্ছিষ্ট স্পর্শ ও পদসেবা করিব না। রাণী-বলিলেন, তজ্জন্য চিন্তা নাই, তোমাকে কোন কর্ম্ম করিতে হইবে না, তুমি আমার কন্যার নিকট কন্যার ন্যায় বাস কর। ইহা বলিয়া সুনন্দানাম্নী স্বীয়

দুহিতাকে ডাকাইয়া তাহাকে দময়ন্তী সমর্পণ করিলেন। দময়ন্তী তাহার নিকটে সহোদরার ন্যায় রহিলেন।

এদিকে নল ভূপাল দময়ন্তীকে নিদ্রাবস্থাতে একাকিনী রাখিয়া অর্দ্ধবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন, এবং দময়ন্তী পাছে আসিয়া তাঁহার সঙ্গ লন এই জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিলেন। কতক দূরে একটা প্রকাণ্ড ভুজঙ্গ দাবানলে পতিত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। এই চিত্তভেদক ধ্বনি করুণাপূর্ণ নল ভূপালের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, তিনি দাবানলের সমীপাগত হইলেন। বিপদাপন্ন বিষধর রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া অধিকতর কাতরতা জানাইল। নল ভূপতি সর্পের দুর্গতি দর্শনে ব্যাকুল হইয়া তাহাকে দাবানল হইতে উদ্ধার করিলেন, এবং বিষধর দাবানলে বিদগ্ধ-দেহ হইয়া দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত গমনে অশক্ত হওয়াতে, দয়ালুস্বভাব রাজা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু খল সর্প ইহাতেও নল রাজার উপকার স্মরণ না করিয়া তাঁহাকে দংশন করিল। রাজা তাহার এতদ্রূপ কৃতঘ্নতাচরণ দৃষ্টে তাহাকে বিশিষ্টরূপে ভর্ৎসনা করিলেন। তৎপরে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। সর্পের দংশনে রাজার সর্ব্বাঙ্গে কালকূট নির্গত হইল।

তদনন্তর দশ দিবস পরে নল অযোধ্যা নগরে উত্তীর্ণ হইয়া রাজার নিকটে এই রূপে পরিচয় দিলেন যে আমার নাম বাহুক, আমি নল রাজার সারথি ছিলাম। পরে রাজা অক্ষ-ক্রীড়ায় রাজ্য পণ করিয়া সর্ব্বস্ব হারিয়া দেশত্যাগী হওয়াতে, আমি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছি। আমি উত্তমরূপে অশ্ব চালাইতে পারি, অতএব, যদি আমাকে কোন কর্ম্ম দিয়া প্রতিপালন করেন তবে আমি চরিতার্থ হই। ঋতুপর্ণ রাজা তাঁহার এই গুণের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে অশ্ব-রক্ষার কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন।

নল রাজা এই কর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া অযোধ্যা নগরে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু দময়ন্তীর বিচ্ছেদে অহোরাত্র মনের অসুখে থাকিলেন, আর তাঁহাকে একাকিনী বনমধ্যে ত্যাগ করাতে, তিনি কোথায় গেলেন কি করিলেন, এই সকল ভাবনায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং আপনাকে তাঁহার যন্ত্রণার মূল জানিয়া আপনাকে নানা মত ভর্ৎসনা করিলেন। শয়নে ভোজনে সর্ব্বক্ষণই দময়ন্তী চিন্তা তাঁহার সার হইল।

এই রূপে নল দময়ন্তী দুই জনে দুই স্থানে অবস্থিত হইলে, বিদর্ভাধিপতি রাজা ভীমসেন, জামাতার রাজ্য নাশ ও আপন কন্যা দময়ন্তীর অরণ্য গমনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া অপার শোক সাগরে নিমগ্ন

হইলেন। অনন্তর দুহিতা ও জামাতার অন্বেষণার্থে দ্বিজগণকে নিযুক্ত করিয়া নানা দেশে প্রেরণ করিলেন, এবং অঙ্গীকার করিলেন তাহাদিগকে অথবা তাহাদের দুই জনের এক জনকে যিনি আনয়ন করিতে পারিবেন তাঁহাকে অনেক অর্থ দান করিব। বিপ্রগণ বহুল সম্পত্তির লালসা বশতঃ দিন রাত্রি নগরে নগরে বিপিনে বিপিনে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন স্থানে অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। ঐ প্রণিধি-গণের মধ্যে সুদেব নামা এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি হঠাৎ সুবাহু রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া, কতক দিবস তথায় বাস করিয়া, জানিতে পারিলেন যে, রাজার অন্তঃপুরে সৈরিন্ধ্রী-বেশে এক নারী আছে। সুদেব এই সন্ধান পাইয়া নৃপতির সভাতে উপস্থিত হইয়া, আপনার দৌত্য কার্য্যের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। রাজা, ঐ ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট নারীর অবয়বাদি এবং স্বীয় গৃহে সৈরিন্ধ্রীরূপে নিবাসিনী কন্যার অবয়বাদি ঐক্য বিবেচনায়, তৎক্ষণাৎ ছদ্মবেশিনী দময়ন্তীকে অন্তঃপুর হইতে আনয়ন করাইলেন। সুদেব তাঁহার আকার ও কথোপকথন দ্বারা অনুমান করিলেন, ইনিই বিদর্ভরাজের দুহিতা। অতএব তাঁহাকে বলিলেন যে আমার নাম সুদেব, আমি রাজা ভীমসেনের আদেশে তোমার অন্বেষণে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি।

তোমার পিতা মাতা তোমার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন।

দময়ন্তী বিপ্রপ্রমুখাৎ জনক জননীর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দাশ্রু পরিপূরিত লোচনে তাঁহাকে পিতা মাতার কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুদেব তাঁহাদিগের কুশল সমাচার অবগত করাইয়া, তাঁহাদের ব্যাকুলতার বিস্তারিত বিবরণ কহিলেন। দময়ন্তী তৎশ্রবণে রোদন করিতে লাগিলেন। সুবাহু নরপতি দময়ন্তীর প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্তে, জানিতে পারিলেন তিনি তাঁহার মাতৃস্বসৃপতি। ইহা জানিতে পারিয়া পরম পুলকিত হইলেন। দময়ন্তী এই পরিচয়ে মাতৃস্বসৃপতিকে প্রণাম করিলেন। পরে এই সংবাদ রাজমহিষীর কর্ণগোচর হইলে তিনি দময়ন্তীকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, এত দিবস অজ্ঞাত বাসে থাকা প্রযুক্ত বিবিধ রূপে আক্ষেপ করিলেন, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বাৎসল্য সহযোগে যত্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুদেব দময়ন্তীকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার জন্য বারম্বার ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে, রাজমহিষী তাঁহাকে তথায় প্রেরণে সম্মতা হইয়াও স্নেহবশতঃ কিছুকাল আপন নিকটে রাখিলেন, পরে তাঁহাকে সুদেব সমভিব্যাহারে বহু সমারোহ পূর্ব্বক পিতৃ-গৃহে প্রেরণ করিলেন।

দময়ন্তী বিদর্ভ নগরে পদার্পণ করিবামাত্র সমুদয় নগর আনন্দে পরিপূরিত হইল। রাজা রাণী দুহিতার মুখাবলোকন করিয়া, মৃত দেহে প্রাণ প্রাপ্ত প্রায় পরম আনন্দে পূর্ণ হইয়া, সুদেব বিপ্রকে অনেক অর্থ ও অনেক ভূমি পারিতোষিক দিলেন।

তদনন্তর দময়ন্তীর দুঃখের আদ্যন্ত বিবরণ শ্রবণে রাজা ও রাণী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু জগদীশ্বর প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন ইহাই পরম লাভ জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। দময়ন্তী যদিও জনক জননী এবং কন্যা ও পুত্রাদিকে দর্শন করিয়া সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু পতির বিচ্ছেদ-যাতনা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না, নল রাজা নিরন্তর তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরিত থাকিলেন। দময়ন্তী কেবল নলের চিন্তাতেই ক্রমে ক্রমে ক্ষীণা ও মলিনা হইতে লাগিলেন।

রাজমহিষী কন্যার আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়া নৃপতিকে তাবৎ বিবরণ অবগত করাইলেন। রাজা পুনর্ব্বার বিপ্রগণকে ডাকাইয়া জামাতার অন্বেষণার্থ প্রেরণ করিলেন, এবং কহিলেন, যিনি জামাতা অথবা জামাতার সংবাদ আনিতে পারিবেন তাঁহাকে অনেক পারিতোষিক দিব। দ্বিজগণ ধনলোভে নল অন্বেষণে নানা দেশে গমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ করিতে না পারিয়া প্রায় সকলেই ফিরিয়া আসিলেন।

সুদেব ব্রাহ্মণ সকল অপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি অনেক পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে অযোধ্যা পুরীতে উপনীত হইয়া ঋতুপর্ণ ভূপালের সভায় উপস্থিত হইলেন, এবং রাজাকে আত্ম পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক সমস্ত সভাসদ্‌গণের সাক্ষাতে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

সভাসদগণ নল রাজার কোন সংবাদ কহিতে পারিলেন না। কিন্তু বাহুক-নাম-ধারী ছদ্মবেশী নল সেই সময়ে সভার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি সুদেবের বাক্য শ্রবণে পুনঃপুনঃ দময়ন্তীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুদেব, দময়ন্তীর ভাব-দ্বিবরণ, অর্থাৎ নলরাজা তাঁহাকে বনে একাকিনী ত্যাগ করিয়া আসিলে তিনি যে যে ক্লেশ পাইয়া ছিলেন এবং যেরূপে পিতৃ-ভবনে আইসেন, তাহা সমুদয় কহিলেন। এই সকল কথায় নল রাজার নয়ন-বারি বিনির্গত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে তিনি উত্তর করিলেন, দময়ন্তী পতির অনেক নিন্দা করিয়াছেন, পতিপরায়ণা রমণীর ইহা উচিত নহে।

এই কথা শুনিয়া সুদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি নলের কোন সংবাদ বলিতে পার কি না? সারথি কহিল আমি নল ও দময়ন্তী উভয়কেই জানি। নল দেশত্যাগী হইয়া পত্নীসহ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া-

ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কে কোথায়, বলিতে পারি না। এই কথাতে সুদেবের এমত বোধ হইল, ইনিই নল-রাজা। তখন সুদেব বিদর্ভ নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজাকে তদ্বিবরণ জানাইলেন। রাজা, রাজমহিষীকে এবং কন্যাকে তৎসমুদায় বিবরণ জ্ঞাত করিলেন। দময়ন্তী বাহুক সারথির কথিত বাক্য শুনিয়া, নিশ্চিত বুঝিলেন সেই সারথি নল ভূপাল, এবং তাঁহাকে বিদর্ভ রাজধানীতে আনয়নার্থ পিতাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। রাজা তাঁহাকে আনাইবার কোন উপায় দেখিলেন না।

পরে দময়ন্তী ঋতুপর্ণ রাজাকে এক পত্র লিখিয়া, সুদেব ব্রাহ্মণকে পুনর্ব্বার অযোধ্যা নগরে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, তুমি রাজাকে পত্র দিয়া এই কথা বলিবে, "দময়ন্তীর পূর্ব্ব-স্বামী নল-রাজা অনুদ্দেশ হওয়াতে, তিনি কল্য পুনর্ব্বার স্বয়ম্বরা হইবেন, অতএব আপনি অবিলম্বে রথারোহণ পূর্ব্বক বিদর্ভ নগরে গমন করুন।" এই সংবাদে ঋতুপর্ণ রাজা অবশ্যই এখানে আসিবেন, এবং সেই সারথি যদি যথার্থ নলরাজা হয়েন তবে তিনিও কখন সেখানে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না, অবশ্য রাজার সঙ্গে আসিবেন। তাহা হইলেই এবিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। বিশেষতঃ, এত অল্প কালের মধ্যে

এতাদৃশ দূর দেশে উপস্থিত হইতে পারিলে, ইহাতেও, সেই সারথি যথার্থ নল রাজা কি না, তাহা পরীক্ষা হইবে। কেননা নল ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির এতদ্রূপ রথ-চালনা শক্তি নাই।

সুদেব বিপ্র পত্র লইয়া অযোধ্যাতে উপনীত হইলেন, এবং দময়ন্তীর উপদেশানুসারে ঋতুপর্ণ রাজাকে পত্র প্রদান করিয়া বলিলেন, কল্য দময়ন্তী পুনর্ব্বার স্বয়ম্বরা হইবেন, অতএব কল্য আপনাকে সেই সভায় উপস্থিত হইতে হইবে। ঋতুপর্ণ রাজা দময়ন্তীর দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া বিস্ময়-যুক্ত হইলেন, তথাপি দময়ন্তী-লাভের লোভ-বশীভূত হইয়া, কিরূপে পর দিবস তথায় যাইবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাহুক সারথিকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুশীল সুনিপুণ সারথে, কল্য আমাকে বিদর্ভনগরে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইতে হইবে, কিন্তু কিরূপে এত অল্প কালের মধ্যে ঈদৃক্ দূরবর্ত্তি স্থানে উপস্থিত হইব, ইহাই আমার পরম চিন্তা হইতেছে। অতএব এবিষয়ে তুমি দক্ষতা প্রকাশ না করিলে আর উপায়ান্তর নাই।

বাহুক সারথি মনে মনে কহিলেন দময়ন্তীর কন্যা পুত্র বর্ত্তমান, অতএব তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেন এমত হইবে না। শাস্ত্রে বলে, পতি-পুত্র-হীনা নারী পতি

অভাবে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু যাহার পুত্র কন্যা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার পুনর্বার বিবাহ করা উচিত নহে। অধিকন্তু দময়ন্তী পতিব্রতা রমণী, তিনি এমন কর্ম্ম কদাচ করিবেন না। আমি তাঁহাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছি, বুঝি তজ্জন্য তাঁহার অন্তঃকরণে ক্রোধোদয় হইয়াছে, তাহাতে এই কৌশল করিয়া থাকিবেন। ফলতঃ আমাকে পাইবার জন্যই এই সূচনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

ইহা ভাবিয়া সারথি রাজাকে বলিলেন মহারাজ, তাহার চিন্তা কি, আমি আপনাকে অদ্য রাত্রেই বিদর্ভ নগরে লইয়া যাইব। রাজা এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তখনি রথে অশ্ব যোজনা করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সারথি আজ্ঞামাত্র অশ্বশালায় গমন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা কৃশতম দুই অশ্ব বাহির করিয়া আনিলেন। রাজা কৃশ অশ্ব দর্শনে সারথিকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। বাহুক বলিলেন এই অশ্বই এই কর্ম্মের যোগ্য, হৃষ্ট পুষ্ট অশ্বের কর্ম্ম নহে। ইহা বলিয়া ঐ অশ্বদ্বয় রথে বন্ধন করিয়া বায়ুবেগে রথ চালাইতে লাগিলেন। ঋতুপর্ণ-রাজা তাঁহার অসাধারণ রথচালনা শক্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, মনুষ্যমধ্যে কেবল নল রাজার অশ্বচালনবিদ্যা ভাল ছিল, এই সারথি সেই নলই বা হয়, অথবা তাঁহার স্থানে এই

বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকিবে। ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র বায়ুতে উড়িয়া ভূমিতে পড়িল। তাহাতে তিনি সারথিকে শকট রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। সারথি কহিলেন সেই বস্ত্র অনেক দূরে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তাহা আনিতে হইলে অদ্য রাত্রে বিদর্ভ নগরে যাইতে পারিব না। ইহাতে রাজা নিরুত্তর হইলেন। সারথি রথ চালাইতে লাগিলেন, এবং রজনি প্রভাতা না হইতেই বিদর্ভনগরে উত্তীর্ণ হইলেন।

রাজা ভীমসেন অযোধ্যাপতির যথোচিত সম্মান করিলেন। কিন্তু অযোধ্যেশ্বর দেখিলেন তথায় স্বয়ম্বর সভার কোন আয়োজন নাই, অন্য কোন রাজাও আইসেন নাই, ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। নল অশ্বশালায় অশ্ব বন্ধন করিয়া অশ্বপালের সহিত তথায় থাকিলেন।

দময়ন্তী অন্তঃপুর হইতে ঋতুপর্ণ রাজার আগমন সংবাদ পাইয়া মনে মনে ভাবিলেন, অদ্য আমি নল দর্শন করিব, নতুবা অনল-মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব। ইহা ভাবিয়া কেশিনী নাম্নী প্রিয়তমা সহচরীকে অশ্বশালাতে প্রেরণ করিলেন। কেশিনী অশ্বশালে গিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিল, রাজকন্যা দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন তুমি কে, এবং কোথা হইতে আসিতেছ। বাহুক বলিলেন, আমার অযো-

ধ্যাতে বসতি, আমি ঋতুপর্ণ রাজার সারথি। অদ্য আমরা সংবাদ পাইলাম রাজকন্যা দময়ন্তী পুনর্ব্বার স্বয়ম্বরা হইবেন, এই জন্য রাজাকে তাড়াতাড়ি তথা হইতে লইয়া আসিলাম। আমি পূর্ব্বে নল রাজার সারথি ছিলাম, আমার নাম বাহুক। আমি তাঁহার ভার্য্যার পুনর্ব্বার পাণিগ্রহণের কথায় বিস্মিত হইয়াছি। কেশিনী কহিল, তুমি নল রাজার সারথি! বলিতে পার, নলরাজা কোথায়? আর তিনি, পতিব্রতা রমণীকে অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তাঁহার মনে কি এ ভাবনা হইল না, একাকিনী কামিনীকে ঘোর কাননে কি প্রকারে রাখিয়া যাই। নল রাজা দময়ন্তীকে এই প্রকারে ত্যাগ করিয়া গেলে, দময়ন্তীর ক্লেশের একশেষ হইয়াছে, তিনি পতি-শোকে অন্ন জল ও শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কেশিনী-প্রমুখাৎ দময়ন্তীর দুঃখের কথা শুনিয়া নলের নেত্র-নীর নির্গত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন কুলবতী যুবতী প্রাণান্তেও পতির দোষ অন্য ব্যক্তির নিকটে ব্যক্ত করে না, এবং মৃত্যু স্বীকার করিয়াও পতিনিন্দা পরিহার করে। নল রাজা দময়ন্তীকে অরণ্যে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ইহা তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক করেন নাই। যেহেতু নল রাজা রাজ্যভ্রষ্ট ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। অতএব

যদি তিনি গর্হিত কর্ম্মও করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহার প্রতি দময়ন্তীর ক্রোধ করা অনুচিত। ইহা বলিয়া নৃপতি পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন।

কেশিনী অন্তঃপুরে গিয়া দময়ন্তীকে এই সমস্ত বিবরণ কহিল। দময়ন্তী বুঝিলেন ইনিই নল রাজা, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব পুনর্ব্বার তাহাকে বলিলেন তুমি দেখিয়া আইস তিনি কি করিতেছেন, এবং কি ভাবে আছেন। কেশিনী পুনর্ব্বার অশ্বশালায় গিয়া, কিয়ৎ কাল পরে আসিয়া বলিল ঠাকুরাণি, ইনি অবশ্য দেবানুগৃহীত মনুষ্য হইবেন, কেননা, ঋতুপর্ণ ভূপতির আহারার্থে যে মাংসাদি ও অন্য অন্য সামগ্রী দেওয়া গিয়াছিল, সারথি তাহা নিমিষের মধ্যে সকল পাক করিলেন। দময়ন্তী জানিতেন নল ভূপতি শীঘ্র ও অতি উত্তম রন্ধন করিতে পারেন। অতএব পুনর্ব্বার পরিচারিণীকে প্রেরণ করিয়া বলিলেন, তিনি যে সকল ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু লইয়া আইস। কেশিনী এই কথায় সারথির নিকট যাইয়া সকল ব্যঞ্জনের কিছু কিছু লইয়া আসিল। দময়ন্তী তদাস্বাদনে বুঝিলেন ইহা অবশ্যই নলের রন্ধন, কেননা তদ্ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি এমন রন্ধন করিতে পারে না।

অনন্তর দময়ন্তী কেশিনীকে বলিলেন তুমি আর এক

কর্ম্ম কর, আমার কন্যা ও পুত্রকে লইয়া তাঁহার স্থানে যাও, আর, তিনি ইহাদিগকে দেখিয়া কি বলেন তাহা আসিয়া আমাকে কহ। কেশিনী দময়ন্তীর আজ্ঞাতে তাঁহার কন্যা পুত্রকে সারথির নিকটে লইয়া গেল। ছদ্মবেশী নল তাহাদিগকে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এবং তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিয়া, দাসীকে কহিলেন আমার এই প্রকার এক কন্যা ও এক পুত্র আছে, তাহাদিগকে বহুদিবস দেখি নাই, এই নিমিত্ত রোদন করিলাম, তুমি এখন ইহাদিগকে রাজকন্যার নিকট লইয়া যাও। ইহারা অদ্য এক জনের কন্যা পুত্র ছিল, কল্য আর এক জনকে পিতা বলিয়া ডাকিবে; হায়, পৃথিবীতে নারীই ধন্য, তাহারা এক পতি পরিত্যাগ করিয়া অনায়াসে অন্য পতি করিতে পারে। কিন্তু রজনী প্রভাতা হউক, নল-সীমন্তিনী নল ভিন্ন অন্য পতি কি প্রকারে গ্রহণ করেন তাহা দেখিব। ইহা বলিয়া কন্যা পুত্রকে কেশিনীর ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন।

কেশিনী নন্দন ও নন্দিনীকে দময়ন্তীর নিকটে দিয়া, সারথি যে যে কথা বলিলেন তাহা সমুদায় কহিল। নলপ্রিয়া শুনিয়া অত্যন্ত পুলকিতা হইলেন, এবং রাজরাণী গর্ভধারিণীকে সমস্ত বিবরণ কহিয়া, তাহার স্থানে অনুমতি চাহিলেন আমি নল দর্শনে অশ্ব-

শালায় গমন করিব। রাজমহিষী মহা আনন্দিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ কন্যাকে অনুমতি দিলেন। দময়ন্তী অনুমতি পাইয়া কুমার কুমারীকে লইয়া অশ্বশালায় গমন করিলেন।

দময়ন্তী কন্যা পুত্র ক্রোড়ে লইয়া নলের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া, তাঁহার মলিন বেশ অবলোকনে সজল নয়নে কহিলেন হে গুণধাম, তোমার এ কি বেশ, তুমি এখনও বাহুক নাম ধারণ করিয়া, আছ। বল দেখি, যে নারী ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পথশ্রমে ক্লান্তা, এবং এক বস্ত্র পরিধান করিয়া তোমার সঙ্গে অরণ্যে শয়ন করিয়াছিল, তুমি তাহাকে সেই নিদ্রাবস্থায় একাকিনী অনাথা করিয়া কি প্রকারে প্রস্থান করিলে! পৃথিবীতে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ যে নল তাহার কি এই কর্ম্ম! তিনি কি অপরাধে নারীকে অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন! যে নারী চিরকাল স্বামিভক্ত এবং ইন্দ্রাদি দেবগণকে তাচ্ছীল্য করিয়া তোমার অনুগত হইয়াছিল তাহার কি এই পুরস্কার। এবং সভামধ্যে তুমি সত্য করিয়াছিলে আপন নারীকে প্রাণ তুল্য দেখিবে। এমত সত্য করিয়া তাহাকে কি রূপে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভুজঙ্গের মুখে সমর্পণ করিলে!

নল ভূপতি দময়ন্তীর এই সকল বাক্যে লজ্জিত হইয়া বলিলেন, প্রিয়তমে! পতি কি কখন আপন

পত্নী পরিত্যাগ করিতে পারে? কুগ্রহ প্রতিবাদী হইয়া আমার রাজ্যনাশ ও জ্ঞাননাশ ও সর্ব্বনাশ করিল, ঐ কুগ্রহ জন্য আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখ দেখি তোমার বিরহে আমার অস্থি চর্ম্ম সার হইয়াছে। প্রাণত্যাগ না হইয়া এখনও যে জীবিত আছি, এই আশ্চর্য্য। তুমি আমাকে আর ভর্ৎসনা করিও না, পতিব্রতা নারী কখন পতিনিন্দা করেন না, বরং পতির দোষ দেখিলেও তাহা গোপন করেন। অতএব তুমি কেন আমার গ্লানি করিতেছ। আর শুনিলাম তুমি নাকি পুনর্ব্বার স্বয়ম্বরা হইয়া অন্য ভর্ত্তা গ্রহণ করিবে, তজ্জন্য সকল নৃপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ? কিন্তু বল দেখি, পতিব্রতা নারীর পক্ষে ইহা কি উচিত কর্ম্ম হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কাহাকে মনে মনে পতি স্থির করিয়াছ?

দময়ন্তী উত্তর করিলেন, এরূপ সূচনা করা আমার উচিত হয় নাই, যথার্থ বটে, কিন্তু তোমার সহিত পুনঃ সংমিলনের অন্য উপায় ছিল না, এই জন্য এ অপমান পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু আমার এমন অভিপ্রায় নহে যে অন্য স্বামী গ্রহণ করি। এবং অন্য কোন রাজার সভাতেও এই সংবাদ যায় নাই, শুদ্ধ অযোধ্যাতে গিয়াছিল। তাহার কারণ, শুনিয়াছিলাম তুমি ঐ স্থানে আছ, অতএব মনে করিণ

লাম আমার দ্বিতীয় স্বয়ম্বরের কথা শুনিলে তুমি কোন প্রকারেই তথায় থাকিতে পারিবে না, অবশ্য এখানে আসিবে। সে আশা বিফল হয় নাই। এই জন্য তাহা করিয়া ছিলাম, ইহাতে অন্য অভিপ্রায় ছিল না। অতএব ইহার জন্য আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না।

দময়ন্তীর এই সকল বাক্যে, নলের মনে যে কিছু সন্দেহ ছিল তাহা একবারে দূরীভূত হইল, তিনি বুঝিলেন তাঁহাকে আনাইবার জন্যই এই কৌশল হইয়াছিল। অনন্তর বহু দিবসের পর পুনঃ সংমিলনে উভয়ে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন।

রজনী প্রভাতা হইলে, ভীমসেন নরপতি জানিলেন নল রাজা একাল পর্য্যন্ত ঋতুপর্ণ নৃপতির সারথি হইয়া ছদ্মবেশে ছিলেন, অতএব তাঁহার আগমনে রাজা আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন। ঋতুপর্ণ রাজা দময়ন্তীর আশায় নৈরাশ হইয়াও, নলের সহিত দময়ন্তীর পুনর্ম্মিলনে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং নলকে বহু বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, আপনি আমার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে আমি অজ্ঞাতে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, মার্জ্জনা করিবেন। নল কহিলেন আমি আপনকার নিকট অতি সুখে ছিলাম, বিপদ-কালে আপনি আমাকে আশ্রয় দান করিয়া কি

উপকার করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। আমি এই উপকার কখন বিস্মৃত হইব না। এই প্রকার শিষ্টালাপের পর, ঋতুপর্ণ রাজা স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন।

নল ভূপতি কিয়দ্দিবস শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া স্বদেশে গমনেচ্ছু হইলেন। ভীমসেন রাজা তাঁহাকে নিষধে গমন করিতে নিষেধ করিয়া, বলিলেন, আমার আর কন্যা পুত্র নাই, তুমি জামাতা, আমার অবর্ত্তমানে এই দেশের ভূপতি হইবে, অতএব এই খানে বাস কর। কিন্তু নল রাজা তাহাতে সম্মত না হইয়া, বিনয় পূর্ব্বক স্বদেশে গমনার্থ রাজার অনুমতি লইলেন। এবং এক রথ, ষোল হস্তী, পঞ্চশত তুরঙ্গ ও ছয় শত পদাতিক সমভিব্যাহারে নিষধ রাজ্যে যাত্রা করিলেন। দময়ন্তী পিতৃগৃহে রহিলেন।

অনন্তর নল নিষধ রাজ্যে উপনীত হইয়া, পুষ্করের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন আমি তোমার সহিত অক্ষ ক্রীড়াতে সর্ব্বস্ব হারিয়া বনপ্রবেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে আর একবার খেলিবার বাসনা আছে। এবার আত্ম পণ করিয়া খেলিব, তাহাতে যদি তুমি পরাস্ত হও তবে তুমি ও তোমার রাজ্য আমার হইবে, যদি আমি পরাস্ত হই, তবে আমার আত্মা তোমার হইবে। অতএব

আইস, শীঘ্র খেলা আরম্ভ করি। নতুবা ধনুঃ শর লইয়া সংগ্রামে প্রস্তুত হও।

পুষ্কর এই কথায় হাস্য করিয়া বলিলেন একবার সর্ব্বস্ব হারিয়া দেশান্তরী হইয়াছ। কিন্তু দময়ন্তী পণ কর নাই, আমার মনে এই এক আক্ষেপ ছিল। ইহা বলিয়া উভয়ে আত্মপণ করিয়া পাশা খেলা আরম্ভ করিলেন, এই খেলাতে নল রাজা জয়ী হইলেন। নলের জয়ে পুষ্কর কম্পিত-কলেবর হইলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি পূর্ব্বে পাশা জিনিয়া নলকে রাজ্য-চ্যুত করিয়া অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, অতএব, এবার আমার পরিত্রাণ নাই। কিন্তু দয়ালু নল নরপতি তত্তুল্য খলস্বভাব ছিলেন না। তিনি ভ্রাতার হৃৎকম্প দেখিয়া সানুকম্প বাক্যে বলিলেন, পুষ্কর তোমার ভয় কি, আমি যে সকল ক্লেশ পাইয়াছি, তাহা কেবল আমার গ্রহবৈগুণ্য জন্য হইয়াছে, তোমার কিছুমাত্র দোষ ছিল না। অতএব তুমি তজ্জন্য কোন চিন্তা ককরিও না, তুমি পূর্ব্বে যে ভাবে ছিলে সেই ভাবেই থাক, আমি তোমার প্রতি অহিতাচরণ করিব না।

নল রাজার এই অসীম-কারুণিক গুণে পুষ্কর তাঁহার পদানত হইলেন। অনন্তর রাজমন্ত্রিগণ নল রাজাকে ভূস্বামী বলিয়া অভিবাদন করিলেন। এইরূপে নল-রাজা রাজা হওয়াতে নিষধ রাজ্যস্থ প্রজা-বৃন্দ আনন্দ-

সাগরে মগ্ন হইল। অনন্তর নল ভূপতি বিদর্ভ হইতে দময়ন্তী ও কন্যা পুত্রকে আনয়ন করিয়া পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

দ্রৌপদী।

—§§§§—

হস্তিনা নগরের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে পঞ্চাল দেশে দ্রুপদ নামে ক্ষত্রিয়বংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁহার যমজ পুত্র ও কন্যা ছিল। পুত্রের নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন, কন্যার নাম দ্রৌপদী। কন্যা পরম সুন্দরী এবং রাজা বাল্যকালাবধি তাঁহাকে বিবিধ বিদ্যা ও গুণ অভ্যাস করাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি অতি গুণবতী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার যশঃ তাবৎ ধরণীতে খ্যাত হইয়াছিল।

অনন্তর দ্রৌপদী যৌবন-দশা প্রাপ্ত হইলে পঞ্চালাধিপতি, ব্যাস মুনির পরামর্শানুসারে, তাঁহার স্বয়ম্বর হইবার উপলক্ষে এক লক্ষ্য প্রস্তুত করিলেন, অর্থাৎ মণি-যুক্ত-চক্ষুঃ এক স্বর্ণময় মৎস্য নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা শূন্যে অতি উচ্চ স্থানে স্থাপন করিয়া, তাহার কিঞ্চিৎ নীচে এক রাধাচক্র রাখিলেন। ঐ রাধাচক্রের ছিদ্র এমত সূক্ষ্ম যে এক একটী বাণ-মাত্র তন্মধ্য দিয়া যাইতে পারে। এই প্রকার লক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া রাজা, চতুর্দ্দিকস্থ নৃপতিগণকে সংবাদ পাঠাইলেন, যিনি রাধাচক্র

ভেদ করিয়া, উপরিস্থ মৎস্যের চক্ষুর মণি বিদ্ধ করিবেন তাঁহাকে কন্যা দান করিব।

এই সংবাদে গুণবতী দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ অভি-লাষী ক্ষিতীশগণ নানা দিক্ দেশ হইতে পঞ্চালে আগমন করিতে লাগিলেন।

এই সময়, হস্তিনাধিপতি ক্ষত্রিয়বংশীয় পাণ্ডু রাজার পঞ্চ পুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, ও সহদেব, রাজা দুর্যোধনের কুমন্ত্রণাতে রাজ্যচ্যুত ও দেশত্যাগী হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব বিবরণ অতি অপূর্ব্ব, এজন্য তাহা এখানে লেখাগেল।

হস্তিনা নগরে কুরু নামে এক রাজা ছিলেন। ঐ বংশীয় শান্তনু রাজার তিন পুত্র ছিল, বিচিত্রবীর্য্য, ভীষ্ম, ও চিত্রাঙ্গদ। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে বিচিত্র-বীর্য্য রাজা হইয়াছিলেন, ভীষ্ম বিবাহ করেন নাই এবং চিত্রাঙ্গদের সন্তানাদি ছিল না। বিচিত্রবীর্য্যের দুই পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, কনিষ্ঠ পাণ্ডু। তদ্ভিন্ন বিদুর নামে ক্রীতদাসী-গর্ভজাত তাঁহার আর এক পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন, এজন্য কনিষ্ঠ পুত্র পাণ্ডু হস্তিনার রাজা হইয়াছিলেন। পাণ্ডুর দুই পত্নী ছিলেন, কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর গর্ব্ভে যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুন, এবং মাদ্রীর গর্ব্ভে নকুল ও সহদেব, এই পঞ্চ পুত্র জন্মিয়াছিলেন। এই পঞ্চ জনের মধ্যে

যুধিষ্ঠির অতি ধার্ম্মিক, ভীম বলবান, অর্জ্জুন যুদ্ধবিশারদ, এবং নকুল ও সহদেব সুশীল ও নম্র ছিলেন। আর, এই পঞ্চ ভ্রাতার পরস্পর অতিশয় প্রণয় ছিল, এবং সকলেই জ্যেষ্ঠকে অতিশয় মান্য করিতেন। ধৃতরাষ্ট্র রাজার দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি এক শত পুত্র ছিলেন।

পাণ্ডুর লোকান্তর গমনে মাদ্রী সহগমন করিলেন, এবং প্রজাগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনাভিষিক্ত করিল। রাজা দুর্য্যোধন ইহাতে অতিক্ষুণ্ণ হইলেন, এবং তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করণার্থ নানা কুমন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইলেন না। অবশেষে মন্ত্রিগণকে ধন দ্বারা বশীভূত করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন তোমরা সকলে যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বল যে বারণাবত নগর অতি উত্তম স্থান ও পুণ্যক্ষেত্র। মন্ত্রিগণ সেই কথাই বলিলেন। তাহাতে যুধিষ্ঠির ঐ স্থান দর্শনাভিলাষী হইলেন। পরে যখন তিনি ধৃতরাষ্ট্রের স্থানে বিদায় হইতে যান তখন, ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের মন্ত্রণানুসারে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, সে স্থান উত্তম বটে, তুমি সপরিবারে তথায় বাস কর। রাজা যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে অতিশয় মান্য করিতেন, অতএব তাঁহার বাক্য অবহেলন না করিয়া, তাহাই

স্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে দুর্য্যোধন ঐ স্থানে এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। এবং তাহাতে পাণ্ডব গণ বাস করিলে তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া একবারে নিষ্কন্টকে রাজ্য ভোগ করিব এই মন্ত্রণা করিয়া তৎ-কর্ম্ম সমাধানার্থ তথায় লোক রাখিলেন।

যুধিষ্ঠির বারণাবতে গিয়া দেখিলেন যে পুণ্যক্ষেত্র মিথ্যা, তাঁহার রাজ্য লইবার মন্ত্রণা মাত্র। যাহাহউক, ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী বিদুর অতি ধার্ম্মিক এবং পাণ্ডব-দিগের হিতৈষী ছিলেন। তিনি দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণা জানিতে পারিয়া, গোপনভাবে পাণ্ডবদিগকে এই সংবাদ পাঠাইলেন যে দুর্য্যোধন অমুক দিবস জতু-গৃহে অগ্নি দিয়া তোমাদিগের প্রাণ নষ্ট করিবার মন্ত্রণা করিয়াছে। অতএব তোমরা সাবধানে থাকিবে। এবং জতুগৃহে অগ্নি দিলে তাঁহারা পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন এই নিমিত্তে, জতুগৃহের মধ্য দিয়া সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণার্থ এক জন শিল্পকর প্রেরণ করিলেন। ঐ শিল্পকর উপযুক্তমতে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিল। এই রূপে এক বৎসর অতীত হইল। পরে যে দিবস জতুগৃহে অগ্নি দান করিবে সেই দিবস একটী ব্রাহ্মণ-নারী পাঁচটী পুত্র লইয়া ঐ স্থানে অতিথি হইলেন, এবং আহারাদির পর, ঐ গৃহের এক কুঠরীতে শয়ন করিয়া থাকিলেন। ইতিমধ্যে দুর্য্যো-

খনের অনুচরগণ গৃহে অগ্নি দিল, তাহা দেখিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা ও তন্মাতা সত্বর সুড়ঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিলেন। অতিথি ব্রাহ্মণী ও তাহার পঞ্চ পুত্র জতুগৃহে দগ্ধ হইয়া মরিলেন। ইহারাই পঞ্চ পাণ্ডব ও কুন্তী হইবে এই স্থির জানিয়া দুর্য্যোধন মহা আনন্দিত হইলেন, এবং তাহাদের আদ্য ক্রিয়াদি করিয়া মহা আনন্দে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পঞ্চ পাণ্ডব ও কুন্তী সুড়ঙ্গ দিয়া বাহির হইয়া এক বনের মধ্যে পড়িলেন। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা অনায়াসে হস্তিনা নগরে যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মনে এই আশঙ্কা হইল, এখন দুর্য্যোধন রাজ্যাধিপতি, তিনি যদি আমাদিগকে বিনাশ করেন তবে প্রাণরক্ষার আর উপায় নাই। অতএব হস্তিনায় প্রত্যাগমন না করিয়া তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ত্রিগর্ত্ত ও মৎস্য দেশ ভ্রমণ করণানন্তর, একচক্রা নামে এক স্থানে এক ব্রাহ্মণের আলয়ে, বিপ্র পরিচয় দিয়া ভিক্ষুক বেশে কয়েক বৎসর বাস করিলেন। পঞ্চ ভ্রাতা ভিক্ষা করিয়া আনিতেন, কুন্তী রন্ধন করিয়া দিতেন।

এই প্রকারে প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল। তদনন্তর, এক স্থানে থাকিয়া চিরকাল ভিক্ষা ভালরূপ চলে না এবং দ্রুপদ রাজা অতি দাতা ইহা জানিয়া

তাঁহারা পঞ্চালে গমন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে শুনিলেন, দ্রৌপদী স্বয়ম্বরা হইবেন, এই জন্য রাজা এক লক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ঐ লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন তাঁহাকে কন্যা দান করিব। এই কথা শুনিয়া পঞ্চ ভ্রাতা পঞ্চালে গিয়া এক কুম্ভকারের গৃহে অবস্থিতি করিলেন, এবং বিপ্রবেশে ভিক্ষা করণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে দ্রুপদ রাজার নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, প্রভৃতি নানাদেশীয় ও নানাজাতীয় নৃপতি ও বীরগণ নানা দিক দেশ হইতে আসিতে লাগিলেন, তাঁহাদের চতুরঙ্গ সেনা ও অশ্ব রথ গজে তাবৎ নগর পরিপূর্ণ হইল। সকলে মনে মনে আস্ফালন করিতে লাগিলেন, আমিই লক্ষ্য ভেদ করিয়া রাজকন্যা দ্রৌপদীকে লইব। ষোড়শ দিবস গত হইলে পর সভারম্ভ হইল। তখন গুণবতী দ্রুপদ-নন্দিনী জনকের আজ্ঞায় ভুবন-মোহিনী বেশ ধারণ করিয়া, বাম হস্তে দধিভাণ্ড ও দক্ষিণ হস্তে পুষ্পমালা লইয়া, সভায় আসিয়া দণ্ডায়-মানা হইলেন। রাজপণ্ডিত উঠিয়া কহিলেন যিনি লক্ষ্য ভেদ করিবেন তিনি এই রাজকন্যা পাইবেন।

রাজকন্যার মনোহর রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া

সকল রাজা একবারে লক্ষ্য ভেদ করিতে উঠিলেন, এবং আমি অগ্রে বিন্ধিব, আমি অগ্রে বিন্ধিব, এই কথা বলিয়া মহা দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিলেন। পরে অতি প্রধান রাজগণ একে একে লক্ষ্য ভেদ করিতে গেলেন, কিন্তু লক্ষ্য ভেদ দূরে, থাকুক, যে ধনু দ্বারা শর ক্ষেপণ করিতে হইবে অনেকে তাহা উত্তোলন করিতেও পারিলেন না। কেহবা অতি কষ্টে উত্তোলন করিলেন কিন্তু ধনুক নত করিতে পারিলেন না। কেহবা নত করিলেন কিন্তু গুণ দিতে পারিলেন না। কেহবা গুণ দিলেন কিন্তু বাণ ক্ষেপণ করিতে অক্ষম হইলেন। কাহাকেও বা তীর উলটিয়া লাগিল। এই প্রকারে প্রধান প্রধান রাজারা সকলে অক্ষম হইলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা তাহার নিকটেও গেলেন না। ফলতঃ লক্ষ্য এত উচ্চে ছিল যে, মৎস্যচক্ষু দৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, মৎস্যই ভালরূপে দৃষ্টি-গোচর হইতেছিল না, এই জন্য পাত্রে জল রাখিয়া তাহা দেখিতে হইয়াছিল। যখন বড় বড় রাজগণ লক্ষ্য-ভেদে অক্ষম হইলেন, তখন দ্রোণাচার্য্য গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি কুরু পাণ্ডবের গুরু ছিলেন, এবং বাণ-শিক্ষায় তাঁহার তুল্য অন্য বীর কেহ ছিল না। তিনি জলমধ্যে উপবিম্বিত লক্ষ্যের সহিত চক্ষুঃসংলগ্ন রাখিয়া, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বাণ ক্ষেপণ করিলেন, কিন্তু তাহা মৎস্যে লাগিল না।

ভীষ্মও সেই প্রকার সাহস করিয়া উঠিলেন, তিনি বলিলেন আমি যদি লক্ষ্য ভেদ করিতে পারি তবে কন্যা লইয়া দুর্য্যোধনকে দিব। কিন্তু তিনিও কৃত-কার্য্য হইতে পরিলেন না।

এই প্রকার একবিংশতি দিবস সভা হইল। দ্বাবিংশ দিবসে দ্রুপদকুমার পুনঃপুনঃ সভা পরিভ্রমণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষত্রিয় শূদ্রের মধ্যে যিনি মৎস্যচক্ষুঃ ভেদ করিবেন তিনি আমার ভগি-নীকে পাইবেন। কিন্তু কেহ আর সাহস করিলেন না। কেহ কেহ বলিলেন অর্জ্জুন বাণক্ষেপণে অদ্বি-তীয়, তাঁহা বিনা এই লক্ষ্য ভেদ করা কাহারও সাধ্য নহে। এই কথা শুনিয়া কেহ উত্তর করিলেন। অর্জ্জুন কোথায়, দ্বাদশ বৎসর হইল, তিনি মাতা ও ভ্রাতৃগণ সহিত জতুগৃহে দগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করি-য়াছেন।

ঐ দিবস যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা গলিতাম্বর-পরিধানে বিপ্রবেশে, কৌতুক দর্শনেচ্ছু বা ভিক্ষা ব্যব-সায়ী অন্য ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর মধ্যে, স্বতন্ত্র মঞ্চে স্বয়ম্বর-সভায় বসিয়া ছিলেন। অর্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্য শুনিয়া মনে মনে সাহস করিলেন যে আমি লক্ষ্য ভেদ করিব, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অনুমতি ভিন্ন অগ্রসর হইতে না পারিয়া, তাঁহার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করিতে

লাগিলেন। যুধিষ্ঠির ইঙ্গিতে অনুমতি দিলেন। ঐ অনুমতি পাইয়া অর্জ্জুন গাত্রোত্থান করিলেন, তাহা দেখিয়া আর আর বিপ্রগণ হাস্য করিয়া বলিল ভিক্ষুকের এ কুবুদ্ধি কেন। কিন্তু অর্জ্জুন তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া অনায়াসে ধনুক ধারণ পূর্ব্বক জল-প্রতি দৃষ্টিপুরঃসর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া লক্ষ্য ভেদ করিলেন। তদবলোকনে সকল রাজাই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণে এমন রূপবতী কন্যা লইয়া যাইবে এই জন্য সকলে বলিলেন মৎস্যের চক্ষু ভেদ হইয়াছে কি না কিরূপে জানিব। যদি মৎস্য কাটিয়া আনিতে পার তবে সত্য মিথ্যা জানা যাইতে পাবে। অর্জ্জুন তাহাই স্বীকার করিয়া, আর এক বাণে মৎস্য কাটিয়া ভূমিতে ফেলিলেন। তখন সকলে দেখিলেন তাহার চক্ষুঃ ভেদ হইয়াছে। তখন দ্রৌপদী অর্জ্জুনের কপালে দধির ফোটা দিয়া মাল্য দান করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

অর্জ্জুন তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তাহাতে আর আর নৃপতিগণ মনে করিলেন ইহার অন্ন-ভক্ষ্য নাই, কি প্রকারে স্ত্রী পালন করিবে, বুঝি কিঞ্চিৎ অর্থ পাইলে এই কন্যাকে ত্যাগ করিতে পারে, এই জন্য মাল্য গ্রহণ করিল না, ইহা ভাবিয়া কেহ কেহ বলিলেন, তুমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, এই কন্যা তোমার

যোগ্য নহে, তোমাকে কিছু ধন দিতেছি তাহা লইয়া তুমি কন্যাকে আমাদিগকে দাও। অর্জ্জুন হাস্য করিয়া বলিলেন যদি তোমাদের বিবেচনায় ধন শ্রেষ্ঠ হয় তবে আমি পৃথিবীর তাবৎ ধন তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা আমাকে আপন আপন ভার্য্যা প্রদান কর। রাজারা এই ব্যঙ্গোক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাবতে এক পক্ষ হইয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে আপনার পশ্চাতে রাখিয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং ভীম, ভ্রাতাকে আক্রান্ত দেখিয়া প্রচণ্ড-প্রতাপে বৃক্ষাদি উৎপাটন-পূর্ব্বক তৎপ্রহারে বিপক্ষ রাজগণকে লণ্ড ভণ্ড করিলেন।

এই প্রকারে রণজয়ী হইয়া পঞ্চ ভ্রাতা জয়োল্লাসে দ্রৌপদীকে লইয়া কুম্ভকারগৃহে মাতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। কুন্তী তাঁহাদের বিলম্বে নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভীম তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন জননি, অদ্য তুমি সমস্ত দিবস উপবাসিনী আছ, আমরা মহা-কলহে পতিত হইয়াছিলাম, এজন্য এত রাত্রি হইল। কিন্তু বাহির হইয়া দেখ, কেমন উত্তম ভিক্ষা আনিয়াছি। কুন্তী কহিলেন, বৎস তোমার সুধাবৎ বাক্যে আমার ক্ষুধা দূর হইল। তোমরা যাহা আনয়ন করিয়াছ পঞ্চ ভ্রাতায় বিভাগ করিয়া ভোগ কর। ইহা বলিয়া কুন্তী গৃহ হইতে বাহির

হইয়া একে একে পুত্রগণকে চুম্বন করিয়া, দ্রৌপদীকে তাঁহাদিগের পশ্চাতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ যুবতী কে। ভীম বলিলেন একচক্রা হইতে আসিবার সময় যে দ্রৌপদীর কথা শুনিয়াছিলে সেই দ্রৌপদী ইনি, ইহার জন্য অদ্য এত রাত্রি হইল। কুন্তী বলিলেন বৎস, এই কন্যাকে ভিক্ষা বলিয়া কি কুকর্ম্ম করিলে, আমি ভিক্ষা বিবেচনা করিয়া তোমাদিগকে বিভাগ করিয়া ভোগ করিতে বলিয়াছি। আমি তোমাদিগের গর্ভধারিণী, আমার আজ্ঞা কি রূপে লঙ্ঘন করিবে, ইহা বলিয়া কুন্তী রোদন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন জননি সে জন্য চিন্তা কি, আপনার আজ্ঞা আমাদিগের শিরোধার্য্য।

পরে ভীম অর্জুন দুই ভ্রাতা ভিক্ষা করিতে গেলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা তণ্ডুলাদি ভিক্ষা করিয়া আনিলেন। দ্রৌপদী কুন্তীর আজ্ঞানুসারে তাহা রন্ধন করিয়া সমুদয় অন্ন ব্যঞ্জনের অর্দ্ধ ভাগ ভীমকে দিলেন, অন্যার্দ্ধ পঞ্চ অংশ করিয়া চারি অংশ চারি ভ্রাতাকে দিলেন, অবশিষ্ট অংশের অর্দ্ধেক কুন্তীকে দিয়া আপনি শেষার্দ্ধ ভোজন করিলেন। পরে তিনি সর্ব্বোচ্চে কুন্তীর শয্যা, তাঁহার অধোভাগে পঞ্চ ভ্রাতার শয্যা বিস্তার করিয়া দিলেন। সকলে শয়ন করিলে, আপনি অধোভাগে কুশাসনে শয়ন করিয়া থাকিলেন।

অর্জ্জুন রাজকন্যাভিলাষী রাজগণকে পরাস্ত করিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করিলে, দ্রুপদ রাজা, কন্যাকে কোন্ দরিদ্র ব্রাহ্মণ লইয়া গেল, তাহার দশা কি হইবে, এই ভাবনায় ভাবিত হইয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ছদ্ম বেশে তাঁহা- দিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া গোপন ভাবে কুম্ভকারের গৃহে থাকিয়া, তাঁহারা যাহা যাহা করিলেন, সকল দেখিলেন। অনন্তর যখন সকলে শয়ন করিলেন, তখন পিতার নিকটে আসিয়া তাবৎ বিবরণ নিবেদন করিয়া বলিলেন, ইহারা সামান্য মানব নহেন, অবশ্য মহা বংশোদ্ভব হইবেন, কোন কারণ বশতঃ ছদ্মবেশী হইয়া আছেন। রাজা এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণে কতক শান্ত হইলেন। পরে পঞ্চ ভ্রাতা ও তন্মাতাকে আন- য়নার্থ ছয়খান উত্তম রথ প্রেরণ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহা লইয়া পঞ্চ ভ্রাতাকে পঞ্চ রথে এবং দ্রৌপদীকে ও কুন্তীকে এক রথে আরোহণ করাইয়া রাজসদনে আনয়ন করিলেন। রাজা পঞ্চ ভ্রাতাকে বহু সম্মান করিয়া বসাইলেন। কুন্তী ও দ্রৌপদী অন্তঃপুরে গেলেন।

পরে রাজা পঞ্চ ভ্রাতাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করি- লেন, আর বলিলেন, আমি ব্যাসের পরামর্শানুসারে লক্ষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলাম। তিনি কহিয়া ছিলেন

"পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কেহ এই লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন না।" কিন্তু অর্জ্জুন চারি ভ্রাতা ও মাতা সহ জতুগৃহে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, এতএব তোমরা কে, আমাকে যথার্থ কহ। যুধিষ্ঠির বলিলেন আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি লক্ষ্য ভেদ করিবে তাহাকে কন্যাদান করিবেন, ব্যক্তিভেদ বা জাতিভেদের উল্লেখ ছিল না, অতএব আমরা যে হই তাহার পরিচয়ের প্রয়োজন কি। পুরোহিত বলিলেন সে কথা যথার্থ, কিন্তু পরিচয় দিবার হানি কি। যুধিষ্ঠির তখন আপনাদের পরিচয় দিলেন, এবং জতুগৃহ হইতে যেরূপে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন তাহাও কহিলেন। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং শুভক্ষণ দেখিয়া তখনি অর্জ্জুনের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন আমরা মাতৃ আজ্ঞা পালনার্থ এই কন্যাকে পঞ্চ ভ্রাতা বিবাহ করিব। রাজা এই কথায় বিস্ময়যুক্ত হইয়া বলিলেন, এক কন্যা কি প্রকারে পঞ্চ জনের ভার্য্যা হইবে। এ ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত নহে, এবং ইহা কুত্রাপি চলিত নাই। যুধিষ্ঠির কহিলেন বেদমতে মাতা পরম গুরু, এবং মাতৃ আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, অতএব তাঁহার আজ্ঞা কিরূপে অবহেলন করিব।

এই প্রকার কথোপকথন কালে রাজসভায় ব্যাস

প্রভৃতি অনেক মুনিবরের সমাগম হইল। তাঁহারা বিধান দিলেন যে মাতৃ-আজ্ঞানুসারে পাঁচ ভ্রাতা এক ভার্য্যা করিতে পারেন, এবং যদিও ইহা লোকাচার-বিরুদ্ধ, কিন্তু ইহাতে দ্রৌপদীর চরিত্রে দোষ স্পর্শ হইবেক না, এবং তিনি সতীমধ্যে অগ্রগণ্যা হইবেন। পঞ্চালেশ্বর মুনিগণের বিধানানুসারে পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ দিলেন। পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চালে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ, দুর্য্যোধনের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই হস্তিনা নগরে প্রচার হইল। বিদুর তাহা শুনিয়া, পরমানন্দিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র রাজাকে বলিলেন মহারাজ দ্রুপদনন্দিনী গুণবতী দ্রৌপদী আপনার গৃহে আসিতেছেন। অন্ধরাজ মনে করিলেন দুর্য্যোধন লক্ষ্য ভেদ করিতে গিয়াছেন, তিনিই দ্রৌপদীকে লইয়া আসিতেছেন। ইহা ভাবিয়া অতি আনন্দিত হইয়া বলিলেন তবে তুমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া গৃহে আনয়ন কর। বিদুর বলিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন, এবং তাঁহার নিমিত্ত অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল। ইহা বলিয়া সমস্ত বিবরণ কহিলেন। রাজা বিমর্শ হইলেন।

ইহার তিন দিবস পরে দুর্য্যোধন সসৈন্যে প্রত্যা-

গত হইয়া, পিতাব স্থানে যুধিষ্ঠিবেব বিবাহেব কথা শুনিয়া এক কালে অন্ধকাব দেখিলেন। তিনি জানি-তেন পাণ্ডবেরা জতুগৃহে দগ্ধ হইয়া মবিয়াছে, কিন্তু তাহারা জীবদ্দশায় আছে, অধিকন্তু সর্ব্বজয়ী হইয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছে, আর তিনি তাঁহাদিগের বিনাশজন্য এত চেষ্টা কবিয়াও সিদ্ধকার্য্য হইলেন না, এবং জগৎ ব্যাপিয়া তাঁহার অখ্যাতি হইল, ইহাতে অতিশয় লজ্জিত হইলেন। তাঁহাব আবও চিন্তার বিষয় এই হইল, পাণ্ডবেবা দ্রুপদ রাজাব সাহায্যে রাজ্য লইতে আসিবে, তাহাব কি উপায়। তিনি এক-বার মনে কবিলেন দ্রুপদ রাজাকে অর্দ্ধেক রাজ্য অঙ্গীকাব করিয়া এই বলিয়া পাঠাই, পাণ্ডবগণ আমাব শত্রু, তিনি তাহাদিগকে বিনাশ কবেন। বারান্তরে ভাবিলেন কতক গুলিন পরম সুন্দবী নাবী পাণ্ডব-দিগেব নিকট প্রেরণ কবি, ঐ সকল নাবীতে বশীভূত হইয়া তাহারা দ্রৌপদীকে অনাদব কবিবে, তাহা হইলে দ্রুপদ বাজা তাহাদিগেব প্রতি রুষ্ট হইবেন। কখনবা ইহাও মনে করিলেন, কোন সুহৃদ্ভেদী বিপ্রকে প্রেরণ করি, সেই বিপ্র পাণ্ডবগণের মধ্যে আত্মকলহ ঘটাইয়া দেয়, অথবা তাহাদিগকে বিষ ভক্ষণ কবায়। এই প্রকার বিবিধ মন্ত্রণা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সুপ্রতুল দেখিলেন না। অতএব নিরুপায় প্রযুক্ত

অবশেষে এই স্থির করিলেন যে পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধেক রাজ্য দেওয়া যাউক, তাহা হইলে তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না, তাহাতেও আমাদিগের অর্দ্ধেক রাজ্য থাকিবে, নতুবা তাহারা কুরুবংশ একবারে ধ্বংস করিবে।

এই পরামর্শ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে দ্রুপদ রাজার সভায় প্রেরণ করিলেন। বিদুর ঐ রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন তাঁহার সহিত ধৃতরাষ্ট্র রাজার বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে তিনি বড় আহ্লাদিত হইয়াছেন। এবং তাঁহার অভিলাষ যে তাঁহার সহিত চিরকাল সখ্য থাকে। তিনি আরও বলিলেন কুরুরাজ ও তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ সকলে দ্রৌপদীকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, এবং পাণ্ডবগণকে বহু কালাবধি দেখেন নাই, এই জন্য তাঁহাদিগকে লইতে পাঠাইলেন। দ্রুপদ রাজা এতাবৎ সংবাদ শ্রবণ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন, এবং কন্যা ও জামাতাদিগকে মাতা সহ হস্তিনা নগরে প্রেরণ করিলেন।

পাণ্ডবগণ হস্তিনা নগরে আগমন করিলে, রাজ্যমধ্যে মহা আনন্দোৎসব পড়িল, এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাবতে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিল। ধৃতরাষ্ট্র ও তৎ-পুত্রগণ কপট আহ্লাদ দর্শাইয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষ-

ণাদি করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে অর্দ্ধেক রাজ্য বিভাগ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানী করিতে বলিলেন। পাণ্ডবেরা তাহাই স্বীকার করিয়া মাতা এবং পত্নী সহিত খাণ্ডবপ্রস্থে রাজ্য করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের সহিত এত শত্রুতা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্য তাঁহাদিগের এত ক্লেশ হইয়াছিল, তাঁহারা তাহা ভ্রমেতেও স্মরণ করিলেন না।

যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যে প্রজাগণ অত্যন্ত সুখী হইল। দ্রৌপদী যেমন গুণবতী, তেমনি ধর্ম্মশীলা ছিলেন, এবং পঞ্চপতির পরম প্রিয়া হইয়া পরমাহ্লাদে থাকিলেন। পাণ্ডবেরা এই নিয়ম করিলেন এক এক ভ্রাতা এক এক বৎসর দ্রৌপদীর সহবাস করিবেন। এই নিয়ম তাঁহারা অতি উত্তম রূপে পালন করিয়াছিলেন। এক সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী একত্র ছিলেন। ঐ সময়ে অর্জ্জুন কোন প্রয়োজন বশতঃ তাঁহাদিগের সম্মুখ দিয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে নিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে এই বিবেচনায় তিনি দ্বাদশ বৎসর বনপ্রবাস করিলেন। এই বনবাস কালে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহোদরা সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ব্ভে অভিমন্যু নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করাতে দ্রৌপদীর কিঞ্চিৎ মনোদুঃখ হইয়াছিল,

কিন্তু সেজন্য তাঁহার প্রতি অর্জ্জুনের স্নেহের কিঞ্চিন্মাত্র খর্ব্বতা হয় নাই, বরং তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া মানিতেন। এবং দ্রৌপদীও সুভদ্রাকে ভগিনীর ন্যায় দেখিতেন।

অনন্তর দ্রৌপদীর, পঞ্চ পতির ঔরসে পঞ্চ পুত্র জন্মিল। ঐ পঞ্চ পুত্রের নাম প্রতিবিন্দ, সুতসোম, শতকর্ম্মা, শতানীক, ও শ্রুতসেন। ইহারা পিতা-দিগের ন্যায় সুপুরুষ ও ধর্ম্মশীল ছিলেন, এবং শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যায় অতি সুপণ্ডিত হইলেন। এই সকল সন্তানের গুণে পঞ্চ পাণ্ডব অতিশয় সুখী হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবদিগের পরম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিলেন। এই যজ্ঞার্থে রাজ্য বিস্তৃত করিবার প্রয়োজন হইল, তজ্জন্য চারি ভ্রাতা চারি দিকে অর্থাৎ ভীম পশ্চিমে, অর্জ্জুন উত্তরে, নকুল পূর্ব্বে, ও সহদেব দক্ষিণে, সসৈন্যে মহা সমা-রোহে যাত্রা করিলেন। ঐ ঐ দিকে যে সকল হিন্দু ও যবন রাজা রাজ্য করিতেন তাহাদিগের কাহাকেও বলে ও কাহাকেও কৌশলে পরাজয় এবং কাহাকে বা বিনয়ে বশীভূত করিলেন। তাহাতে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে লঙ্কা, পশ্চিমে সিন্ধুদেশ ও পূর্ব্বে মগধ পর্য্যন্ত যত রাজ্য ছিল সকল অধীন হইল। ঐ সকল নৃপতি তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া কর দিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা ঐ সকল রাজ্য হইতে

শকট, উষ্ট্র, ও বৃষ বোঝাই করিয়া অসঙ্খ্য অর্থ ও মণি মুক্তা প্রবালাদি আনয়ন করিলেন। ইহা ভিন্ন মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, দাস দাসী ও উষ্ট্র গবী ও অন্য অন্য দ্রব্যাদি কত আনিলেন তাহা অগণনীয়। এই প্রকারে পাণ্ডবগণের মহা ঐশ্বর্য্য হইল, এবং তদবধি তাঁহাদিগের রাজধানীর নাম ইন্দ্রপ্রস্থ হইল।

এই স্থলে লেখা কর্ত্তব্য, যে সকল দেশ পাণ্ডবেরা জয় করেন নাই তাহাকে পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ কহা যায়, ঐ সকল দেশের লোকেরা আচারভ্রষ্ট। পাণ্ডবেরা যে সকল দেশ জয় করিয়াছিলেন, সে সকল দেশে তদ্রূপ ভ্রষ্ট আচার নাই।

চারি ভ্রাতা দিগ্বিজয় করিয়া আসিলে পর, রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞের নিমিত্ত এক সভা প্রস্তুত হইল, তাহা চারি ক্রোশ দীর্ঘে ও চারি ক্রোশ প্রস্থে, সমুদায়ে ষোল ক্রোশ চতুঃসীমা। আর ঐ যজ্ঞে ছোট বড় এক লক্ষ রাজার নিমন্ত্রণ হইল, তাঁহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাসস্থান এবং তাঁহাদের সমভিব্যাহারি সৈন্য ও দাস দাসী পশ্বাদি থাকিবার জন্য স্বতন্ত্রং স্থান প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহা ভিন্ন অন্য লোক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভিক্ষুক কত আসিল তাহার সঙ্খ্যা নাই। তাহাদেরও নিমিত্তে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান ও দাস দাসী নিয়োজিত

হইল। এবং যে পর্য্যন্ত যজ্ঞ সমাধা হয় নাই সে পর্য্যন্ত ভিক্ষুক ও নিমন্ত্রিত তাবৎ লোকের আহার প্রদত্ত হইতে লাগিল। কথিত আছে প্রতিদিন এক এক ঘন্টায় লক্ষ লক্ষ লোক ভোজন করিতে লাগিল, এবং কেহ অসন্তুষ্ট হয় নাই। বিশেষ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই যজ্ঞের অধ্যক্ষ এবং দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন ভাণ্ডারী হইযাছিলেন। তাঁহারা পাণ্ডবদিগের চিরশত্রু, দুই হস্তে যাহাকে যত পারিয়াছিলেন দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কবিয়াও তাহারা পাণ্ডবদিগের অখ্যাতি কবিতে পারেন নাই। ববং পাণ্ডবেরা যজ্ঞ উপলক্ষে করদ রাজাদিগের স্থানে যে রত্নালঙ্কার ও অর্থ ভেট পাইয়াছিলেন তাহা সমুদায় ব্যয় হয় নাই।

এই বাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবদিগের অত্যন্ত যশো বৃদ্ধি হইল, এবং আর আর সকল রাজারা দেখিলেন, যে কর্ম্ম কখন কেহ করিতে পাবেন নাই তাহা তাঁহারা করিলেন। কিন্তু এই যশ তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ হইল, যেহেতু তাহাতে দুর্য্যোধনের ঈর্ষার পুনরুদ্রেক হইল। তিনি ভাবিলেন আমি পাণ্ডবদিগকে অধঃপাতে দিয়াছিলাম; পরে অনুগ্রহ করিয়া অর্দ্ধেক রাজ্য দিয়াছি, কিন্তু ইহাতেও তাহারা অগ্রগণ্য ও মান্য হইল, অতএব তাহাদিগের বিনাশ চেষ্টা করিতে

হইয়াছে। ইহা ভাবিয়া বন্ধু বান্ধবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার উপায় কি। তাঁহার মাতুল শকুনি বলিলেন, তুমিও দিগ্বিজয় ও সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তোমারও যশ বৃদ্ধি হইবে। দুর্য্যোধন বলিলেন পাণ্ডবদিগকে অগ্রে জয় করিতে না পারিলে সে আশা বিফল। শকুনি বলিলেন তাহারা যেরূপ বীর পুরুষ তাহাতে তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাজয় করা অসাধ্য। কিন্তু বিনা সংগ্রামে তাহাদিগকে পরাজয় করিবার এক উপায় আছে। দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উপায় কি? শকুনি কহিলেন আমি দ্যূত (পাশ) ক্রীড়া ভাল জানি, যুধিষ্ঠির খেলিতে জানেন বটে, কিন্তু তাদৃক পটু নহেন, তুমি যদি কোন প্রকারে তাঁহাকে তৎক্রীড়াতে প্রবৃত্ত করিতে পার তবে অনায়াসে তাঁহার সর্ব্বস্ব লওয়া যাইতে পারে।

দুর্য্যোধন এই কথায় অত্যন্ত পুলকিত হইয়া তখনি পিতার স্থানে সেই কথা নিবেদন করিলেন। ধৃত-রাষ্ট্র হঠাৎ অনুমতি না দিয়া প্রথমতঃ সভাসদগণকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সভাসদেরা দুর্য্যো-ধনের হিতাভিলাষে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ বিদুর ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া বলিলেন, ইহা করিও না, ইহাতে ভবিষ্যতে আপনার অমঙ্গল হইবে। কিন্তু অন্ধরাজ পুত্রের প্রতি স্নেহবাহুল্য প্রযুক্ত তাঁহার বাক্যে

অবহেলন করিয়া তাঁহাকেই দ্যূত-ক্রীড়ার্থে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতাকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। বিদুর তদাজ্ঞায় ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সভাতে দ্যূতক্রীড়া হইবে, অতএব তিনি আপনাদের পঞ্চ ভ্রাতাকে আহ্বান করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন অক্ষক্রীড়া অমঙ্গলের মূল এবং তাহাতে পিতা মহাশয় নষ্ট হইয়াছেন। বিদুর কহি-লেন তাহা মিথ্যা নহে, দ্যূতক্রীড়াতে অনেকের দুর্গতি হইযাছে, আমি আজ্ঞা বাহক, রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলাম, আপনি বিচক্ষণ, যেমন বিবেচনা হয় করুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন যখন জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় আহ্বান করিয়াছেন তখন তাঁহার আজ্ঞায় অবজ্ঞা করা হয় না। ইহা বলিযা সে দিবস বিদুরকে বিদায় করিযা, পর দিবস পঞ্চ ভ্রাতা পঞ্চ রথারোহণে হস্তিনা নগরে গমন করিলেন।

পাণ্ডবগণ আসিবেন জানিয়া দুর্য্যোধন ঐ দিবস কর্ণ দ্রোণ ভীষ্ম প্রভৃতি সকল আত্মীয় ও স্বীয় ভ্রাতৃ-গণকে একত্র করিয়া সভা করিয়াছিলেন। পঞ্চ পাণ্ডব আসিবা মাত্র সকলে তাঁহাদিগকে সমাদর করিলেন। তাহার পর শকুনি পাশা বাহির করিয়া যুধিষ্ঠিরকে তৎ ক্রীড়াতে আহ্বান করিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন পাশা খেলাতে পরাক্রম প্রকাশ হয় না, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম

যুদ্ধ। শকুনি কহিলেন যুদ্ধে জাতিভেদ থাকে না, নীচ জাতি যবনও ভদ্রকে প্রহার করিতে পারে। পাশা খেলা সমান লোক ব্যতীত হয় না। যুধিষ্ঠির বলিলেন এ খেলা আমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু যখন তুমি আমাকে আহ্বান করিলে তখন আমি ইহাতে পরাঙ্মুখ হইব না, কেন না, এতাদৃশ বিষয়ে পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। ইহা বলিয়া খেলিতে প্রস্তুত হইলেন। দুর্য্যোধন বলিলেন আমার পরি-বর্ত্তে শকুনি খেলিবেন, ইনি যাহা হারেন আমি দিব। যুধিষ্ঠির বলিলেন তবে খেল, ইন্দ্রপ্রস্থে আমার যত রত্নভাণ্ডার আছে আমি তাহা সমস্ত পণ করিলাম, কিন্তু তুমি হারিলে এত ধন কোথা হইতে দিবে। দুর্য্যোধন বলিলেন সে জন্য চিন্তা কি, যে প্রকারে পারি দিব। পরে শকুনি পাশা নিক্ষেপ করিয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, এই দেখ আমি জিতিয়াছি। যুধিষ্ঠির এই বাক্যে কুপিত হইয়া আপনার যুদ্ধের যাবতীয় অশ্ব পণ করিলেন। শকুনি তাহাও জিতিলেন, তাহাতে যুধিষ্ঠির আরও কুপিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মাতঙ্গ, শকট, দাস, দাসী, ছাগ, মেষ ও বৃষাদি সকল হারিলেন, তাহার পর আপন অধীন তাবৎ রাজ্য ও পুত্রগণের অঙ্গাভরণ পর্য্যন্ত হারিলেন, এবং অব-শেষে চারি ভ্রাতা ও আপনাকেও হারিলেন। যখন

যাজ্ঞা যুধিষ্ঠির আপনাকে ও ভ্রাতৃগণকে হারিলেন, তখন শকুনি হাস্য করিয়া বলিলেন, একর্ম্ম ভাল করিলে না, এইবার দ্রৌপদীকে পণ করিয়া আপনাকে ও ভ্রাতৃগণকে উদ্ধার কর। যুধিষ্ঠির বলিলেন, যিনি রূপে লক্ষ্মী, যাঁহার গুণের ইয়ত্তা করা যায় না, ও যিনি দ্বিজ দাস দাসী ও পশুগণকে জননী ভাবে পালন করেন, এমন বহুমূল্য দ্রৌপদীকে কদাচ পণ করিতে পারি না। শকুনি বলিলেন যিনি লক্ষ্মী রূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাকে পণ করিলে তুমি সর্ব্বজয়ী হইবে। রাজা এই কথায় ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাকেও পণ করিলেন এবং হারিলেন। তখন দুর্য্যোধন পঞ্চ ভ্রাতাকে রাজপরিচ্ছদ বর্জ্জিত করিয়া প্রত্যেককে এক এক সামান্য বস্ত্র পরিধান করাইয়া সভা হইতে নীচে নামাইয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং বিদুরকে আজ্ঞা করিলেন, দ্রৌপদীকে সভায় লইয়া আইস।

বিদুর এই আজ্ঞায় মহাক্ষুন্ন হইয়া বলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ আপনাকে হারিয়াছেন, অতএব যৎকালে তিনি দ্রৌপদীকে পণ করেন তখন তাঁহার তাঁহাতে অধিকার ছিলনা। সুতরাং তাঁহার পণ করা ও হারাতে তোমার দ্রৌপদীতে অধিকার হইতে পারে না। দুর্য্যোধন এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রতিগামী নামে এক ভৃত্যকে আজ্ঞা করিলেন দ্রৌপ-

দীকে লইয়া আইস। প্রতিগামী দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় দ্রৌপদীর নিকটে যাইয়া তাবৎ বিবরণ জ্ঞাপন করিল। দ্রৌপদী শুনিয়া প্রতিগামীকে কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আইস তিনি প্রথমে আপনাকে হারিয়াছিলেন, কি আমাকে হারিয়াছিলেন, যদি প্রথমে আপনাকে হারিয়া থাকেন তবে সভাসদ গণের বিবেচনায় আমার যাওয়া উচিত হয় যাইব। প্রতিগামী আসিয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে যুধিষ্ঠির কোন উত্তর করিলেন না। দুর্য্যোধন কুপিত হইয়া প্রতিগামীকে বলিলেন যুধিষ্ঠিরকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি দ্রৌপদীকে শীঘ্র লইয়া আইস, তাহার যে প্রশ্ন থাকে সে এই খানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে।

প্রতিগামী পুনর্ব্বার দ্রৌপদীর স্থানে যাইয়া এই সকল কথা জ্ঞাপন করিল, আর বলিল দুর্য্যোধন এই কর্ম্ম করিয়া আপনার মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছেন। দ্রৌপদী কহিলেন সে কথা সত্য, কিন্তু তুমি একবার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তিনি আমাকে সভায় যাইতে আজ্ঞা করেন কি না। প্রতিগামী যাইয়া যুধিষ্ঠিরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, যুধিষ্ঠির বলিলেন আমি যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহার অন্য উপায় নাই, এই ক্ষণে দ্রৌপদী আসিয়া আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন। প্রতিগামী ইহা শুনিয়া পুনর্ব্বার চলিল,

কিন্তু কতক দূর হইতে ফিরিয়া আসিয়া, দুর্য্যোধনকে জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ, যদি দ্রৌপদী না আইসেন তবে কি করিব।

দুর্য্যোধন মহা কুপিত হইয়া স্বীয় অনুজ দুঃশাসনকে কহিলেন ইহার কর্ম্ম নহে, তুমি যাইয়া দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক লইয়া আইস। দুর্যোধন যেমন দুর্জ্জন দুঃশাসন সেইমত দুঃশীল, ভ্রাতার আজ্ঞা পাইয়া তখনি ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া পবন-বেগে দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দ্রৌপদী তাহাকে দেখিয়া ভয়াকুলিতা হইয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কুন্তী প্রভৃতি আর আর পুরবাসিনীগণ দুঃশাসনকে অবরোধ করিলেন। কিন্তু দুঃশাসন তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দ্রৌপদীকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া, তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক লইয়া চলিল। দ্রৌপদী মহা অপমান জ্ঞানে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে গগণমণ্ডল বিদীর্ণ হইল। দুর্য্যোধনের মিত্রগণ তদ্দর্শনে হাস্যমুখ হইয়া দ্রৌপদীকে নানাপ্রকার দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিল। দ্রৌপদী সভ্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক, পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন হে কর্ণ, হে দ্রোণ, হে ভীষ্ম, তোমাদিগের সম্মুখে আমার এই প্রকার অপমান হইতেছে, ইহা দেখিয়া তোমরা স্বচ্ছন্দে রহিয়াছ, এ তোমাদের কেমন ধর্ম্ম। কিন্তু কেহ কোন উত্তর করিলেন না। পঞ্চ ভ্রাতা

প্রেয়সীর দুঃখ ও অপমানে অধোবদন হইয়া থাকিলেন। এবং যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রত্ব তুল্য রাজত্ব গিয়া যে দুঃখ না হইয়াছিল দ্রৌপদীর দুঃখ দেখিয়া ততোঽধিক হইল।

দুর্য্যোধন ইহাতেও তুষ্ট না হইয়া আজ্ঞা করিল, দ্রৌপদীর অঙ্গাভরণ কাড়িয়া লও। এ কথা বলিবা মাত্রেই দ্রৌপদী স্বহস্তে আপন আভরণাদি খুলিয়া দিলেন। কিন্তু পাপিষ্ঠ তাহাতেও অভীষ্টসিদ্ধি জ্ঞান না করিয়া, দুঃশাসনকে তাঁহার বস্ত্র হরণ করিতে আজ্ঞা দিল। দুঃশাসন ঐ আজ্ঞায় তাঁহার বস্ত্রাকর্ষণ করিল। দ্রৌপদী বস্ত্রের অঞ্চল ধরিয়া অর্দ্ধবসনা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং প্রধান প্রধান সভা-সদগণের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক নানা প্রকার কাতরোক্তি ও বিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে তাহারা আরো কৌতুকবিশিষ্ট হইল। পঞ্চ পাণ্ডব তদব-লোকনে অধোবদন হইলেন। ভীম ও অর্জ্জুন এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া একএকবার কুরুবংশ ধ্বংস করিব বলিয়া গর্জ্জিতে লাগিলেন, কিন্তু ধার্ম্মিক-বর যুধিষ্ঠির ধর্ম্মানুরোধে তাঁহাদিগকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে কহিলেন। দ্রৌপদী নিতান্ত নিরুপায় জ্ঞান করিয়া পরমেশ্বরের স্মরণপূর্ব্বক হাহাকার শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন-ধ্বনিতে কোন কোন কুরুবংশীয়ের পাষাণ তুল্য অন্তঃকরণও আর্দ্র হইল।

অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরস্থ নারীগণ অন্তঃপুর হইতে দ্রৌপদীর এইরূপ অপমান দেখিয়া হাহা শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। পশু পক্ষিগণ শোকধ্বনি করিতে লাগিল। এবং নগরস্থ প্রজাগণ নানাপ্রকার আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। নগরে একটা মহাগোল পড়িল। এবং কেহ কেহ সতীর অপমানে মহা কুপিত হইয়া রাজদ্রোহী হইবার উপক্রম করিল। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের চেতনা হইল। তিনি দেখিলেন মহাবিপদ উপস্থিত, অতএব স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় অবাধ্য পুত্রের কর্ম্মে লজ্জিত হইয়া, দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে ক্ষান্ত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দ্রৌপদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, নানা প্রকার স্তুতিপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন দুর্যোধন অবোধ, ইহার অপরাধ মার্জ্জনা কর। ইহা বলিয়া দ্রৌপদীর দাসীত্ব মোচন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন আমার নিকট তোমার কি প্রার্থনা আছে বল আমি তাহা প্রদান করিতেছি। দ্রৌপদী বলিলেন যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠিরের দাসত্ব মোচন করিতে আজ্ঞা হউক, কেননা তিনি অতি ধার্ম্মিক, বিশেষতঃ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁহাকে কেহ দাস বলিলে আপনারই কলঙ্ক। ধৃতরাষ্ট্র তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, তোমার আর কি প্রার্থনা

আছে বল। দ্রৌপদী বলিলেন আমার আর চারি পতিকেও দাসত্ব হইতে মুক্ত করুন। রাজা তথাস্তু বলিয়া, তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার আর কি মনোবাঞ্ছা বল। দ্রৌপদী বলিলেন আমার পঞ্চ স্বমীর দাসত্ব মোচনে, আমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, বিশেষতঃ দুই বরের অধিক বর প্রার্থনা করা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ, অতএব আমি আর বর চাহিনা। এই কথায় ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। দ্রৌপদীর ও পঞ্চ পাণ্ডবের দাসত্ব মোচন দেখিয়া, রাজবিদ্রোহকরণোদ্যত প্রজাগণ নিরস্ত হইল।

তদনন্তর যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি পুরঃসর নিবেদন করিলেন এক্ষণে আমাদিগের প্রতি কি আজ্ঞা হয়। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও রাজমহিষী গান্ধারী তাঁহাদিগকে সন্তানের ন্যায় নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিয়া, দুর্য্যোধন তাঁহাদের রাজ্যাদি যে কিছু লইয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া পূর্ব্বরূপ রাজত্ব করিতে আজ্ঞা দিলেন।

এই আজ্ঞায় পরমানন্দিত হইয়া পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদীসহিত ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন। দুর্য্যোধন ভাবিলেন, একর্ম্ম ভাল হইল না। প্রবল শত্রুকে পতনে পাইলে কখন ত্যাগ করা উচিত নহে। বিশেষ, ইহা-

দিগকে এত অপমানের পর ছাড়িয়া দেওয়া গেল, ইহারা সতত আমাদিগের বিনাশ চেষ্টায় থাকিবে। কি জানি অদ্যই যদি সসৈন্যে আইসে, ইহা চিন্তা করিয়া পিতাকে নানা প্রকার বুঝাইতে লাগিলেন, এবং কহিলেন আমি পাণ্ডবদিগকে এত করিয়া করস্থ করিলাম, তুমি অনায়াসে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে, ইহা সুবুদ্ধির কর্ম্ম হইল না, কেননা এক্ষণে তাহারা রণ সজ্জা করিয়া একবারে আমাদের বিনাশ করিবে, অতএব যাহাতে এ বিপদ ঘটনা না হয় তাহা কর। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবাক্যে ভ্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা নিবারণের উপায় কি। দুর্য্যোধন কহিলেন তাহা নিবারণের একমাত্র উপায় আছে, যদি তুমি তাহা-দিগকে এখনি ফিরাইয়া আনাও তবে আমি পুনর্ব্বার তাহাদিগের সঙ্গে এই পণ করিয়া পাশা খেলি, যে ব্যক্তি পরাজিত হইবে সে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস করিবে, এবং অজ্ঞাত বাসের মধ্যে যদি সে বিপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয় তবে আর দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিবে। এই প্রকারে যদি তাহাদিগকে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস দিতে পারি, তবে ইহার মধ্যে আমি সকল রাজাকে বশীভূত করিতে পারিব, এবং উত্তর কালে পাণ্ডবেরা প্রবল হইতে পারিবে না। অন্ধরাজ বিবেচনা

করিলেন এ পরামর্শ মন্দ নহে, অতএব তখনি পাণ্ডব-গণকে প্রত্যানয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন।

যুধিষ্ঠির তখনও ইন্দ্রপ্রস্থে যাইতে পারেন নাই, পথিমধ্যে পিতৃব্যের আজ্ঞা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃগণ ও ভার্য্যা সমভিব্যাহারে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় প্রত্যাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জেষ্ঠ্যতাত আমাদিগকে কি জন্য পুনর্ব্বার ডাকাইলেন। দুঃশাসন কহিল, রাজা আজ্ঞা করিতেছেন তোমাকে পুনর্ব্বার পাশা খেলিতে হইবে, আর এই প্রতিজ্ঞায় খেলা হইবে, যে ব্যক্তি পরাস্ত হইবেন তিনি দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিবেন, এবং অজ্ঞাত বাসের মধ্যে যদি বিপক্ষের দৃষ্টিগোচর হন তবে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর অরণ্য-বাস করিতে হইবে। যুধিষ্ঠির দেখিলেন ইহা তাহার রাজ্য লইবার আর এক মন্ত্রণা মাত্র। কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এরূপ ছিল যে, যুদ্ধ বা পাশা খেলায় কেহ আহ্বান করিলে তাহাতে ভয় করিবে না, ভয় করিলে কাপুরুষতা প্রকাশ হয়। ইহা চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার দ্যূত-ক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বমত পরাজিত হইলেন।

তখন পঞ্চ ভ্রাতা অন্য উপায়াভাবে প্রতিজ্ঞানু-সারে রাজ্য ও বস্ত্রালঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া যোগীর বেশ ধারণ করিলেন। পতিপরায়ণা দ্রুপদ-নন্দিনীও

পতি সঙ্গে বনযাত্রায প্রস্তুত হইলেন। তদ্দৃষ্টে দুর্য্যো- ধনের পারিষদগণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল তুমি কোন্ দুঃখে বন গমন করিবে, এই পৃথিবীতে কেহ কাহার নহে, তুমি কেন বনেবনে ভ্রমণ করিবে, দুর্য্যো- ধনের শত সহোদর মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে গ্রহণ করিয়া সুখে কালক্ষেপণ কর। পাণ্ডবপ্রিয়া কোন উত্তর করিলেন না। ভীম ও অর্জ্জুন বলিলেন আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমাদিগকে সবংশে নিপাত করিব। ইহা বলিয়া তাঁহারা বনযাত্রা করিলেন।

কুন্তী এই বৃত্তান্ত শুনিয়া শোকসাগরে মগ্না হইলেন, এবং পঞ্চ পুত্রকে বিশেষতঃ দ্রৌপদীকে বন গমন করিতে নানা প্রকার নিষেধ করিলেন। কিন্তু পতি- ব্রতা সতী তাহা না শুনিয়া, পতিসেবা সকল কর্ম্মের সার জানিয়া অঙ্গাভরণ ত্যাগ করিয়া তপস্বিনী-বেশে পতিদিগের পশ্চাদ্গামিনী হইলেন। তাঁহার পঞ্চ পুত্র ও কুন্তী বিদুরের গৃহে রহিলেন।

পাণ্ডবগণের এইরূপ বনযাত্রায় বৃদ্ধ, যুবা ও বালক তাবতেই ক্রন্দন করিতে লাগিল। এবং রাজসভাসদ ও সৎকুলোদ্ভব প্রজাগণ স্বীয় স্বীয় আবাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্গামী হইলেন। এবং যে সকল তপস্বী ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ধর্ম্ম-রাজ্যে সুখে কালযাপন করিতেছিলেন, তাঁহারা কুরুগণের অধর্ম্মা-

চরণ দেখিয়া পাণ্ডবগণের অনুগামী হইলেন। তাবৎ রাজ্যে এই কলরব উঠিল যে, যে রাজ্যে দুর্য্যোধন রাজা ও শকুনি মন্ত্রী এবং ধর্ম্মের দুর্গতি ও সতীর অপমান, সে রাজ্যে কেহ বাস করিব না। এই বলিয়া প্রজাগণ গৃহাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিল, তাহাতে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রজাশূন্য হইল।

যুধিষ্ঠির ঐ সকল লোককে এই বলিয়া বুঝাইলেন যে তোমরা আমাদের সঙ্গে কোথায় যাইবে, আমরা শীঘ্র প্রত্যাগত হইব, তোমরা গৃহে গমন কর। কেহ কেহ এই কথায় ফিরিয়া গেল, কিন্তু দাস, দাসী, সভাসদ ও ব্রাহ্মণেরা ফিরিলেন না, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

পঞ্চ পাণ্ডব পদব্রজে গমন করিতেছিলেন, এবং দ্রৌপদীও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মিত্রগণ তাঁহাদিগকে রথারোহণে গমনের বিধি দিলেন, তাহাতে তাঁহারা রথারোহণ-পূর্ব্বক প্রয়াগ যাত্রা করিলেন। সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও দাস দাসীগণ পদব্রজে চলিলেন।

দ্রুপদনন্দিনী ইন্দ্রের তুল্য রাজার মহিষী ছিলেন, এক্ষণে বনবাসিনী হইলেন, ইহাতে তাঁহার অবশ্যই কায়িক ক্লেশ হইল, কিন্তু তাহাও সুখকর জ্ঞান করিয়া নিরন্তর পতি-সেবায় নিযুক্ত থাকিলেন। এই বিপদ-

কালেও তিনি সঙ্গী বিপ্র ও দাস দাসী ও আত্মীয়-গণকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করাইতেন। ব্যাসদেব লিখিয়াছেন রাজা যুধিষ্ঠির সূর্য্য আরাধনা করিয়া এই বর পাইয়াছিলেন যে, দ্রৌপদী যে পর্য্যন্ত আপনি আহার না করিবেন সে পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ অতিথি আসিলেও তাহাদিগকে ভোজন করাইতে পারিবেন। ইহা অবশ্যই উৎকট বর্ণন বলিতে হইবে। ফলতঃ তাঁহার এই নিয়ম ছিল ভীম ও অর্জ্জুন ভিক্ষা বা মৃগয়া করিয়া তণ্ডুল ও মাংসাদি আনয়ন করিতেন, তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণ ও পঞ্চস্বামী ও দাস দাসী এবং যে অতিথি উপস্থিত হইত তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন, সকলের ভোজন হইলে তিনি দশ দণ্ড রাত্রির সময় আপনি ভোজন করিতেন।

এই ভাবে পঞ্চ ভ্রাতা ও দ্রৌপদী প্রয়াগে উপনীত হইলে, পঞ্চালেশ্বর প্রভৃতি তাঁহাদের অনেক সুহৃদ রাজগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে গৃহে পুনর্গমনার্থ অনেক যত্ন করিলেন। কিন্তু সত্য পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির তাহা করিলেন না। তৎপরে তাঁহারা কাম্য বনে গিয়া কিছুকাল বাস করিলেন।

মুনিগণ তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সান্ত্বনা করিতেন, এবং সাহস ও সহিষ্ণুতার নানাপ্রকার উদাহরণ শুনাই-তেন। এক দিন দ্রৌপদী রাজা যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত

ক্লেশ দেখিয়া বলিলেন প্রভো, আমি তোমার এমত দুঃখ আর দেখিতে পারি না, তোমার যন্ত্রণা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তুমি রাজরাজেশ্বর, কত রাজা তোমার পদানত ছিল। অপূর্ব্ব শয্যাতে শয়ন করিয়াও তোমার নিদ্রা হইত না, তোমার অঙ্গে কস্তূরী চন্দন লেপিত হইত, এইক্ষণে তুমি তৃণ শয্যা করিয়াছ এবং ধূলায় ধূসর হইতেছ। লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণকে তুমি স্বর্ণপাত্রে ভোজন করাইয়াছ, এক্ষণে তুমি আপনি ফল মূলাহারে প্রাণ ধারণ করিতেছ। ইহাতেও কি তোমার মনোমধ্যে কিছু মাত্র ক্রোধোদয় হয় না। তোমার চারি ভ্রাতা চারি মহাবীর, বিশেষতঃ ভীম অর্জ্জুন এমন বীর পুরুষ, মনে করিলে নিমিষের মধ্যে তাবৎশত্রু বিনাশ করিতে পারেন। তাঁহারা তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয়ে ঊর্দ্ধমুখ করিতে না পারিয়া সতত ম্লান বদনে অধোমুখে থাকেন, ইহা তুমি কিরূপে দেখ। আমি দ্রুপদ রাজার কন্যা, এইমত ক্লেশে বনে বনে ভ্রমণ করি, ইহা দেখিয়া তোমার কিছুমাত্র দয়া হয় না। হে মহারাজ, তোমার শরীরে কিছুমাত্র ক্রোধ নাই, এমন নিস্তেজ শরীর ক্ষত্রিয়ের যোগ্য নহে। অত্যন্ত ক্ষমাগুণ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের বিপরীত। শাস্ত্রে লিখিয়াছে নিস্তেজ মনুষ্য দাস দাসীরও হেয় হয়, ভার্য্যাও তাহাকে মান্য করে না।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, প্রিয়ে, ক্রোধের তুল্য পাপ আর পৃথিবীতে নাই, ক্রোধে লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না, ক্রোধে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় এবং ক্রোধে বিষপান ও জলমগ্ন প্রভৃতি যে দ্রোহকর্ম্ম তাহাতেও প্রবৃত্ত করায়। হে প্রিয়তমে, তুমি ধৈর্য্য ধর, সময়ে সকল পাইবে, পরমেশ্বর সকল দেখিতেছেন, কাল পূর্ণ হইলে দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকল পাপিষ্ঠই শাস্তি পাইবে। দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রভো, পরমেশ্বরের এ কেমন বিচার, তুমি এমন ধার্ম্মিক হইয়া, দস্যু যে বনকে ভয় করে সেই বনে বাস করিতে আসিলে, এবং ফল মূল আহার ও তৃণশয্যা সার হইল। আর দুর্য্যোধন মহা পাপিষ্ঠ হইয়াও রাজ্যেশ্বর হইল। যুধিষ্ঠির বলিলেন ধর্ম্মনিন্দা অতি অধর্ম্ম, তাহা কদাচ করিও না। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কোন কর্ম্ম করে, ঐ সকল লোককে লোভী বলা যায়। লোভ জন্মিলে অনেক পাপ জন্মে। কিন্তু আমি যে ধর্ম্ম কর্ম্ম করি কখন তাহার গর্ব্ব করিনা, কেননা তাহাতে ঈশ্বরের নিন্দা হয়। কিন্তু আমি কি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছি, আমাদের যাহা উচিত তাহাই করিতেছি, মাত্র।

ভীম এই কথায় ক্রোধযুক্ত হইয়া বলিলেন তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্মের কি করিতেছ। ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম আপন ভুজবলে তাবৎ পৃথিবী জয় করিবে। তুমি

আপন রাজ্য ত্যাগ করিয়া পরের রাজ্যে আসিয়াছ, এই কি তোমার ধর্ম্ম। দুর্য্যোধন তোমাকে কপট-পাশায় হারাইল, সেই জন্য কি তোমার আপন রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে আসা উচিত ছিল। হে ধর্ম্মরাজ, আমি জীবিত থাকিতে তোমার বিত্তাদি অন্যে হরণ করে ইহা কি আমার প্রাণে সহ্য হয়। সিংহের মুখ হইতে শৃগাল কি কখন ভক্ষ্য বস্তু কাড়িয়া লইতে পারে। আমি একাই পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনকে সবংশে বিনাশ করিতে পারিতাম, কেবল তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয়ে করি নাই। তুমি নিতান্ত বীর্য্যহীনের ন্যায় বনে আসিয়াছ। হে ধর্ম্মরাজ, তোমার শরীরে কি কিছুমাত্র ক্রোধ নাই। দুর্য্যোধন মহা পাপিষ্ঠ, তাহাকে বধ করিলে কিসের অধর্ম্ম।

যুধিষ্ঠির বলিলেন আমার জন্য তোমাদের এই সব ক্লেশ হইয়াছে, ইহা যথার্থ, কিন্তু ক্রোধের তুল্য শত্রু পৃথিবীতে আর নাই। তুমি দেখ, আমি যখন শকুনির সঙ্গে পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন যত হারিয়াছিলাম ততই ক্রোধবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতেই তাবৎ রাজ্য গিয়াছে। অতএব ক্রোধ অতি কদর্য্য, এবং বিনাশের মূল। আর দেখ, যখন দ্বিতীয়বার অক্ষক্রীডাতে প্রবৃত্ত হইলাম তখন দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস স্বীকার করিয়া-

ছিলাম। অতএব এখন সে প্রতিজ্ঞা কিরূপে উল্লঙ্ঘন করিব, তাহা করিলে লোকে কি কহিবে। হে পরম প্রিয়তমগণ, সে অখ্যাতি আমার প্রাণে কখন সহ্য হইবে না। আমি প্রাণ ত্যাগ অনায়াসে করিতে পারিব, কিন্তু সত্য লঙ্ঘন করিতে পারিব না। সত্য লঙ্ঘন অতি কুকর্ম্ম। রাজ্য, ধন, পুত্র, সত্যের শতাংশের এক অংশও নহে। যে পুরুষের বাক্য সত্য নহে তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না, পর কালে তাহার অত্যন্ত দুঃখ হয়। অতএব ভ্রাতৃগণ, স্থির হও, সত্যাচার করিলে ভবিষ্যতে সকল দুঃখ দূর হইবে।

ভীম বলিলেন যাহারা চিরজীবী তাহারা এই প্রকার কথা বলিতে পারে, আমরা অল্পায়ুঃ মনুষ্য, আমাদের দেহ জলবিম্বের ন্যায়, কখন আছে কখন নাই, অতএব তাহাতে অসম্ভব আশা কিরূপে হইতে পারে। আর দেখ, এক এক দিবস এক এক বৎসরের ন্যায় বোধ হইতেছে, এমন বার বৎসর কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তাহার পর এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে, ঐ অজ্ঞাত বৎসর কোথায় বাস করিবে। তোমার ভ্রাতৃগণ জগদ্বিখ্যাত, তাহাদিগকে কোথায় লুকাইয়া রাখিবে। তুমি কি ইহা ভাবিয়াছ যে সূর্য্যকে হস্ত দিয়া আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। তুমি বুঝিয়া দেখ ঐ অজ্ঞাত বাসের মধ্যে যদি বিপক্ষেরা আমা-

দিগকে দেখে, তবে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর বনপ্রবাস করিতে হইবে। যদিই ঐ বৎসর নির্ব্বিঘ্নে যায় তথাপি তুমি কি এমন মনে কর, দুর্য্যোধন আমাদিগকে সহজে রাজ্য দিবে। তখন তাহাদের-বল বিক্রম অধিক হইবে, আমরা কিছু করিতে পারিব না। অতএব আমি এক পরামর্শ কহি, তাহা কর। সোমপুত্রী মতে মুনিগণ এক মাসকে এক বৎসর ধরিয়া থাকেন, আমরা ত্রয়োদশ মাস বনবাস করিয়াছি। এই মতানুসারে আমাদের ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস করা হইয়াছে। এক্ষণে শত্রু বিনাশের চেষ্টা করিলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয় নাই। যুধিষ্ঠির এই কথায় স্তব্ধ হইয়া, কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, এমন কপট গণনা, করিয়া মেরুতুল্য যে ধর্ম্ম তাহাকে তৃণবৎ নষ্ট করা, উচিত নহে, তোমরা কিছুকাল স্থির হও, তাহার পর সকল পাইবে।

এইরূপে ভার্য্যা ও ভ্রাতৃগণকে জ্ঞানবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া যুধিষ্ঠির অবিচলিত চিত্তে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কিছু দিন গত হইলে তাঁহারা দ্বৈতবনে গমন করিলেন। মুনিগণ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ঐ অরণ্য অতি মনোহর এবং তথায় অনেক মুনি ঋষি বাস করিতেন। ঐ স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া অর্জ্জুন হিমালয় পর্ব্বতে শিবারাধনায় যাত্রা করিয়া

তথায় অস্ত্রশিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পাণ্ডবগণ মুনিগণ সমভিব্যাহারে নৈষধ তীর্থে যাত্রা করিলেন। ঐ তীর্থে কিছুকাল বাস করিয়া তাঁহারা বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। এই স্থানে বনবাসের চতুর্থ বৎসর গত হইল। তদনন্তর মুনিগণের পরামর্শানুসারে কাম্য বনে যাত্রা করিয়া, প্রভাস তীর্থে বাস করিলেন। তাঁহারা ঐ তীর্থ স্থানে কিছুকাল বাস করিলে, অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষা করণানন্তর হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্তম উত্তম যুদ্ধাস্ত্র লইয়া তথায় প্রত্যাগত হইলেন। তাহার পর পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী ঐ কাম্যবনেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে কিছু কাল অতীত হইলে, দুর্য্যোধন আত্মীয় বন্ধু ও স্বপরিবারস্থ নারীগণ সমভিব্যাহারে বহু সমারোহ পূর্ব্বক কাম্য বনে প্রভাস তীর্থে আগমন করিলেন, তাঁহার মাতঙ্গ তুরঙ্গ ও চতুরঙ্গ সেনা তাবৎ অরণ্য আচ্ছন্ন করিল। দুর্য্যোধন ঐ সমারোহে পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। পাণ্ডবেরা দেখিলেন তাঁহাদের রাজ্য ও অর্থ লইয়া দুর্য্যোধনের সুখোৎপত্তির সীমা নাই। যাহাহউক, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন, এবং বাক্য বা কর্ম্ম দ্বারা এমন প্রকাশ হইল না, যে তাঁহার প্রতি তিনি কোন প্রকারে অসন্তুষ্ট আছেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন তীর্থক্রিয়া ও অনেক দান ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার কতক গুলি সেনা চিত্ররথ-নামক এক গন্ধর্ব্বরাজের পুষ্পোদ্যান ভঙ্গ করিল। তাহাতে উদ্যানরক্ষক দুর্য্যোধনের স্থানে প্রতীকার প্রার্থনা করিল। দুর্য্যোধন কোন প্রতীকার না করিয়া, চিত্ররথের লোকদিগের অপমান করিলেন। চিত্ররথ এই সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে আসিয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ঐ যুদ্ধে দুর্য্যোধনের অনেক সেনা ও অশ্ব গজ নষ্ট হইল, এবং কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতি মহাবল সেনাপতিগণ রণস্থলী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। অবশেষে চিত্ররথ, দুর্য্যোধন ও তাহার পরিবারস্থ তাবৎ নারীগণকে বন্ধন করিয়া জয়োল্লাসে লইয়া চলিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির এই সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভীম ও অর্জ্জুন দুই ভ্রাতাকে বলিলেন চিত্ররথ দুর্য্যোধনকে এই প্রকারে লইয়া গেলে আমাদের বংশের কলঙ্ক, অতএব তোমরা উভয়ে যাইয়া তাঁহাকে চিত্ররথের হস্তহইতে উদ্ধার করিয়া আন। ভীম ও অর্জ্জুন এই আজ্ঞায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন কি, যে দুর্য্যোধন হইতে আমাদের এই দুর্গতি, তাহার উদ্ধারার্থ আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা কর। ঐ পাপিষ্ঠ যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে এখন তাহার ফল ফলিয়াছে, চিত্ররথ

আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। অতএব দুর্য্যোধনের সহায়তা করা কখন কর্ত্তব্য নহে, চল এক্ষণে আমরা গৃহে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্য করি। ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির বলিলেন, দুর্য্যোধন আমাদিগের পরম শত্রু, সে কথা মিথ্যা নহে, কিন্তু যদি চিত্ররথ তাহাকে সপরিবারে এই অবস্থায় লইয়া যায়, তবে আমাদের বংশের অখ্যাতি হইবে, এবং সকলে কহিবে পাণ্ডবেরা থাকিতে তাহাদের এই দুর্দ্দশা হইল। অতএব এইক্ষণে তাহাকে মুক্ত করা উচিত, পরে তাহার সহিত যখন আমাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইবে তখন তদুপযুক্ত বিধান করা যাইবে।

এই বাক্যে ভীম ও অর্জ্জুন নিরুত্তর হইয়া, চিত্ররথের সহিত সংগ্রাম করিয়া দুর্য্যোধন ও তাহার তাবৎ পরিবারগণকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। দুর্য্যোধন দেখিলেন তাঁহার অতি আত্মীয় সুহৃদগণ তাঁহাকে বিপদ কালে ফেলিয়া গেলেন, কিন্তু যাঁহাকে শত্রু জ্ঞান করিয়াছিলেন তাঁহারা পরম বন্ধুর কার্য্য করিলেন। ইহাতে মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইলেন। তিনি আরো দেখিলেন যে পাণ্ডবেরা অতি বীর পুরুষ, দুই ভ্রাতায় গন্ধর্ব্বের তাবৎ সেনা লণ্ড ভণ্ড করিলেন। কিন্তু ঐ অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ, তাঁহাদের বীরত্বের প্রশংসা বা তাঁহাদের স্থানে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া, মনে

মনে ভাবিল ইহাদের বনবাসের আর অধিক কাল নাই, তাহার পর ইহারা আমার কালস্বরূপ হইয়া আসিবে, তখন আমার কি গতি হইবে, অতএব ইহাদিগকে এই সময়ে নিপাত করা আবশ্যক। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, বন্ধু বান্ধব ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনায় প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে দুর্ব্বাসা মুনি সশিষ্যে হস্তিনা নগরে উপনীত হইলেন। দুর্য্যোধন মুনির উগ্র স্বভাব জানিয়া তাঁহার ও তৎশিষ্যগণের যথোচিত সম্মান করিলেন। মুনিবর দুর্য্যোধনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার অনেক প্রশংসা করিলেন, এবং তাহাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন। তৎপরে তিনি কিছুকাল ঐ স্থানে অবস্থিতি করিলেন। দুর্য্যোধন মনে করিলেন পাণ্ডবদিগের বিনাশ জন্য এত চেষ্টা করিলাম সকল মিথ্যা হইল। লক্ষ্মীরূপা দ্রৌপদীই ইহার মূল হইয়াছেন, কেননা তিনি সূর্য্যের বরপ্রভাবে আপনি যে-পর্য্যন্ত আহার না করেন সে পর্য্যন্ত লক্ষ অতিথি আসিলেও তাহাদিগকে অনায়াসে অন্ন দান করিতে পারেন। কিন্তু শুনিয়াছি, আহারান্তে এক প্রাণিকেও ভোজন করাইতে পারেন না। অতএব সতত ক্রোধাবিষ্ট এই দুর্ব্বাসা মুনি, যদি কোন দিবস অধিক রাত্রে সশিষ্যে পাণ্ডবগৃহে অতিথি হন, তবে তাহারা

ইহাঁর অভিসম্পাতে ভস্মসাৎ হইতে পারে। দুর্য্যোধন মনে মনে এই কল্পনা করিয়া বন্ধু বান্ধবগণকে তাহা জানাইলেন। তাহারা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত প্রশংসা করিল।

অনন্তর যখন দুর্ব্বাসা মুনি বিদায় লন, তখন তিনি দুর্য্যোধনকে বলিলেন, আমি তোমার চরিত্রে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। দুর্যোধন বলিলেন আপনার কৃপাতে ধন ধান্য ও অশ্ব রথ অনেক আছে, আর কিছুরই প্রযোজন নাই, কিন্তু একটী বিষয় আমার জানিতে ইচ্ছা আছে, শুনিয়াছি দ্রৌপদী রন্ধন করিয়া যত ইচ্ছা তত লোককে অন্ন দান করিতে পারেন, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে এক দিবস দশ দণ্ড রাত্রির পর তথায় অতিথি হন, তবে তাঁহার অতিথিসেবার ক্ষমতার সুন্দর পরীক্ষা হইতে পারে। দুর্ব্বাসা বলিলেন তাহার বাধা কি, আমি সশিষ্যে অমুক দিবস পাণ্ডবগৃহে অতিথি হইব।

ইহা বলিয়া দুর্ব্বাসা, রাজা দুর্য্যোধনের স্থানে বিদায় হইয়া, দশ সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে কাম্যবনে, এক দিবস রাত্রি দশ দণ্ডের পর, যখন সকলে শয়নের উদ্‌যোগ করিতেছে তখন, পাণ্ডবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে পঞ্চ ভ্রাতা প্রথমতঃ অতি-

শয় ভীত হইলেন। কিন্তু পরমেশ্বরের কি কৃপা, সেই রজনীতে তাঁহাদের কাহারও আহার স্পৃহা হইল না। পর দিবস তাঁহারা ভোজনের এমন সুন্দর আয়োজন করাইলেন তাহাতে ক্রোধ বা অভিসম্পাত করা দূরে থাকুক তাঁহাদের প্রতি মুনিরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্টই হইলেন।

এই কল্পনা নিষ্ফল হইলে দুর্য্যোধন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বিশেষ, পঞ্চপাণ্ডবের বনবাসের কাল শেষ হইয়া আসিল, তাহার পর তাঁহারা আসিয়া রাজত্ব লইবেন, এই ভাবনা অতিশয় হইল। দুর্য্যোধনের বন্ধুগণ তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিল, আমরা এক এক জন এমন বীর, পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করিতে আসিলে তাহাদিগকে অনায়াসে সংহার করিব। কিন্তু দুর্য্যোধন জানিতেন, পাণ্ডবেরা এক এক জন ইন্দ্রের তুল্য যোদ্ধা, তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কখন জয়ী হইতে পারিব না। অতএব অনেক মন্ত্রণা করিয়া এই স্থির করিলেন যে দ্রৌপদীকে আনিয়া কোন স্থানে গোপনভাবে রাখা যাউক। দ্রৌপদী লক্ষ্মীরূপা, পাণ্ডবদিগের সুখের কারণ এবং তাহাদের পরম প্রেয়সী, তাহার শোকে তাহারা সকলে প্রাণত্যাগ করিবে।

এই মন্ত্রণা করিয়া তিনি স্বীয় ভগিনীপতি জয়দ্রথকে দ্রৌপদীহরণার্থ প্রেরণ করিলেন। জয়দ্রথ ঐ কর্ম্মে

অসম্মত হইয়াও দুর্য্যোধনের অনুরোধে বেগগামী অশ্বযুক্ত এক শকটে আরোহণ করিয়া কাম্যবনে গমন করিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া, পাণ্ডবেরা কখন কি করেন গোপন ভাবে তাহার অনুসন্ধান লইয়া, এক দিবস, যখন ভীমার্জ্জুন মৃগয়ার্থে বনে এবং যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব ও মুনিগণ সরোবরে স্নানার্থে গমন করিয়াছেন, সেই সময়ে রথারোহণে দ্রৌপদীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন। দ্রৌপদী তৎকালে রন্ধন করিতেছিলেন। জয়দ্রথকে দেখিয়া মহা আনন্দিতা হইয়া পাদ্য অর্ঘ্য ও বসিবার আসন দিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। জয়দ্রথ কুশলাদি কহিয়া দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কোথায়। পাণ্ডবপ্রিয়া বলিলেন, তাঁহারা কেহ মৃগয়ার্থ কেহ স্নানার্থ গিয়াছেন, কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা কর, সকলে আসিবেন। জয়দ্রথ ভাবিলেন পাণ্ডবেরা আসিলে কর্ম্ম পণ্ড হইবে, অতএব বিলম্ব না করিয়া দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক আপন রথে উত্তোলনপুরঃসর অতিবেগে রথ চালাইয়া দিলেন। দ্রৌপদী জয়দ্রথের এই কর্ম্ম দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া দ্রুত গমন করিলেন।

ঐ সময়ে ভীম ও অর্জ্জুন বনে মৃগয়া করিতেছিলেন, হঠাৎ দ্রৌপদীর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ

পূর্ব্বক দেখিলেন একখান রথ দ্রুতবেগে যাইতেছে এবং তাহার মধ্য হইতে ঐ ক্রন্দনধ্বনি আসিতেছে। ইহা দেখিয়া দুই ভ্রাতা তখনি ঐ রথের পশ্চাদ্‌গামী হইলেন এবং মুহূর্ত্তেকের মধ্যে ঐ রথ ধারণ করিয়া জয়দ্রথকে রথহইতে নামাইয়া তাহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক দুই জনে মুষ্ট্যাঘাত ও পদাঘাত করিতে লাগিলেন এবং তাহার প্রাণবধের উপক্রম করিলেন। এমন সময়ে যুধিষ্ঠির স্নান করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গৃহ শূন্য দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বনমধ্যে দ্রৌপদীর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন, পরে ভীম অর্জ্জুনকে জয়দ্রথবধে উদ্যত দেখিয়া তাহাদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক বলিলেন ইহার উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে, অতএব প্রাণ বধ করিও না, তাহা হইলে আমাদের ভগিনী বিধবা হইবেন এবং ভাগিনেয়গণ দুঃখ পাইবেন, ইহা বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। দুর্য্যোধন তাহার এই দুর্গতির কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

পাণ্ডবেরা সেই বনে বাস করিতে লাগিলেন। এই প্রকার দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে কাল ক্ষেপণ হইল। ত্রয়োদশ বৎসর আরম্ভের কয়েক দিবস পূর্ব্বে, তাঁহারা সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ ও দাস দাসী গণকে বিদায় দিয়া, গোপনে এই স্থির করিলেন যে মৎস্যদেশ দুর্য্যো-ধনেরঅধীন নহে, অতএব সেই দেশে কোন প্রকারে ছদ্ম-

বেশে এক বৎসর বাস করিব। ইহা স্থির করিয়া ধৌম্যপুরোহিত সমভিব্যাহারে যমুনা নদী পার হইয়া বামে ত্রিগর্ত্ত ও দক্ষিণে পঞ্চাল রাজ্য করিয়া, মৎস্য দেশে বিরাটরাজ্যে যাত্রা করিলেন। অনন্তর যে দিবস বিরাট-রাজের অধিকারে উপনীত হইলেন সেই দিবস দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইল। বিরাটরাজ্যে উপস্থিত হইলে ধৌম্য পুরোহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পঞ্চ ভ্রাতা পদব্রজে চলিলেন।

দ্রৌপদী কখন পথ চলেন নাই, পথশ্রমে অত্যন্ত কাতরা হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, নগর কত দূর আছে, আমি আর চলিতে পারি না, অতএব আজি এই খানে রজনী বঞ্চন কর, কল্য প্রাতে নগরে গমন করা যাইবে। যুধিষ্ঠির বলিলেন সর্ব্বনাশ, অদ্য নিশা প্রভাত হইলে কল্য অজ্ঞাত বৎসর আরম্ভ হইবে, যদি শত্রুপক্ষীয় কোন লোক কল্য আমাদিগকে এখানে দেখিতে পায় তবে মহা প্রমাদ হইবে। ইহা বলিয়া তিনি অর্জ্জুনকে বলিলেন অদ্য রাত্রেই বিরাট নগরে যাইতে হইবে, অতএব তুমি দ্রৌপদীকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া চল। অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় চলৎশক্তি রহিতা দ্রৌপদীকে স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। নগরের কিয়দ্দূর আসিয়া সে রাত্রি সেইখানে বঞ্চন করিলেন। পর দিবস, তাঁহাদের সঙ্গে যে অস্ত্রাদি

ছিল তাহা সঙ্গে লইয়া যাওয়া অপরামর্শ বিবেচনায় অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় তৎসমুদায় শবাকৃতি করিয়া বসনে বন্ধন পূর্ব্বক, এক শিংশপা বৃক্ষের উচ্চ শাখায় ঝুলাইয়া রাখিলেন। তৎপরে পঞ্চ ভ্রাতা একে একে বিরাট রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া, এইরূপ পরিচয় দিলেন—যুধিষ্ঠির কহিলেন আমার নাম কঙ্ক, আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রী ছিলাম। ভীম কহিলেন আমি বল্লভ নামে তাঁহার সূপকার ছিলাম। অর্জ্জুন কহিলেন আমি নপুংসক, নাম বৃহন্নলা, তাঁহার অন্তঃপুরস্থ নারীগণের নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষা করাইতাম। নকুল কহিলেন আমার নাম দামগ্রন্থি, আমি তাঁহার অশ্ববৈদ্য ছিলাম। সহদেব কহিলেন আমি তন্ত্রিপাল নামে তাঁহার গোরক্ষক ছিলাম। পরে যুধিষ্ঠিরের বন-গমনে পদ-ভ্রষ্ট হইয়া কর্ম্মাকাঙ্ক্ষায় দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে করিতে মহারাজের আশ্রয়ে আসিয়াছি। বিরাটরাজা তাহাই সত্য জ্ঞান করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে মন্ত্রী, ভীমকে সূপকার, অর্জ্জুনকে কন্যাগণের নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষক, নকুলকে অশ্ববৈদ্য এবং সহদেবকে গোরক্ষক রূপে নিযুক্ত করিলেন।

তদনন্তর দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী বেশে নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিরাট রাজার মহিষী সুদেষ্ণা ঐ সময় অট্টালিকায় ছিলেন। তিনি দ্রৌপদীর আ-

শ্চর্য্য রূপলাবণ্যাবলোকনে পরিচারিণীদিগকে তাহাকে বাটীর মধ্যে আনিতে আজ্ঞা করিলেন। দাসীগণ তাঁহাকে রাণীর নিকটে লইয়া আসিলে সুদেষ্ণা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্রৌপদী উত্তর করিলেন আমি সৈরিন্ধ্রী, পূর্ব্বে পাণ্ডবগৃহে ছিলাম। পাণ্ডব-মহিষী আমাকে বিস্তর অনুগ্রহ করিতেন। পরে তিনি পাণ্ডবগণ সহিত গহন কাননে গমন করিলে, আমি আশ্রয়শূন্য হইয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেছি। যদি আপনার প্রয়োজন হয় আমাকে রাখুন, আমি সকল কর্ম্ম করিব, কেবল উচ্ছিষ্ট স্পর্শ ও চরণ সেবা করিব না। সুদেষ্ণা কহিলেন তোমাকে রাখা আমার নিতান্ত বাঞ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হইলে আমার আপনার দ্বারে কন্টক রোপণ করা হইবে। দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করিলেন সে কেমন। বিরাটপ্রিয়া কহিলেন যদি তোমাকে আপন ভবনে রাখি তবে রাজা তোমার অপরূপ রূপ দর্শনে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই রাজরাণী করিবেন। দ্রৌপদী তটস্থ হইয়া কহিলেন হে রাজমহিষি, আমি পর পুরুষের মুখাবলোকন করি না, অতএব সে জন্য চিন্তা কি। ইহা শুনিয়া সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে অন্তঃপুরে স্থান দান করিলেন এবং তাঁহার শীল ও সচ্চরিত্র দেখিয়া দিন দিন তাঁহাকে অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ বিরাট রাজার গৃহে একাদশ মাস গত হইল। পরে কীচক নামে বিরাট রাজার শ্যালক, এক দিবস দ্রৌপদীর মনোহর রূপে মোহিত হইয়া, খল রিপুর প্রাবল্য-প্রযুক্ত তাঁহার প্রতি প্রতিকূল অভিলাষ করিল, এবং তাঁহাকে কুপথগামিনী করিবার জন্য নানা প্রকার প্রলোভ দিতে লাগিল। পতিব্রতা সতী তাহা তাচ্ছল্য করিলেন। ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া নরাধম কীচক স্বীয় ভগিনী সুদেষ্ণাকে, আপন কুকর্ম্মের উত্তর-সাধক করিল। সুদেষ্ণা সহোদরকে কুপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কীচক তাহা না শুনিয়া সহোদরার পদানত হইয়া বলিল তুমি যদি আমার প্রাণ রক্ষার উপায় না কর তবে আমি তোমার সম্মুখে আত্মহত্যা করিব। রাণী কি করেন ভ্রাতৃ-বধের ভয়ে তাহাকে কহিলেন, আমি কোন কৌশলে সৈরিন্ধ্রীকে তোমার নিকট প্রেরণ করিব। ইহা শুনিয়া কীচক পরমানন্দিত হইল। পরে রাজমহিষী, সৈরিন্ধ্রীকে কীচকের গৃহ হইতে কোন দ্রব্য আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। দ্রৌপদী কীচকের আচরণ জানিয়া তাহাতে অসম্মতা হইলেন, কিন্তু রাণী তাঁহার আপত্তি শ্রবণ করিলেন না, সুতরাং দ্রৌপদীকে যাইতে হইল।

দ্রৌপদী গৃহে আসিলে কীচক গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক

তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল, অদ্য আমার সুপ্রভাত। দ্রৌপদী কীচককে সেইরূপ দেখিয়া, সমীরণে কদলীপত্র যেমন প্রকম্পিত হয় সেই প্রকার হইলেন। পাপাত্মা তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তখন দ্রৌপদী ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় রাজসভায় দৌড়িয়া আসিলেন। কীচক বড় আশায় নিরাশ হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক পদাঘাত করিল। দ্রৌপদী এই প্রকার অপমানিতা হইয়া, রোদন করিতে করিতে রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া বিচারের প্রার্থনা করিলেন। রাজা কীচকের অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন, কেন না তাহার বাহুবলে তাঁহার রাজ্যবৃদ্ধি হইয়াছিল, অতএব তাহাকে কিছু না বলিয়া, দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ভীম ঐ সময়ে রাজসভায় ছিলেন, স্বচক্ষে দ্রৌপদীর অপমান দেখিয়া, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইল। কিন্তু কঙ্কবেশী রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, যাহা হইয়াছে তাহা ভাবিয়া ফল নাই, তুমি অন্তঃপুরে গমন কর। ইহা শুনিয়া দ্রৌপদী রোদন করিতে করিতে নয়ননীরে আর্দ্র হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সুদেষ্ণা লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর দ্রৌপদী অবগাহন করিলেন এবং পর-

পুরুষ স্পর্শ দোষ বিমোচন জন্য যে ক্রিয়াদি আবশ্যক তাহা করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মনের দুঃখ দূর হইল না, ভবিষ্যতে কীচক আরো কি অপমান করে ইহা ভাবিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধ-রাত্র সময়ে সকল পুরজন নিদ্রিত হইলে, তিনি ধীরে ধীরে বন্ধনশালায় যাইয়া ভীমের নিকট উপস্থিত হইয়া, সজলনয়নে ক্রন্দন করিতে করিতে, তাঁহাকে আপনার সমুদায় দুঃখের কথা জানাইয়া, বলিলেন তুমি যদি আমার প্রতি কৃপা না কর তবে আমার পরিত্রাণের আর উপায় নাই। ভীম তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, অদ্যই আমি সভামধ্যে কীচককে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া ছিলাম, কেবল ধর্ম্মরাজের আজ্ঞায় তাহা করিতে পারি নাই, কিন্তু সে জন্য চিন্তা করিও না। আমাদের অজ্ঞাত বাসের আর কএক দিবস মাত্র আছে, এই কয়েক দিবস তুমি কোন প্রকারে যাপন কর, তাহার পর ইহার প্রতিকার হইবে। দ্রৌপদী বলিলেন রজনী প্রভাতা হইলে সেই নরাধম আমাকে দেখিয়া হাস্য ও ব্যঙ্গ করিবে, ইহা আমার প্রাণে কখন সহ্য হইবে না, অতএব অদ্য নিশিতে তুমি ইহার কোন প্রতিকার কর, নতুবা তোমার সম্মুখে আমি প্রাণ ত্যাগ করিব। ভীম কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন তবে ইহার এক উপায় আছে, কল্য প্রাতে যখন কীচ-

কের সহিত সাক্ষাৎ হইবে তখন তুমি তাহাকে এই কথা বলিও যে, "সন্ধ্যার পর নৃত্যশালায় নির্জ্জনে তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে।" আমি তোমার বেশে তথায় গিয়া, যাহা কর্ত্তব্য করিব। ইহা শুনিয়া দ্রৌপদী প্রস্থান করিলেন।

পর দিবস দ্রৌপদী কীচককে গোপনে কহিলেন আমি আজি রজনীযোগে নাট্যশালায় থাকিব, তুমি সেইখানে আমার সাক্ষাৎ পাইবে। কীচক এই কথা শুনিয়া পুলকে পূরিত হইল। অনন্তর ভীম, রজনী-যোগে নারীবেশে ঐ নৃত্যশালায় গিয়া, কীচকের শয্যাতে বসিয়া থাকিলেন। কীচক কিয়ৎকাল পরে ঐ নাট্যশালায় প্রবেশ করিল, এবং মদ-মত্ততা প্রযুক্ত এককালীন বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়া, ভীমকে দ্রৌপদী জ্ঞান করিয়া রসালাপ করিতে লাগিল। ভীম কহি-লেন হে প্রিয়বর! তুমি কল্য যে পদাঘাত করিয়া-ছিলে এখন পর্য্যন্ত আমি বেদনাতে কাতর আছি, এবং সেই জন্য আমার মনে কিছুমাত্র আনন্দ নাই। কীচক কহিল সেজন্য চিন্তা কি, আমি আপন মস্তক পাতিয়া দিলাম, তুমি ইহাতে পদাঘাত করিয়া মনের দুঃখ নিবারণ কর, ইহা বলিয়া আপন মস্তক পাতিল। ভীম মনে মনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া, বজ্রাঘাতের ন্যায় তাহার মস্তকে এক ভয়ঙ্কর পদাঘাত করিলেন। ঐ

পদাঘাতে কীচকের মুণ্ড ঝনঝনিয়া উঠিল, কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। ফলতঃ, সে তখন এমন মদোন্মত্ত ছিল যে, তিনি দ্রৌপদী নহেন ইহা তখনও তাহার বোধ হইল না, অতএব তাঁহাকে দ্রৌপদী জ্ঞান করিয়া রহস্যাদি করিতে লাগিল। ভীম কহিলেন অরে পাষণ্ড তুমি সৈরিন্ধ্রীর সতীত্ব বিনাশের বাঞ্ছা কর, তুমি জাননা তাঁহার রক্ষক কে। ইহা শুনিয়া কীচক চকিত হইল, এবং ভীমের সহিত ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিল। কীচক অত্যন্ত বলবান্ ছিল, এ জন্য ভীম তাহাকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিলেন না, সুতরাং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বাহুযুদ্ধ হইল। পরিশেষে ভীম প্রবল হইয়া তাহাকে বধ করিলেন। তদনন্তর রন্ধন-শালায় যাইয়া চুপেচুপে শয়ন করিয়া থাকিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে অন্তঃপুরস্থ রমণীগণ নৃত্যালয়ে কীচকের মৃতদেহ দেখিয়া, রাজা ও রাজ্ঞীকে তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। রাজা কীচকের মৃত্যুর কারণ কিছুই অনুমান করিতে পারিলেন না, কিন্তু সৈরিন্ধ্রীকে তন্মূলীভূত বিবেচনা করিয়া, কীচকের সহোদরগণকে আজ্ঞা করিলেন, কীচকের শবের সহিত সৈরিন্ধ্রীকে দাহন কর। এই আজ্ঞা পাইয়া কীচকের ৯৯ সহোদর, দ্রৌপদীকে আনয়ন করিয়া, কীচকের শবের সহিত দাহন

করিতে লইয়া চলিল। দ্রৌপদী এই অচিন্তনীয় ঘটনায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভীম দ্রৌপদীর ক্রন্দনে তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া, এক দীর্ঘ তরু উৎপাটন পূর্ব্বক, তদাঘাতে কীচকের ৯৯ ভ্রাতাকে একে একে বধ করিয়া দ্রৌপদীকে মুক্ত করিলেন, তৎপরে পুনর্ব্বার রন্ধন-শালায় গিয়া শয়ন করিয়া থাকিলেন।

কীচকের ভ্রাতৃগণ বিনষ্ট হইলে রাজপুরীর মধ্যে একটা বড় আতঙ্ক হইল। রাজা অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং দ্রৌপদীকে কালরূপিণী জ্ঞান করিয়া রাণীকে বলিলেন, তিনি বাটীতে থাকিলে আরো দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, অতএব তাঁহাকে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে বল। রাণী রাজাজ্ঞাক্রমে দ্রৌপদীকে বলিলেন তোমার জন্য আমার শত সহোদর নিধন প্রাপ্ত হইল এবং ইহার পর আরো কি অমঙ্গল ঘটিবে তাহা বলিতে পারি না, অতএব তুমি স্থানান্তরে গমন কর। দ্রৌপদী কহিলেন তোমার সহোদরগণ আপন আপন দোষে নষ্ট হইয়াছে ইহাতে আমার কিছু মাত্র অপরাধ নাই। আমি তোমার অনুগ্রহে এখানে অনেক দিবস যাপন করিলাম, আর এখানে অত্যল্প কাল বাস করিবার বাসনা করি, তাহার পর স্থানান্তরে গমন করিব। এ কালের মধ্যে তোমার আর কোন অনিষ্ট হইবে না, বরং আমার থাকাতে তোমার যথেষ্ট উপকার হইবে। ইহা শুনিয়া

রাণী তাঁহাকে আর কিছু বলিলেন না। দ্রৌপদী নির্ব্বিঘ্নে তথায় থাকিলেন।

যখন পাণ্ডবেরা এই রূপে বিরাট রাজার রাজ্যে অজ্ঞাত বাস করেন, তখন দুর্য্যোধন তাঁহাদের অনুসন্ধান জন্য চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল দূত নানা দেশ নদ নদী ও গিরিগুহা অন্বেষণ করিল, কুত্রাপি তাঁহাদের অনুসন্ধান পাইল না। ইতিমধ্যে দুর্য্যোধন কীচকের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। মহাবীর কীচক বিরাট রাজার সেনাপতি ছিলেন, তাহাতে দুর্য্যোধন ঐ দেশ জয় করিতে পারেন নাই। কীচকের অভাবে বিরাট রাজা স্বয়ং রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন না, তাহা অনায়াসে লইব, দুর্য্যোধন মনে মনে এই স্থির করিয়া, রণসজ্জা করিয়া মৎস্য দেশে গমন করিলেন এবং সুশর্ম্মা নৃপতিকে বিরাট রাজার দক্ষিণ গোগৃহ জয়ে নিযুক্ত করিয়া, আপনি ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি বীরগণকে লইয়া উত্তর খণ্ডে থাকিলেন। সুশর্ম্মা দক্ষিণ গোগৃহে আগমন করিলে, বিরাট রাজা আপন পুত্র উত্তরকে পুরী-রক্ষার্থে নিয়োজিত করিয়া, স্বয়ং তাহার সহিত সংগ্রামার্থ গমন করিলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাভূত হইলেন। তাহাতে সুশর্ম্মা তাঁহাকে স্বীয় রথোপরি উত্তোলন করিয়া লইয়া চলিলেন।

ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির অন্ন-দাতা বিরাটের এই দুরবস্থার

সংবাদ পাইয়া ছদ্মবেশী ভীমকে কহিলেন দেখ সুশর্ম্মা আমাদিগের আশ্রয়দাতাকে লইয়া যাইতেছে, আমরা থাকিতে তাঁহার এই প্রকার অপমান হওয়া উচিত হয় না, অতএব ইহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর। এই কথা শুনিবামাত্র ভীম, শত্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং পদাঘাতদ্বারা তাহার রথ চূর্ণ করিয়া সুশর্ম্মা ও বিরাট উভয়কে জ্যেষ্ঠের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। তখন বিরাট রাজা আপনাকে জয়যুক্ত জ্ঞান করিয়া কঙ্ককে কহিলেন শত্রু পরাভূত হইয়াছে এক্ষণে তাহাকে বধ করা উচিত কি না। কঙ্ক কহিলেন শত্রুর সম্মান রক্ষা করাই ভদ্রের উচিত, কেননা তাহা হইলে জয়ের মহিমা আরও বৃদ্ধি পায়, এবং তাহাতে শত্রু যাবজ্জীবন লজ্জিত থাকে। ইহা শুনিয়া বিরাট রাজা সুশর্ম্মাকে মুক্তি দান করিলেন।

যখন বিরাট রাজা দক্ষিণ গোগৃহে সুশর্ম্মার সহিত এই প্রকার সংগ্রামে প্রবৃত্ত, তখন দুর্য্যোধন সসৈন্যে তাঁহার উত্তরগোগৃহ হইতে গবী সকল হরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিরাট রাজার পুত্র উত্তর এই বার্ত্তা শ্রবণে অন্তঃপুরে স্ত্রীগণের নিকট আস্ফালন করিয়া বলিলেন, পিতা সকল সৈন্য লইয়া গিয়াছেন, এক জনও সারথি নাই যে তাহাকে লইয়া আমি যুদ্ধে যাত্রা করি, নতুবা এখনি শত্রুবিনাশ করিতাম। সৈরিন্ধ্রী এই বাক্য

শুনিয়া বৃহন্নলারূপ অর্জ্জুনকে সে কথা জানাইলেন। তাহাতে বৃহন্নলা সারথি হইয়া তৎক্ষণাৎ রথ প্রস্তুত করিলেন। উত্তর ঐ রথারোহণে রণে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যখন দূর হইতে অতি ভীষণ কুরুসৈন্য দর্শন করিলেন, তখন অত্যন্ত ভীত হইযা সারথিকে কহিলেন তুমি রথ ফিরাও, আমি যুদ্ধস্থলে গমন করিব না। অর্জ্জুন এই বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, রথ চালাইতে লাগিলেন। তাহাতে উত্তর মহাভয়ে রথ হইতে ভূমে লম্ফ দিয়া পড়িয়া পলায়ন করিলেন। অর্জ্জুন উত্তরকে ধরিয়া কহিলেন, অরে মূঢ়, তুমি রাজপুত্র হইয়া রণস্থল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছ ইহা অপেক্ষা আর হাস্যাস্পদ কি আছে! যদি তুমি যুদ্ধ করিতে অক্ষম হও তবে আমি যুদ্ধ করিতেছি, তুমি সারথি হও। উত্তর ইহাতে হঠাৎ সাহসিক হইলেন না, কিন্তু পরে সুতরাং সম্মত হইলেন।

তখন অর্জ্জুন, অজ্ঞাতবাসের পূর্ব্বে নগরের বহির্ভাগে শিংশপা বৃক্ষে যে ধনু ও আর আর অস্ত্র শস্ত্র শবাকারে রাখিয়াছিলেন তাহা পাড়িয়া লইলেন। এবং সংগ্রাম স্থলে গমন করিয়া আপন বল বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া তাবৎ কুরুসৈন্য স্তব্ধ হইল। ভীষ্মাদি মহারথি বীরগণ দেখিলেন যে অর্জ্জুন সংগ্রামে আসিয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ

আহ্লাদিত হইয়া মনে করিলেন, ভাল হইল পাণ্ডব-দিগের অজ্ঞাত বাস প্রকাশ হইল, ইহাদিগকে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে। কিন্তু দ্রোণাচার্য্য গণনা করিয়া দেখিলেন তাহাদিগের অজ্ঞাত বৎসর, সপ্তদশ দিবস অতীত হইয়াছে। ইহাতে সকলের উদ্যম ভঙ্গ হইল। পরে অর্জ্জুন সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে বিরাটের গোধন সকল উদ্ধার করিলেন, তাহার পর ক্রমে ক্রমে সকল যোদ্ধাকে পরাজয় করিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধন লজ্জিত হইয়া স্বদেশে পলায়ন করিলেন।

অর্জ্জুন, গবী সকল উদ্ধার করিয়া আনাতে, বিরাট রাজা অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন। পরে তাঁহার ও তাঁহার চারি ভ্রাতার ও দ্রৌপদীর পরিচয় পাইয়া, পরমানন্দিত হইলেন, বিশেষতঃ ভীম ও অর্জ্জুনকে আপন উদ্ধারকারী জানিয়া অতিশয় সম্মান করিলেন, এবং দ্রৌপদীর প্রতি কুব্যবহার জন্য তাঁহার স্থানে মার্জ্জনা চাহিলেন। অধিকন্তু তাঁহাদের সহিত প্রণয়ের আবশ্যকতা জন্য অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সহিত আপন কন্যা উত্তরার বিবাহ দিলেন।

এই ব্যাপারের পর পাণ্ডবগণ সুহৃদ্ বন্ধু সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া, আপন রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। অন্ধ-

রাজ ভীষ্ম ও বিদুরাদি মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে পূর্ব্বাধিকার ইন্দ্রপ্রস্থ দিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু দুর্যোধন কুমন্ত্রিগণের মন্ত্রণায় কোন মতেই সম্মত হইলেন না। জ্ঞাতি-বন্ধু-হানি ও অনেক মহাপ্রাণি বধ হইবে ভাবিয়া পাণ্ডবগণ ইহা পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন যে, আমাদিগের পঞ্চ ভ্রাতাকে পাঁচ খানি গ্রাম দাও, তাহা হইলে আমরা কোন প্রকারে দিনপাত করিতে পারি। কিন্তু ক্রূর দুর্য্যোধন এই উত্তর করিলেন যে, বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবগণকে সূচ্যগ্র-প্রমাণ ভূমিও দিব না। ইহাতে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃকল্প হইল।

অনন্তর কুরু পাণ্ডব উভয় পক্ষে, সৈন্য সামন্ত তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ রথী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট আছে এই যুদ্ধের জন্য রাজা দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌ-হিণী, ও রাজা যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিণী, সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং যুদ্ধের নিয়ম এইরূপ হইয়াছিল এক ব্যক্তির সহিত এক জন যুদ্ধ করিবে, তাহাতে অন্য ব্যক্তি প্রতিবাদী বা সহকারী হইতে পরিবে না, এবং নিরস্ত্র বা পলায়নপরায়ণ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিবে না। এইরূপে আয়োজন ও নিয়ম নির্দ্ধারিত হইলে, কুরু-পক্ষে ভীষ্ম ও পাণ্ডবপক্ষে অর্জ্জুন সেনাপতি অভি-ষিক্ত হইলেন। ভীষ্ম ভিন্ন দুর্য্যোধনের, দ্রোণ কর্ণ কৃপ

প্রভৃতি অনেকাকে প্রধান সেনাপতি ছিলেন। যুধিষ্ঠিবেব ভ্রাতৃগণ ভিন্ন অন্য সহায বড় ছিল না। কিন্তু তিনি অতি ধার্ম্মিক, এজন্য তাঁহাব সর্ব্বোপবি ধর্ম্ম এক প্রধান বল ছিল। এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের সারথ্য স্বীকাব কবিয়াছিলেন। এই সজ্জায় কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাবম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধ ক্রমাগত অষ্টাদশ দিবস হইয়াছিল।

প্রথম যুদ্ধ ভীষ্ম ও অর্জ্জুনে হইল, এই যুদ্ধ ক্রমাগত দশ দিবস পর্য্যন্ত হইযাছিল। ঐ যুদ্ধে অর্জ্জুনের হস্তে ভীষ্ম নিহত হইলেন। তৎপবে দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে আসিলেন, তিনিও দুই তিন দিবস যুদ্ধ কবিলেন। কিন্তু পবিশেষে পবাস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ কবিলেন। তদনন্তব কর্ণ সেনাপতি হইলেন। তিনি দুই দিবস অতি ঘোবতব সংগ্রাম কবিলেন, পবে পূর্ব্ব সেনাপতিগণের ন্যায শমন-ভবনে গমন কবিলেন। তৎপরে শল্য রাজা সেনাপতিত্ব স্বীকাব করিলেন, তিনিও যুদ্ধে হত হইলেন। এইরূপে অনেক সেনাপতি নষ্ট হইল। এবং ভীম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের নবনবতি ভ্রাতা ও পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র ও আত্মীয অমাত্যগণ হত হইল। ইহা ভিন্ন কত সৈন্য ও কত হস্তী ও কত অশ্ব নষ্ট হইল তাহাব সঙ্খ্যা নাই। ফলতঃ দুর্য্যোধন এক বাবে সহায়হীন হইয়া পড়িলেন। পাণ্ডবপক্ষেও অনেক

যোদ্ধা ও অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। ইহাতে উভয় পক্ষই দুঃখসাগরে মগ্ন হইলেন। তখন দুর্য্যোধন আপনাকে একবারে যুদ্ধে অক্ষম বিবেচনা করিয়া, এক গদা হস্তে করিয়া প্রাণ রক্ষার জন্য রণস্থলী পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটা হ্রদের মধ্যে এক গৃহে লুকাইয়া থাকিলেন।

দুর্য্যোধন পলায়ন করিলে, পাণ্ডবেরা তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে ভীম তাঁহার সন্ধান পাইয়া, হ্রদের নিকট যাইয়া তাঁহাকে অনেক ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন অতি অভিমানী ছিলেন, অতএব ভীমের ভর্ৎসনা সহ্য করিতে না পারিয়া গদা হস্তে জল হইতে উঠিলেন এবং ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ভীম প্রচণ্ড প্রতাপে তাঁহার উরুদেশে এমত গদাঘাত করিলেন যে তাহাতে তাঁহার উরু একেবারে ভগ্ন হইল, তিনি ধরায় পতিত হইলেন। ঐ সময়ে পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করিয়া ভীম তাঁহাকে পদাঘাত করিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন ভীম, তুমি অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম করিলে; যিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা এবং অতি মানী ও সৎকুলোদ্ভব, তাঁহার প্রতি এরূপ অত্যাচার করা উচিত নহে। এই বাক্যে ভীম লজ্জিত ও অধোবদন হইলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির সহোদরগণ সমভি-

ব্যাহারে জ্ঞাতিবধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার মানসে প্রভাস তীর্থে স্নানাদি জন্য গমন করিলেন।

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হওনানন্তর তিনি মৃতপ্রায় হইয়া থাকিলেন, উত্থানশক্তি রহিল না। রজনী-যোগে দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন, হে কুরুনাথ, তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমার অন্তর বিদীর্ণ হইতেছে, যদি তুমি এখনো আমাকে সেনাপতি কর তাহা হইলে আমি তোমার শত্রুগণকে নিপাত করিতে পারি। রাজা কহিলেন ভীম কর্ত্তৃক আমার উরুভঙ্গ হইযাছে, আমার উত্থান শক্তি নাই, যাহা উচিত কর। ঐ বাক্যে অশ্ব-ত্থামা রাত্রিযোগে কৌশলপূর্ব্বক পাণ্ডব-শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি জানিতেন না, পঞ্চ পাণ্ডব ঐ দিবস প্রভাসে গমন করিয়াছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ শিবির-রক্ষক ছিলেন, কিন্তু রজনী অন্ধকার, বিশেষতঃ সকলে নিদ্রায় অচৈতন্য ছিলেন, তাহাতেই অশ্বত্থামার চাতুর্য্য কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক, অশ্বত্থামা প্রথমতঃ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিয়া, তৎপশ্চাৎ পঞ্চপাণ্ডব-জ্ঞানে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের মস্তক-ছেদন করিলেন। ঐ পঞ্চ পুত্রের পঞ্চ মুণ্ড লইয়া দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন এই দেখ আমি পঞ্চ পাণ্ডবকে বধ করিয়া, তোমার প্রত্যয়ার্থ

তাহাদের ছিন্ন মস্তক আনয়ন করিয়াছি। পাণ্ডব-কন্টক দুর্য্যোধন আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, হে গুরুপুত্র! ভীম আমার বংশ নাশ করিয়াছে, অতএব তাহার মস্তকটা আমার হস্তে দাও দেখি। এই কথায় অশ্বত্থামা ভীমাকৃতি ভদৌরসজাত পুত্রের মস্তক রাজার হস্তে দিলেন। দুর্য্যোধন ঐ মস্তকটা লইয়া দুই হস্তে ধরিয়া এমনি নিষ্পীড়া করিলেন যে, তাহাতে ঐ মুণ্ড একবারে চূর্ণ হইয়া গেল, তাহাতে তিনি অতিশয় বিষাদ যুক্ত হইয়া কহিলেন, হে অশ্বত্থামন্ তুমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছ! এ মস্তক ভীমের নহে, তুমি পঞ্চ পাণ্ডব জ্ঞান করিয়া তাহাদের পঞ্চ পুত্রকে বিনাশ করিয়াছ, আহা! এমন কুকর্ম্ম কেন করিলে! কুরু পাণ্ডব উভয় বংশই এককালীন লুপ্ত হইল! এইরূপে অনেক আক্ষেপ ও অশ্বত্থামাকে অনুযোগ করিয়া, পূর্ব্ব আঘাত ও বর্ত্তমান শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন।

রজনী প্রভাতা হইলে দ্রৌপদী স্বীয় পুত্রগণের ও ভ্রাতার বধের সংবাদে হাহাকার শব্দে রোদন ও আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ ঐ বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। পরে সকলেই শোক সম্বরণ করিলেন, কিন্তু ভীম অশ্বত্থামার অনুচিত কর্ম্মে রাগান্ধ হইয়া, অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহাকে ধৃত করিয়া আনিলেন এবং বধ

করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দ্রৌপদী কৃতাঞ্জলি পুরঃসর বলিলেন, হে বীরবর, তুমি কখন ব্রহ্মবধ করিও না। যদিও অশ্বত্থামা অবিচারে আমার পঞ্চ পুত্র ও ভ্রাতাকে বধ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ অবধ্য, বিশেষতঃ ইনি তোমার গুরুপুত্র, এবং সকলেই ব্রাহ্মণকে মান্য করিয়া আসিয়াছেন, অতএব এ কর্ম্ম করিলে অপযশঃ হইবে, এজন্য ব্রাহ্মণের প্রাণ আমাকে ভিক্ষা দাও। ইহা কহিয়া অনেক স্তুতি বিনতি পূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর করুণায় অতিশয় লজ্জিত হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলেন ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যু সহস্রাংশে ভাল ছিল।

অনন্তর পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে গমন করিলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত সাক্ষাৎ করাতে তাঁহাদের আক্ষেপ বাক্যে, ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত ভ্রাতার ভার্য্যাদিগের ক্রন্দন দুঃখে, যুধিষ্ঠির একবারে আর্দ্র হইলেন। ঐ সকল নারীগণ তাঁহাকে কুরুকুল নির্ম্মূল ও আপনাদের বৈধব্য দশার মূল বলিয়া নানা প্রকার তিরস্কার করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন। পরে জ্যেষ্ঠতাতের অনুজ্ঞা ক্রমে, যে সকল বন্ধু বান্ধব জ্ঞাতি কুটুম্ব ও আত্মীয় স্বজন যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন

তাঁহাদিগের অগ্নিসংস্কার ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া, পুনর্ব্বার রাজা হইয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিচারে প্রজাগণ অত্যন্ত সুখী হইল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে বিবেচনা করিলেন আমি বিষয়-মত্ত হইয়া অনেক জ্ঞাতি ও বন্ধু বিনাশ করিয়াছি, তাহাতে অধিক পাপ হইয়াছে, অতএব ঐ পাপ ক্ষয় জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করা আবশ্যক, এই বিবেচনা করিয়া তিনি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে মহা সমারোহ হইল। কথিত আছে, পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞে যেমন ধূমধাম হইয়াছিল, তদপেক্ষা এই যজ্ঞ অধিক ধূমধামে নির্ব্বাহ হইল।

যজ্ঞ করণানন্তর রাজা যুধিষ্ঠির শিষ্ট-পালন ও দুষ্ট দমন পূর্ব্বক রাজত্ব করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমশঃ আরো যশস্বী হইলেন। কিয়ৎ কাল পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী বিদুর কুন্তী ও সঞ্জয় সমভিব্যাহারে যোগ সাধনার্থ অরণ্যে গমন করিলেন। কতক দিবস যোগ সাধন করিয়া ক্রমে ক্রমে সকলে পঞ্চত্ব পাইলেন। পাণ্ডবদিগের পরম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বংশোদ্ভব সমস্ত বীরগণ কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। এই সকল ঘটনার পর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে রাজ্যভারার্পণ করিয়া যোগ সাধনার্থ গমনের বাঞ্ছা করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃগণ রাজত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না,

বরং একরূপ প্রতিজ্ঞা জানাইলেন যে তাঁহার সমভি-ব্যাহারী হইয়া তাঁহারাও অরণ্য প্রবেশ করিবেন। যুধিষ্ঠির ইহাতে নিরুপায় হইয়া, উত্তরার গর্ভে অভি-মন্যুর ঔরসজাত পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজত্ব অর্পণ করিয়া চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত হিমালয় পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন।

ব্যাসদেব লিখিয়াছেন যে প্রথমতঃ দ্রৌপদী তৎপরে সহদেব তৎপরে নকুল অর্জ্জুন ও ভীম একে একে সকলে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় ধার্ম্মিক ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন এজন্য তাঁহার ধ্বংস হইল না, তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন।

দ্রৌপদী সতীলক্ষ্মী ছিলেন। মাতৃ আজ্ঞায় তাঁহার পঞ্চ স্বামী হইয়া ছিল। তিনি সেই পঞ্চ স্বামীরই মনোরমা হইয়া, সতীর মধ্যে অগ্রগণ্যা হইয়া-ছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি অতি ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা ও দয়াশীলা ছিলেন, এবং অধীন গণকে মাতার ন্যায় পালন করিতেন। রাজকন্যা ও রাজভার্য্যা হইয়াও তিনি পতিগণের সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া-ছিলেন। এই সকল গুণে তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর কি আবশ্যক।

লীলাবতী।

লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের কন্যা *। তিনি গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যাতে এমত পারগ হইয়াছিলেন যে পুরুষের তদ্রূপ হওয়া কঠিন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত কোন বাঙ্গালা বা সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই পুস্তকলেখক তদ্বৃত্তান্ত প্রাপ্তি হেতু অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। দিল্লীর অধিপতি আকবর সাহের ফয়েজ নামক এক সভাসদ, উক্ত সম্রাটের সন্তোষার্থে, এক ব্রাহ্মণের নিকট আপনাকে ব্রাহ্মণ রূপে পরিচয় দিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া, সংস্কৃত ভাষার উত্তম উত্তম গ্রন্থাদি পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভাস্করাচার্য্যের বিরচিত লীলাবতী নামক যে গ্রন্থ অনুবাদ করেন তাহার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন ভাস্করাচার্য্য বদর সহর নিবাসী। লীলাবতী তাঁহার এক মাত্র কন্যা ছিলেন, তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কিন্তু তাঁহার জন্মকোষ্ঠি ও নাক্ষত্রিক গণ-

---

* কোন কোন গ্রন্থকার লেখেন লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের ভার্য্যা, কিন্তু তাহার বিশেষ প্রমাণ দেন নাই।

নাতে প্রকাশ হইয়াছিল তিনি পতি-পুত্র বিহীনা হইবেন। ভাস্করাচার্য্য দুহিতার এই প্রকার দুর্গতির ভাবনায় নিতান্ত দুঃখিত থাকিতেন, এবং সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন বৈধব্য দশা বিমোচনের কোন উপায় আছে কি না।

অনন্তর তাঁহার বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে, তিনি আপন জ্যোতির্ব্বিদ্যা বলে এমত লগ্ন স্থির করিলেন যে সেই লগ্নে বিবাহ হইলে লীলাবতী পতিবিহীনা হইবেন না এবং পুত্রবতী হইবেন। পরে বিবাহের দিবসে অনেকানেক বিদ্বান্ ও বিজ্ঞ লোককে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে কন্যা ও জামাতাকে একত্র বসাইয়া, লগ্নের কাল নির্ণয়ার্থ জলপূর্ণ এক পাত্রের উপর অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র যুক্ত একটী তাম্বি রাখিয়া বলিলেন, ঐ তাম্বির ছিদ্র দিয়া জল উঠিয়া যখন তাম্বি জলমগ্ন হইবে তখন কন্যা সম্প্রদান করিব, তাহা হইলে কন্যা বিধবা হইবেন না।

ভাস্করাচার্য্য কালের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবেচনা জন্য, বিজ্ঞ পণ্ডিত ও দৈবজ্ঞ প্রভৃতি অনেক বিচক্ষণ মনুষ্যকে তথায় রাখিলেন। কিন্তু দৈবের কি বিচিত্র গতি; লীলাবতী বাল্যস্বভাব প্রযুক্ত, ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা তাম্বির মধ্যে জলাগমন হওয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া লগ্ন নির্দ্ধারণ যন্ত্রের উপর দৃষ্টিপাত করিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে

অকস্মাৎ তাঁহার মস্তকের মুকুট হইতে একটী ক্ষুদ্র মুক্তা জলবিন্দুবৎ সেই তাম্বিতে পতিত হইয়া, জল প্রবেশ-ছিদ্রের উপরি স্থিত হইয়া জলপ্রবেশ স্থগিত করিল। ভাস্করাচার্য্য ও দৈবজ্ঞগণ স্থানে স্থানে বসিয়া তাম্বি জলমগ্নের অপেক্ষা করিতে ছিলেন, যখন জলমগ্ন হওনের আনুমানিক কাল অতীত হইয়া অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তৎপরে দেখিলেন একটী ক্ষুদ্র মুক্তা তাঁবিতে পতিত হইয়া জলপ্রবেশের পথ অবরোধ করিয়াছে, এবং লগ্ন অতীত হইয়াছে। ইহাতে আচার্য্য অতিশয় আশ্চর্য্যা-ন্বিত ও দুঃখিত হইলেন, এবং তাদৃশ লগ্নের আশা নিষ্ফল দেখিয়া কন্যার বিবাহ দিলেন। তাহার কিছু-কাল পরে লীলাবতী পতিবিহীনা হইলেন। তখন ভাস্করাচার্য্য দেখিলেন লীলাবতীকে পতি পুত্র বিহীনা-বস্থায় কালক্ষেপ করিতে হইবে। তাহাতে তিনি বিবেচনা করিলেন পুত্রাদি দ্বারা কেবল কিছু কাল মাত্র পৃথিবীতে নাম থাকে, কিন্তু আমি জ্যোতির্ব্বিদ্যাতে কন্যাকে এমত বিদ্যাবতী করিব, যে তদ্দারা তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে।

এই বিবেচনা করিয়া তিনি কন্যাকে নানা প্রকার অঙ্ক ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন, এবং সংস্কৃত ভাষাতে এক অঙ্কপুস্তক প্রস্তুত করিয়া, ঐপুস্তক তাঁহার

নামে প্রচারিত করিলেন। এই পুস্তক প্রস্তুত হওনের অব্দ লেখা নাই, কিন্তু নক্ষত্রনির্ণয় কর্ণকুতুহল গ্রন্থে তাহা প্রস্তুত হওনের সময়, শালিবাহনের ১১০০ অব্দ লিখিত আছে। ভাস্করাচার্য্য লীলাবতীকে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, লীলাবতী তাহার উত্তর দিতেছেন, এইরূপ প্রশ্ন উত্তর ভাবে ঐ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে অঙ্ক করণের যে সকল প্রণালী আছে তাহা অতি সুন্দর। তাহাতে প্রথমতঃ পরি-ভাষা নিরূপণ-পূর্ব্বক ক্রমে সঙ্কলন, ব্যবকলন, পূরণ, হরণ, বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল প্রভৃতি অঙ্ক করণের অতি সুগম ও উত্তম উত্তম সূত্র ও উদাহরণ আছে, তদ্দ্বারা অঙ্ক করিবার শৈলী উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

পাঠকবর্গ এমত বিবেচনা করিবেন না কেবল ভাস্করাচার্য কৃত গ্রন্থ জন্য লীলাবতীর নাম দেদীপ্যমান রহিয়াছে। লীলাবতী স্বয়ং বিদ্যাবতী ছিলেন, এবং অঙ্ক ও জ্যোতির্ব্বিদ্যাতে অতিনিপুণা হইয়াছিলেন, এবং লোকে সচরাচর ইহাও বলিয়া থাকে যে লীলাবতী জ্যোতির্ব্বিদ্যাতে এমত পারগ ছিলেন যে বৃক্ষমূলে বসিয়া অত্যল্প কালের মধ্যে বৃক্ষের শাখা পল্লব ও পত্রের সঙ্খ্যা গণনা করিতে পারিতেন।

খনা।

খনার জন্মের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া কঠিন। কেহ কেহ বলেন তিনি ময়-দানব রাক্ষসের কন্যা। কেহ কেহ বলেন তিনি কোন রাজার কন্যা ছিলেন পরে রাক্ষসেরা তাঁহার পিতাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তাঁহাকে লঙ্কা অর্থাৎ সিংহল দ্বীপে লইয়া গিয়া কন্যার ন্যায় লালন পালন করিয়াছিল। যাহা হউক খনার জ্যোতিষ শাস্ত্রে নিপুণতার বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কথিত আছে (এবং এই কথার অনেক প্রমাণও আছে) পূর্ব্বকালে রাক্ষস অর্থাৎ লঙ্কাস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল, এবং কোন কোন রাক্ষস ঐ শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত ছিলেন। উক্ত আছে খনা যে রাক্ষসের আলয়ে ছিলেন সেই রাক্ষস জ্যোতির্ব্বিদ্যাতে অতি পরাগ ছিলেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল, তাহারা তাঁহার গৃহে থাকিয়া বিদ্যা-ধ্যয়ন করিত। খনাও ঐ সঙ্গে জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতেন, এবং সজাতীয় মনুষ্যাভাবে বাল্যক্রীড়াতে রত থাকিতেন না, কেবল জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনা

করিতেন। সুতরাং বাল্যকালেই ঐ বিদ্যাতে তাঁহার সুন্দর ব্যুৎপত্তি জন্মিল। এবং তাঁহার প্রখর বুদ্ধি দেখিয়া তৎপালক ও শিক্ষক তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে অধিক যত্ন এবং তাঁহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন।

রাক্ষসেরা যখন খনাকে মনুষ্যালয় হইতে লইয়া এই প্রকার বিদ্যাশিক্ষা করায়, তখনই হউক বা তাহার পূর্ব্বেই হউক, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ বরাহ নামক এক পণ্ডিতের এক সন্তান জন্মিয়াছিল। এতদ্দেশে বহুকালাবধি এই নিয়ম আছে, সন্তানাদি হইলে তাহার অদৃষ্টের শুভাশুভ জানিবার জন্য পিতা মাতা জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করেন। বরাহ স্বয়ং জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, এজন্য অন্যের দ্বারা ঐ জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করাইবার অপেক্ষা না করিয়া আপনিই গণনা করিলেন। কিন্তু পরমায়ুর সঙ্খ্যা করিতে এক শূন্য ভুলিয়া, ১০০ বৎসরের স্থলে ১০ বৎসর গণনা করিলেন, তাহাতে অন্তঃকরণে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া মনে মনে ভাবিলেন এমত অল্পায়ু পুত্র কেবল অসুখের কারণ, কেন না ইহাকে লালন পালন করিলে ক্রমশঃ অধিক স্নেহ হইবে, তাহার পর ইহার প্রাণ বিয়োগে অধিক মনস্তাপ পাইতে হইবে। অতএব তদপেক্ষা ইহাকে লালন পালন না করাই সৎপরা-

মর্ম্ম। এই বিবেচনা করিয়া বরাহ পুত্রকে এক তাম্র-পাত্র-মধ্যে স্থাপন করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। পাত্র ভাসিতে ভাসিতে চলিল।

দৈবাযত্ত সমুদ্রকূলে কতকগুলা রাক্ষসী জলক্রীড়া করিতেছিল, তাহারা ঐ পাত্রমধ্যে শিশু দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়যুক্ত হইল; এবং যদিও তাহারা নরহিংসক তথাপি সেই বালকের প্রাণ হিংসা বা অন্য কোন অনিষ্ট না করিয়া তাহাকে আপনাদিগের আলয়ে লইয়া গেল, এবং মিহির নাম দিয়া তাহাকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের শিক্ষা দিতে লাগিল। তাহাতে মিহির ঐ বিদ্যাতে সুপণ্ডিত হইলেন।

খনা এই সময়ে রাক্ষসালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিতে ছিলেন। মিহির-পালক রাক্ষসগণ ঐ খনাকে তাঁহার যোগ্য পাত্রী জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত মিহিরের বিবাহ দিল।

এই প্রকার খনার সহিত মিহিরের বিবাহ হইলে তাঁহারা পতি পত্নী উভয়ে রাক্ষসালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রতি রাক্ষসগণের অনাদর ছিল না, কিন্তু রাক্ষসেরা নরভুক ইহা ভাবিয়া এবং তাহাদের কুৎসিত ব্যবহারাদিতে বিরক্ত হইয়া তাঁহারা সতত চিন্তা করিতেন কিরূপে রাক্ষস-ধাম পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহাদের এমত ভরসা ছিল না রাক্ষসদিগকে

বলিলে তাহারা সহজে তাঁহাদিগকে যাইতে অনুমতি দিবে। সুতরাং উভয়ে পরামর্শ করিলেন, যখন রাক্ষসেরা স্থানান্তরে গমন করিবে তখন দুই জনে পলায়ন করিব। কিন্তু এক সময়ে সকল রাক্ষস বাটীর বহির্গত হইত না। যদিবা কখন সকলে বাহিরে যাইত, তাঁহারা কালাকাল বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ যাত্রা করিতেন না, কেন না অকাল-যাত্রায় অনেক অমঙ্গল সম্ভাবনা। এই প্রকার পলায়ন ইচ্ছা করিয়াও অনেক কাল বৃথা গেল, পলাইবার অবকাশ হইল না।

অনন্তর এক দিবস মধ্যাহ্ন-ভোজন সময়ে খনা ভোজনাসনে বসিয়া, মাহেন্দ্র ক্ষণ পাইয়া, ভোজন করিতে করিতে বাম পদ বাড়াইয়া যাত্রা করিয়া থাকিলেন। মিহিরও সেই শুভক্ষণে দক্ষিণ পদ বাড়াইয়া যাত্রা করিলেন। ইহার কারণ এই, মাহেন্দ্র ক্ষণে যাত্রা করিলে, যাহা মানস করিয়া যাত্রা করা যায় তাহা সিদ্ধ হয়, কোন বিঘ্ন হয় না।

রাক্ষসগণ তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মনে মনে করিল, ইহারা মাহেন্দ্র ক্ষণে যাত্রা করিয়াছে, ইহাদিগকে কোন প্রকারে আটক করিয়া রাখিতে পারিব না। অতএব তাহাদের যিনি প্রধান, তিনি এক রাক্ষসীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন যে তুমি জ্যোতিষশাস্ত্রের সকল পুথি লইয়া ইহাদের সঙ্গে গমন কর।

সমুদ্র পার হইলে ইহাদিগকে কয়েক প্রশ্ন করিবে। যদি ইহারা সেই সকল প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ না হয় তবে পুস্তকগুলি ইহাদিগকে দিও, নতুবা তাহা ফিরিয়া আনিও। এই আজ্ঞা পাইয়া রাক্ষসী প্রস্তুত হইয়া থাকিল। অনন্তর মিহির ও খনা প্রস্থান করিলে সে পুস্তক লইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। সমুদ্র পার হইয়া রাক্ষসী দেখিল একটা গাভীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সে মিহিরকে জিজ্ঞাসা করিল বল দেখি এই গাভীর কি বর্ণের বৎস হইবে। মিহির বলিলেন শুভ্রবর্ণ বৎস হইবে। কিন্তু গাভী প্রসব হইলে দেখা গেল কৃষ্ণবর্ণ বৎস হইয়াছে। তাহাতে রাক্ষসী, বলিল এখন পর্য্যন্ত তোমার ভাল বিদ্যা শিক্ষা হয় নাই, অতএব তুমি এই তিন খান পুস্তক লইয়া যাও, অভ্যাস করিও। ইহাতে খগোল, ভূগোল ও পাতালের গণনা আছে। ইহার দ্বারা তোমার ও মনুষ্য জাতির বিশেষ উপকার হইবে।

ইহা বলিয়া রাক্ষসী বিদায় হইল। মিহির মনে মনে লজ্জিত হইয়া বিবেচনা করিলেন, এত শ্রম স্বীকার করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করিলাম তথাপি একটা সামান্য গণনা করিতে পারিলাম না, অতএব এ শাস্ত্রই মিথ্যা। ইহা ভাবিয়া তিনখান পুস্তকের মধ্যে পাতাল সম্পর্কীয় গণনার পুস্তক সম্মুখে পাইয়া

তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। খনা দেখিলেন এ কর্ম্ম ভাল হইল না, অতএব অবশিষ্ট দুই খান পুথি তাঁহার হস্ত হইতে লইয়া তাঁহাকে বলিলেন হে স্বামিন্, তুমি কি করিলে, কৃষ্ণবর্ণ বৎস দেখিয়া কি তুমি এই বিবেচনা করিয়াছ যে তোমার গণনা অপ্রকৃত হইযাছে, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই প্রকৃত। খনা এই কথা বলিলে পর, গাভী বৎসকে চাটিতে লাগিল, তাহাতে বৎস কৃষ্ণবর্ণ ঘুচিয়া শুভ্রবর্ণ হইল। মিহির তদবলোকনে মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া ভার্য্যাকে বলিলেন তবে পুস্তক নষ্ট করা ভাল হয় নাই, এই পুস্তক নষ্ট করাতে একটা শাস্ত্র একবারে লোপ হইল। কিন্তু তখন অন্য উপায় ছিল না, অতএব অবশিষ্ট দুইখান পুস্তক লইয়া উভয়ে যাত্রা করিলেন।

কোন কোন গ্রন্থে লেখে, খনা ও মিহির রাক্ষসালয় পরিত্যাগ করণ সময়ে তাহাদের জ্যোতিষের পুস্তকাদি গোপন ভাবে আনিতেছিলেন। রাক্ষসগণ তাহা জানিতে পারিযা তাহাদিগকে আটক করিয়া পাতালখণ্ড বিষয়ক পুস্তক কাড়িযা লইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহারা খগোল ও ভূগোল ভিন্ন আর কোন পুস্তক আনিতে পারেন নাই। যাহা হউক, রাক্ষসেরা খনা ও মিহিরকে ঐ সকল পুস্তক দিযা থাকুক বা তাঁহারা অপহরণ করিয়া আনিয়া থাকুন, তাঁহাদের কর্তৃক ঐ সকল

পুস্তক এতদ্দেশে আনীত হয, এবং তদনুসাবে অদ্যাপি এতদ্দেশেব গণনাদি হইযা আসিতেছে।

খনা ও মিহিব সমুদ্র পাব হইয়া উত্তবাভিমুখে গমন করিতে কবিতে কয়েক দিন পবে এক বনপ্রবেশ কবিযা দেখিলেন, বাজা বিক্রমাদিত্য নববত্নেব সভা সমভি-ব্যাহাবে মৃগযার্থ অথবা কোন কৌতুক দর্শনার্থ তথায় আগমন কবিয়াছেন। খনা ও মিহিব বাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, বাজা তাঁহাদেব পবিচয জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে তাঁহাবা আপনাদিগকে জ্যোতিষ-ব্যবসাযী বলিযা পবিচয দিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে সমাদব কবিলেন এবং আলাপ দ্বাবা মিহিবেব জ্যোতিষ শাস্ত্রে নিপুণতা দেখিযা তাঁহাকে সমভিব্যাহাবে লইযা বাজধানীতে গমন কবিলেন। বাজধানীতে উপস্থিত হইযা, রাজা ববাহকে আজ্ঞা কবিলেন মিহিবেব অব-স্থিতিব জন্য তিনি স্থান নির্দ্দিষ্ট কবিযা দেন।

ববাহ বুঝিযাছিলেন মিহিব তাঁহা অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত, সুতবাং মিহিব রাজাব প্রিয় হইলে তাঁহাব মান সম্ভ্রমেব খর্ব্বতা হইবে, এই আশঙ্কায তিনি তাঁহাকে একটী পুবাতন গৃহে বাস কবিতে দিলেন। ঐ ঘব এমত জীর্ণ হইয়াছিল যে তাহাতে সহসা কেহ বাস কবিতে ইচ্ছা কবিত না। ববাহ মনে মনে কবি-লেন মিহিব ঘব চাপা পড়িয়া মারা যাইবে, তাহা

হইলে আমার আর কন্টক থাকিবে না। কিন্তু গৃহ পতন না হইয়া রাত্রিযোগে ঐ ঘরে রত্ন বর্ষণ হইল। বরাহ তাহাতে বড়ই অপ্রতিভ হইলেন। অনন্তর মিহির রাজ-সভায় গমন করিলে, রাজা তাঁহাকে পূর্ব্ব-মত সমাদর পুরঃসর আপনার নিকটে বসাইলেন। তদনন্তর শাস্ত্রাদির আলাপ হইতে হইতে মিহির বরাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কয় সন্তান? বরাহ উত্তর করিলেন আমার এক সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অল্পায়ু প্রযুক্ত তাহাকে এই প্রকারকরিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়াছি। মিহির জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ পুত্র কোন্ লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বরাহ লগ্নের কথা জ্ঞাপন করিলেন। মিহির গণনা করিয়া কহিলেন ঐ পুত্রের আয়ু ১০০ এক শত বৎসরের ন্যূন নহে, আপনি কোন্ গণনানুসারে তাহার পরমায়ু দশ বৎসর স্থির করিলেন। বরাহ তখন গণনা করিয়া দেখিলেন মিহিরের বাক্য যথার্থ, তাহাতে পুত্রের পরমায়ু সত্ত্বে তাহাকে নদীতে ভাসাইয়া দেওন জন্য অনেক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মিহির বলিলেন ঐ পুত্রের পরমায়ু একশত বৎসর. ইহার পূর্ব্বে তাহার ধ্বংস নাই, তিনি অবশ্য জীবদ্দশায় আছেন।

ক্রমে ক্রমে পিতা পুত্রে এই প্রকার পরিচয় হইল। বরাহ নিশ্চয় জানিয়াছিলেন পুত্রের আয়ুঃশেষ হইয়া

প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, যখন জানিলেন মিহির তাঁহার পুত্র, এবং তিনি রাক্ষস কর্তৃক রক্ষিত হইয়া জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ হইয়াছেন, এবং ততোহধিক বিচক্ষণা খনাকে বিবাহ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রোড়ে লইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য ও তৎ সভাসদ সকলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা ও বিদ্যা শিক্ষার আশ্চর্য্য বিবরণ শ্রবণ করিয়া, অতিশয় চমৎ-কৃত হইলেন। অনন্তর বরাহ পুত্র ও পুত্রবধূকে গৃহে লইয়া গেলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণী হারা নিধি ও গুণবতী বধূ খনাকে পাইয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন।

খনা রাক্ষসালয়ে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রে অদ্বিতীয়া হইয়াছিলেন। রাক্ষসগণের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ঐ বিদ্যাতে এমন নিপুণা হইয়া ছিলেন যে ঐ শাস্ত্র তাঁহার মুখাগ্রবর্ত্তি হইয়াছিল, এবং তদ্বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিতে পারিতেন।

পাঠকবর্গ পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন, বরাহ রাজ-সভায় পণ্ডিত ও জ্যোতিষবেত্তা ছিলেন, সুতরাং নানা দেশীয় লোক জ্যোতিষগণনার জন্য তাঁহার নিকটে আসিত। বরাহ অবসর কালে তাহাদিগকে লইয়া পুথি পাঁজি খুলিয়া অনেক বৃথা আড়ম্বর করি-

তেন, এবং যাহার যে উদ্দেশ্য তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা দিতেন। খনা গৃহের মধ্যে থাকিয়া গৃহের কর্ম্ম করিতেন, এবং কে কি জিজ্ঞাসা করে তাহাও শুনিতেন। যদি শ্বশুরের দ্বারা যথার্থ উত্তর হইত তবে তাহাতে কোন কথা কহিতেন না। যদি কোন প্রশ্নের উত্তরে অক্ষম হইতেন, বা অনায়াসে উত্তর করিতে না পারিতেন তবে ঘরের ভিতর হইতে বলিয়া দিতেন, ইহার এই হইবে, বা ইহার এই কর্ত্তব্য। এই প্রকারে অত্যল্প কালের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত যশোবৃদ্ধি হইল, এবং অনেক দূর হইতে লোকেরা তাঁহার বিদ্যা পরীক্ষার জন্য আসিতে লাগিল। তিনি যাহা বলিয়া দিতেন তাহার কোন অংশেই ভ্রম হইত না।

জ্যোতিষগণনা সংক্রান্ত অনেক অনেক বচন খনার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ঐ সমস্ত বাঙ্গলা দেশে অতিশয় মান্য এবং অনেকেরই মুখাগ্রবর্ত্তি। এই সকল বচন খনার স্বকৃত কিম্বা অন্যের দ্বারা ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে তাহার নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। খনা ঐ সকল বচন সংস্কৃত ভাষাতে রচনা করিয়া থাকিবেন অসম্ভব নহে, কেননা তৎকালে ঐ ভাষার অত্যন্ত আদর ছিল, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাহার অনুশীলন করিতেন। কিন্তু কেহ কেহ কহেন খনা সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না, রাক্ষসের দেশে থাকিয়া

রাক্ষসভাষা অভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং সেই ভাষাতেই জ্যোতিষাদি গণনা লিখিয়াছেন।

কিন্তু খনার বিদ্যা তাঁহার মরণের মূল হইয়াছিল। কথিত আছে এক দিবস রাজা বিক্রমাদিত্য আপন সভাপণ্ডিতগণকে আজ্ঞা করিলেন আকাশের নক্ষত্র সঙ্খ্যা করিয়া বলিতে হইবে। সভাস্থ কোন পণ্ডিত ঐ গণনা করিতে সমর্থ হইলেন না। বরাহ অঙ্গীকার করিলেন তিনি পর দিবস নক্ষত্র-সঙ্খ্যা করিয়া দিবেন, কিন্তু তাহা না পারিয়া মহা দুঃখিত হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। খনা গৃহকর্ম্ম ও রন্ধনাদি করিতে ছিলেন, রন্ধন সমাপন হইলে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া শ্বশুরকে আহারার্থে আহ্বান করিলেন। বরাহ বলিলেন আমি আহার করিব কি, আমি এই বিপদে পড়িয়াছি, আমি নক্ষত্র সঙ্খ্যা করিতে না পারিলে জল গ্রহণ করিব না। এই কথা শুনিয়া খনা তখন মৃত্তিকাতে কয়েকটী অঙ্ক পাতিয়া শ্বশুরকে বলিলেন আকাশে এত নক্ষত্র আছে। খনার এই কথা শুনিয়া বরাহ মহা আনন্দিত হইলেন এবং রাজসভায় যাইয়া রাজাকে নক্ষত্রসঙ্খ্যা বলিলেন। রাজা অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন নক্ষত্র গণনা সঙ্কেত কোথায় পাইলে। তখন তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল তাঁহার গুণবতী পুত্রবধূ খনা এই গণনা করিয়া দিয়াছেন।

রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার নবরত্ন সভার কোন পণ্ডিত সেই গণনা করিতে পারিলেন না, খনা তাহা অনায়াসে করিয়া দিলেন, ইহাতে তিনি খনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাঁহার বিদ্যার সম্মানার্থ তাঁহাকে নবরত্নের প্রধান রত্ন করিবেন এই মনস্থ করিয়া, বরাহকে আজ্ঞা করিলেন তাঁহাকে সভায় আনয়ন কর। রাজার ইহাতে বিরুদ্ধ ভাব মাত্র ছিল না, তিনি তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা দেখিয়া তাঁহার সম্মানার্থ এই আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু বরাহ তাহাতে বিপরীত জ্ঞান করিলেন। তিনি ভাবিলেন কুলবধূকে রাজসভাতে কি প্রকারে আনয়ন করিব। ইহাতে কেবল লোকনিন্দা নহে; জাতি, কুল সকল নষ্ট হইবে। তিনি আরো মনে করিলেন খনার বিদ্যা তাঁহার মানহানির কারণ হইয়াছে, কেননা গৃহে কোন লোক গণনা করাইতে আসিলে তাঁহার গণনা সমাপন না হইতেই তিনি গৃহের ভিতর হইতে তাহা বলিয়া দেন, তাহাতে লোকেরা তাঁহার তাদৃক্ গৌরব করে না, এবং রাজার নিকটে তাঁহার বিদ্যা প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার অপমানের একশেষ হইল।

এই সকল কারণে, বিশেষতঃ কুলবতীকে রাজসভাতে লইয়া গেলে তাঁহার জাতি নাশ হইবে, মনে মনে এই চিন্তা করিয়া বরাহ তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদন করা সংপরা-

মর্ম্ম বিবেচনা করিলেন। যে হেতুক জিহ্বা নাশে বক্তৃতা শক্তি থাকিবে না, তাহা হইলে রাজা তাঁহাকে নবরত্ন সভাভুক্ত করিবেন না, তবেই সকল আপদ দূর হইবে। এই যুক্তি করিয়া পুত্রকে তাঁহার জিহ্বা ছেদন করিতে আজ্ঞা করিলেন। মিহির তাহাতে মনে মনে অসম্মত হইয়াও পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন মহাপাপ জ্ঞান করিয়া তাহা অমান্য করিতে পারিলেন না। খনা ইহার পূর্ব্বে গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তি হইয়াছে এবং তাঁহার এই রূপেই আয়ুঃশেষ হইবে। অতএব তাহাতে বিরক্তি ভাব প্রকাশ না করিয়া স্বামীকে জিহ্বা ছেদন করিতে দিলেন। মিহির খনার জিহ্বা ছেদন করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল।

খনার রচিত জ্যোতিষ সংক্রান্ত বচন।

গ্রহণ গণনা।

যেই মাসে যেই রাশি, তার সপ্তমে থাকে শশি।
যদি পায় পূর্ণমাসি, অবশ্য রাহু চাঁদে গ্রাসি॥

অস্যার্থঃ।

মেষে বৈশাখ, বৃষে জ্যৈষ্ঠ, ইত্যাদি ক্রমেতে মাসের রাশির সপ্তম স্থানে চন্দ্র থাকিলে যদি ঐ দিবসে পূর্ণিমা হয় তবে চন্দ্রগ্রহণ নিশ্চয়।

তিথি গণনা।

খালি ছাগলা, বৃষে চাঁদা, মিথুনে পূবিযা বেদা,
সিংহে বসু, কব কি বসে, আব সব পূবিবে দশে।

অস্যার্থঃ।

বৎসবেব মধ্যে কোন্ দিন কোন্ তিথি হয বা হইযাছিল তাহা জানা আবশ্যক হইলে, যে বৎসবেব তিথি জানিতে হইবে তাহাব প্রথম দিবস যে তিথি তাহাব অঙ্ক, অর্থাৎ প্রতিপদ্ ১, দ্বিতীযা হইলে ২, এই প্রকাব অমাবস্যা পর্য্যন্ত ৩০, ইহার যে তিথি হয সেই তিথিব অঙ্ক বাখিয়া তন্নিম্নে, যে দিনেব তিথি জানা আবশ্যক সেই দিনের অঙ্ক ও যে মাসে ঐ দিন সেই মাসেব অঙ্ক, অর্থাৎ বৈশাখ হইলে শূন্য, জ্যৈষ্ঠ হইলে ১, আষাঢ হইলে ৪, ভাদ্র হইলে ৮, তদ্ব্যতীত অন্য অন্য মাসে ১০ অঙ্ক বাখিয়া, উপবেব অঙ্কেব সহিত যোগ কবিবে; তাহাতে যদি ৩১ অঙ্ক পূর্ণ না হয় তবে যে অঙ্ক থাকিবে সেই অঙ্কেব তিথি প্রশ্নেব উত্তব হইবে। যদি একত্রিশেব অধিক হয তবে তাহাব নীচে ৩১ দিযা বাকী কাটিলে যে অঙ্ক থাকিবে সেই অঙ্কেব যে তিথি হয তাহাই উত্তব।

কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা কবিল, ১২৫৮ সালেব ৩১এ আষাঢ়ে কোন্ তিথি। অতএব ঐ সনের ১লা বৈশাখ

শুক্র দ্বাদশী, তাহার অঙ্ক	...	..		১২
দিন	..	...	.. ...	৩১
আষাঢ়ের		...	.. ..	৪
	ঠিক	...	...	৪৭
	বাদ	...	..	৩১

১৬ প্রতিপদ।

আর বাকির ঘরে শূন্য পড়িলে প্রথম ভাগ অমাবস্যা ও শেষ ভাগ প্রতিপদ হইবে।

নক্ষত্র গণনা।

মাস নখতা তিথি যুতা, ভা (২৭) দিয়া হরযে গুতা, আন্ধারে দশ, আলোতে এগার, ইহা দিয়া নক্ষত্র সার।

অস্যার্থঃ।

কোন্ দিবসে কি নক্ষত্র হয় তাহা জানিবার নিমিত্ত মাসের নক্ষত্রের অঙ্ক অর্থাৎ বৈশাখে বিশাখা (১৬), জ্যৈষ্ঠে জ্যেষ্ঠা (১৮), আষাঢ়ে পূর্ব্বাষাঢ়া (২০), শ্রাবণে শ্রবণা (২২), ভাদ্রে পূর্ব্বভাদ্রপদ্ (২৫), আশ্বিনে অশ্বিনী (১), কার্ত্তিকে কৃত্তিকা (৩), মার্গশীর্ষে মৃগশিরা (৫), পৌষে পুষ্যা (৮), মাঘে মঘা (১০), ফাল্গুনে পূর্ব্বফল্গুনী (১১), ও চৈত্রে চিত্রা (১৪), এবং দিবসের তিথির অঙ্ক রাখিয়া কৃষ্ণপক্ষ হইলে ১০, ও শুক্লপক্ষ হইলে ১১, যোগ করিয়া যে অঙ্ক

হইবে তাহাতে ২৭ বাদ দিয়া যে অঙ্ক থাকে সেই অঙ্কের নক্ষত্র ঐ দিবসে হইবে। খনার বচনের ভাবার্থ এই। কিন্তু এবম্প্রকার গণনার সাধারণ নিয়ম এই যে মাসের যে দিবসের নক্ষত্র জানিতে হইবে তাহা মাসের পূর্ব্বার্দ্ধে হইলে যোগকৃত অঙ্ক হইতে ১ বাদ দিতে হইবে, মাসের শেষার্দ্ধে হইলে ঐ অঙ্কে ১ যোগ করিতে হইবে, যথা ২৮এ ফাল্গুন সন ১২৫৮ সাল।

মাস নক্ষত্র—পূর্ব্বফল্গুনী	... .	১১
দিবসের তিথি—পঞ্চমী	.. .. ..	২০
কৃষ্ণপক্ষ	... ...	১০
		৪১
মাসের শেষার্দ্ধে	... .	১
		৪২
বাদ	... .	২৭
বাকী	.. ..	১৫ স্বাতি নক্ষত্র

জন্মকালীন কোষ্ঠীর ফল গণনা।

সূর্য্য কুজে রাহু মিলে, গাছের দড়ি বন্ধন গলে,
যদি রাখে তাকে ত্রিদশনাথ, তবু সে খায় নীচের ভাত।

অস্যার্থঃ।

জন্মকালীন কোষ্ঠীর কোন ঘরে রবি মঙ্গল আর রাহু একত্র থাকিলে তাহার অপমৃত্যু হয় অথবা সে নীচগামী হয়।

মৃত্যু গণনা।

আসিয়া দূত দাঁড়ায় কোণে, কথা কহে ঊর্দ্ধ নয়নে,
শিরে পৃষ্ঠে বুকে হাত, সেই দূতে পুছে বাত,
কুট ছিঁড়ে করে খাই, খনা বলে ফুরাল আই।

অস্যার্থঃ।

দূত কোন ব্যক্তির পীড়ার সংবাদ আনিয়া যদি বাটীর বা ঘরের কোণে দণ্ডায়মান হয়, বা ঊর্দ্ধ নয়নে কথা কহে, কিম্বা মস্তকে বা পৃষ্ঠে বা বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া থাকে, কিম্বা কুটি হস্তে ছিঁড়ে বা দন্তে চর্ব্বণ করে, তবে রোগীর মৃত্যু নিশ্চয়।

মৃত্যু পরীক্ষা।

সভার মধ্যে যে জন ভণে, তার মুখে যয় জন শুনে।
তিথি বার করিয়া এক, সাতে হরিয়া আয়ু দেখ,
দুই চারি কিম্বা ছয়, এ রোগী জীবার নয়,
এক তিন কিম্বা বাণ, যমঘর হতে টানিয়া আন,
অঙ্ক শূন্য পায় যবে, নিশ্চয় রোগী মরিবে তবে।

অস্যার্থঃ।

কোন ব্যক্তি কাহার পীড়ার সংবাদ কহিলে সভার মধ্যে ঐ সংবাদ যে কয়েক জন শ্রবণ করে তাহার সংখ্যা একত্র করিয়া তাহাতে তিথি ও বারের অঙ্ক যোগ করিয়া ৭ দিয়া হরণ করিলে, ২। ৪। ৬ থাকিলে

মৃত্যু সম্ভাবনা, ১। ৩। ৫ থাকিলে আরোগ্য হইবে, শূন্য থাকিলে নিশ্চয় মৃত্যু।

স্ত্রী পুরুষের অগ্র পশ্চাৎ মৃত্যু গণনা।

অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা, নামে নামে করি সমতা,
এক শূন্যে মরে পতি, দুয়ে মরে ঘরযুবতি।

অস্যার্থঃ।

স্ত্রী পুরুষ উভয়ের নামের অক্ষর গণনা করিয়া তাহাকে দ্বিগুণ করিয়া ঐ দ্বিগুণকৃত অঙ্ককে চতুর্গুণ করিয়া উভয় অঙ্ক যোগ করিবে, তাহার পর তাহাকে ৩ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ ও শূন্য থাকে তবে পতির মৃত্যু অগ্রে হয়, ২ থাকিলে স্ত্রী অগ্রে মরে।

দৃষ্টান্ত।

পতির নাম রামচন্দ্র ৪ অক্ষর
স্ত্রীর নাম মোহিনী ৩ অক্ষর

	দ্বিগুণ।	চতুর্গুণ।	মোট।
৭,	১৪	৫৬	৭০
৩ দ্বারা হরণ করিলে			৬৯
বাকি..			১

অতএব স্বামী অগ্রে মরিবে বা মরিয়াছে।

যাত্রার দিন গণনা।

তিথি বার নক্ষত্র মাসের যত দিন।
একত্র করিয়া সব সাতে কর হীন॥
একে, শুভ দুয়ে লাভ, তিনে শত্রুক্ষয়।
চতুর্থেতে কার্য্যসিদ্ধি, পঞ্চমে সংশয়॥
ষষ্ঠেতে মরণ হয়, শূন্যে হয় সুখ।
এ দিনে করিলে যাত্রা কভু নহে দুখ॥

অস্যার্থঃ।

যাত্রা করিতে হইলে তিথি বার ও নক্ষত্রের অঙ্ক ও মাসের যে তারিখ হয় তাহা সকল একত্র যোগ করিয়া ৭ দ্বারা হরণ করিবেক, তাহাতে ১। ২। ৩। ৪ বাকি থাকিলে গমনে মঙ্গল, ৫ থাকিলে সংশয়, ৬ থাকিলে মৃত্যু, শূন্য থাকিলে সুখ। যথা—

দশমী তিথি	১০
পুষ্যা নক্ষত্র	৮
রবিবার	১
ফাল্গুন মাসের	১৬
	৩৫
৭ দ্বারা হরণ	৩৫
	সুখং।

গর্ভের সন্তান পরীক্ষা।

স্বাণের পৃষ্ঠে দিয়া বাণ, পেটের ছেলে গণে আন।
নামে মাসে করে এক, সাতে হরে সন্তান দেখ।
এক তিন থাকে বাণ, তবে নারীর পুত্র জান।
দুই চারি থাকে ছয়, অবশ্য তার কন্যা হয়।
যদি থাকে শূন্য সাত, তবে নারীর গর্ভপাত।

অস্যার্থঃ।

গর্ভের সন্তান পরীক্ষা করিতে হইলে, প্রথমে ৫৫ রাখিয়া গর্ভবতীর নামে যে কয়েক অক্ষর হয় তাহা ও গর্ভের সঞ্চার অবধি জিজ্ঞাসা করিলে যে কয়েক মাস হইয়া থাকে তাহার অঙ্ক একত্র করিয়া ৭ দ্বারা হরণ করিলে যদি ১।৩।৫ থাকে তবে পুত্র, ২।৪।৬ থাকিলে কন্যা, এবং ৭ বা শূন্য থাকিলে গর্ভপাত হয়। যথা—

সঙ্কেতাঙ্ক	৫৫
নাম রামরঙ্গিণী	৫
কাল ৪ মাস	৪
ঠিক	৬৪
৭ দ্বারা হরণ	৬৩
বাকি	১ পুত্র

ঐ বিষয়ের অন্য প্রকার পরীক্ষা।

গ্রাম গর্ব্বিণী ফলে যুতা, তিন দিয়া হর পুতা।
একে সুত, দুয়ে সুতা, তিন হইলে গর্ব্ব মিথ্যা।
এ কথা যদি মিথ্যা হয়, সে ছেলে তার বাপের নয়।

অস্যার্থঃ।

গর্ভবতীর নামে ও যে গ্রামে বাস করে তাহার নামে যে কয়েক অক্ষর হয় তাহার অঙ্ক এবং একটা ফলের নাম করিয়া ঐ নামে যে কয়েক অক্ষর তাহার অঙ্ক এই সমুদয় একত্র করিয়া ৩ দ্বারা হরণ করিয়া, ১ থাকিলে পুত্র, ২ থাকিলে কন্যা হইবে।

যথা।

বরানগর	৫
প্রসন্নময়ী	৫
দাড়িম্ব	৩
	১৩
৩ দ্বারা হরণ	১২
বাকি	১ পুত্র।

আয়ুর্গণনা।

কিসের তিথি কিসের বার, জন্ম নক্ষত্র কর সার।
কি কর শ্বশুর মতিহীন, পলকে জীবন বার দিন॥

অস্যার্থঃ।

কোন ব্যক্তির পরমায়ু নিরূপণ করিতে হইলে

তাঁহার জন্মকালীন যে নক্ষত্র হয় জন্মকালাবধি ঐ নক্ষত্রের স্থিতি পর্য্যন্ত যে কাল থাকে তাহাকে পল করিয়া, প্রত্যেক পলে ১২ দিবস ধরিলে যত দিবস হয় তাহাই তাহার আয়ুর পরিমাণ। যথা।

চিত্রা নক্ষত্র জন্মকাল হইতে স্থিতি কাল পর্য্যন্ত ৭ দণ্ড।

৭ দণ্ডকে ৬০ দ্বারা পল করিলে ... ৪২০ পল,
প্রত্যেক পলে ১২ দিবস করিয়া ৫০৪০ দিন
৫০৪০ দিবসে .. .. .. ১৪ বৎসর পরমায়ু।

যাত্রার দিবস।

দ্বাদশ অঙ্গুলি কাঠি, সূর্য্যমণ্ডলে দিয়া দিঠি।
রবি কুড়ি সোমে শোল, পঞ্চদশ মঙ্গলে ভাল।
বুধ বৃহস্পতি এগার বার, শুক্র শনি চৌদ্দ তের।
হাঁচি জেঠি পড়ে যবে, অষ্ট গুণ লভ্য হবে।

অস্যার্থঃ।

আপন অঙ্গুলির দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ এক কাঠি সূর্য্যমণ্ডলে স্থাপন করিয়া ঐ কাঠির ছায়া রবিবারে কুড়ি অঙ্গুলি, সোমবারে শোল, মঙ্গলবারে পনর, বুধবারে এগার, বৃহস্পতিবারে বার, শুক্রবারে চৌদ্দ, ও শনিবারে তের অঙ্গুলি পড়িলে যাত্রা, তাহাতে হাঁচি টিক্‌টিকি কিছুতে কর্ম্মের ব্যাঘাত করিতে পারিবেক না, বরঞ্চ তাহাতে লাভ হবে।

গৃহের শুভাশুভ গণনা।

দীর্ঘে প্রস্থে যত পাই, এক মিশাইয়া তাতে চাই।
বেদে হরে থাকে শশি, ভাঙ্গা ঘর উঠে বসি।
বেদে হরে থাকে দুই, আগে ভাল পাছে রুই।
বেদে হরে থাকে তিন, সে গৃহে না লাগে ঋণ।
বেদে হরে থাকে শূন্য, নাহি পাপ নাহি পুণ্য।

অস্যার্থঃ।

গৃহ প্রস্তুত করিতে হইলে হস্ত দ্বারা দীর্ঘ প্রস্থ মাপিয়া তাহার সহিত ১ যোগ করিয়া চারি দিয়া হরণ করিলে, ১ থাকিলে মঙ্গল, ২ থাকিলে প্রথম লাভ, পশ্চাৎ মন্দ, ৩ থাকিলে ঋণগ্রস্ত হয় না, শূন্য থাকিলে ভাল মন্দ কিছু হয় না। যথা

দীর্ঘ	২০ হস্ত
প্রস্থ	১৪ হস্ত
	৩৪
	১ যোগ
ঠিক	৩৫
৪ দ্বারা হরিলে	৩২
বাকী	৩ অঋণী

অহল্যাবাই।

নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ সমস্ত প্রদেশকে দক্ষিণ দেশ কহা যায়, দ্রাবিড, কর্ণাট, ত্রৈলঙ্গ এবং মহারাষ্ট্র তাহার মধ্যবর্ত্তী। সেতুবন্ধ রামেশ্বর অবধি মান্দ্রাজের উত্তর পর্য্যন্ত দ্রাবিড, সে দেশের ভাষা তামল। দ্রাবিডের উত্তর এবং উড়িস্যার দক্ষিণ দেশকে ত্রৈলঙ্গ বলা যায়। চন্দ্রাদ্রি অবধি কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র দেশ, এ দেশের ভাষা মহারাষ্ট্রী।

এদেশীয় লোকেরা যে প্রকার বীর্য্যবান ও পরাক্রমশালী ছিল তাহা লেখা বাহুল্য। বর্গিদের ভয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ যেরূপ কম্পিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই বিশেষরূপ জ্ঞাত আছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাহারা সমস্ত ভারতবর্ষের করগ্রাহী হইয়াও ধনগর্ব্বিত কিম্বা ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত কুত্রাপি হয় নাই। শুনা যায় দক্ষিণ রাজ্যে যৎকালে মহারাষ্ট্রীয়েরা অত্যন্ত উপদ্রব করে তখন তদ্দেশীয় যবন রাজা অত্যন্ত ভীত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট অভয় প্রার্থনা জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দূত বহুতর অশ্ব, গজ, পদাতিক ও নানাবিধ বসন ভূষণাদিতে সুসজ্জিত

হইয়া অতি বড় প্রাগল্‌ভ্যে সৈন্যাধ্যক্ষের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি এক বৃক্ষজটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া ঐ বৃক্ষমূলে উপবেশন পূর্ব্বক চেলাঞ্চলস্থিত সলিলার্দ্র কতকগুলিন চনক ভক্ষণ করিতেছেন। কিন্তু সেই সামান্য বেশে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষরিত করাতে মণি মাণিক্যে শোভিত হস্তী অশ্ব পদাতিক বেষ্টিত কত কত নৃপতির প্রাণ রক্ষা হইল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের ধর্ম্মপরতার বিষয় কি কহিব। মহারাজ শিবজীর চরিত্রেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। শিবজী প্রবল শত্রুতে বেষ্টিত ও সতত যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত হইয়াও দিবাবসান সময়ে কথক-দিগের মুখে মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি পুরাণোক্ত ইতিহাস শ্রবণে কখন ক্ষান্ত থাকিতেন না। অদ্যা-পিও দেখা যায় মহারাষ্ট্র দেশীয়েরা অন্যান্য দেশীয় লোক অপেক্ষা ধর্ম্মাচরণে অধিক রত।

মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকেরা এদেশীয় স্ত্রীদিগের ন্যায় গৃহ-পিঞ্জরে বদ্ধা নহেন। যাঁহারা বোম্বাই রাজধানী দেখিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই ইহা সুন্দররূপ জানেন। তারাবাই, সূর্য্যবাই, অহল্যাবাই প্রভৃতি অঙ্গনাগণ রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি যবন কুলোদ্ভব কবীরদাস, যাঁহার নাম জগদ্বিখ্যাত ও যাঁহার বিরচিত দোহা সকলেই জানেন, তিনি মহারাষ্ট্র

দেশে যেরূপ সাধুশব্দে বিখ্যাত, কানুপুত্রা নাম্নী এক রমণীও তত্তুল্য বিখ্যাতা ছিলেন। একদা বর্গিদিগের ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর কলিকাতাস্থ ইংলণ্ডীয় বণিকেরা অভয় প্রার্থনার্থে মহারাষ্ট্রীয় রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। দূত রাজার কেলি উদ্যান দর্শন করিতে গিয়া দেখিলেন, পট্টমহিষী সেই রমণীয় স্থানে অতি-বড় দুরন্ত এক অশ্বকে শিক্ষা দিতেছেন। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের ইতিহাস যৎকিঞ্চিৎ কহিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

জনশ্রুতি আছে, ভগবান্ পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগের হস্ত হইতে এই দেশ জয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। তাহাতে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ঐ স্থানে বাস করিতে নিষেধ করাতে তিনি সমুদ্রের নিকট ভূমি যাচ্ঞা করিয়া লন। ঐ ভূমিকে পরশুরাম-ক্ষেত্র কহিত। এক্ষণে তাহা কণকান নামে বিখ্যাত। অতি প্রাচীন কালে মহারাষ্ট্রদেশে গুর্শি নামে এক বন্যজাতি মনুষ্য বাস করিত, পুরাণে ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহাতে লেখে যে গোদাবরী এবং কাবেরীর মধ্যস্থিত দণ্ডকারণ্য রাবণের অধিকার ছিল, এবং তিনি রামজ্রী নামে এক বানাকর জাতিকে ঐ ভূমি দান করেন। বহুকাল পরে ওগরা নামে নগর এই দেশে অতি প্রসিদ্ধ ছিল, এবং শ্রুত আছে যে মিসর এবং যবন দেশ হইতে বণিকেরা এই স্থানে

বাণিজ্যার্থে আসিতেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে শালিবাহন নামে কুম্ভকারজাতি এক ব্যক্তি দৈববলে অত্যন্ত প্রতাপান্বিত হইয়া এই সমস্ত দেশ অধিকার করেন, এবং ওগরা হইতে রাজধানী উঠাইয়া প্রতিষ্ঠান নামক এক নগরে রাজধানী করেন। শালিবাহনের পূর্ব্বে কোশল অর্থাৎ অযোধ্যা দেশীয় সূর্য্যবংশোদ্ভব শিশুদেব নামক এক রাজা এই দেশের অধিপতি ছিলেন। শালিবাহন তাহাকে সবংশে বিনাশ করিলেন, কেবল একটি স্ত্রীলোক তাহার শিশু সন্তান লইয়া বিন্ধ্যাগিরির মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ রক্ষা পাইলেন। চিতোর এবং উদয়পুরের রাজারা সেই বংশোদ্ভব এবং মহারাষ্ট্রীয়েরাও সেই বংশীয়।

শালিবাহন অবধি যাদোরাও ও দেবরাও পর্য্যন্ত যে সকল রাজা ছিলেন তাঁহাদিগের কোন বৃত্তান্ত লিখিত নাই। যখন মুসলমানেরা মহারাষ্ট্র দেশ জয় করে তখন, যাদোরাও দেবরাও এ দেশের অধিপতি ছিলেন। মুসলমানদিগের সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দের প্রাদুর্ভাব অধিক ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্রীয় রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু সকলই মুসলমানদিগের অধীন এবং করপ্রদ ছিলেন। শিবজী অবধি মারহাট্টাদিগের শ্রীবৃদ্ধি।

মেওয়ার ইতিহাসে লিখিত আছে শিবজী চিতোর

রাজার বংশোদ্ভব। শিবজীর পিতা সাহজী মুসলমান দিগের কিয়দংশ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। সাহজী পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এক দিবস তাঁহার পিতার সহিত দোলযাত্রা উপলক্ষে যাদবরাও নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আলয়ে গিয়াছিলেন। যাদবরাওর কন্যা জিজি তৎকালে তিন বৎসর বয়স্কা ছিলেন। যাদবরাও সাহজীর সহিত জিজিকে ক্রীড়াসক্ত দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন কেমন জিজি তুমি এই বালকটিকে বিবাহ করিবে। অনন্তর সভাস্থদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন দেখ দেখি এই দুটিতে কেমন সাজিয়াছে। সাহজীর পিতা মন্যজী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে সাক্ষী, যাদবরাও আমার পুত্রকে কন্যা দান করিলেন। কিন্তু মন্যজী অপেক্ষা যাদবরাও অধিক কুলীন ছিলেন, এ নিমিত্ত বিবাহ হওয়া অতি দুষ্কর হইয়া উঠিল। দৈব নির্ব্বন্ধে মন্যজী ত্বরায় ধনবান্ হইলেন, এবং অনেক দেব-মন্দির জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং মুসলমান ভূপতিকে অর্থ প্রদান করিয়া আপন বংশের সম্মান বৃদ্ধি করাতে যাদবরাও সাহজীকে কন্যা দান করিলেন। বিবাহ কালে বাদশাহ আপনি সভারূঢ় হইলেন।

জিজিবাইয়ের গর্ভে সাহজীর শম্ভুজী এবং শিবজী

নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। পরে সাহজী আর এক বিবাহ করাতে জিজিবাই আপন দুই পুত্র লইয়া পুনা-নগরে বাস করিলেন। সেই স্থানে সাহজীর কিঞ্চিৎ বৃত্তি ছিল, দাদজী কলিদেব নামে এক ব্রাহ্মণ সেই বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, তিনিই শিবজীকে বিদ্যাভ্যাস করাইতেন। বাল্যকালাবধি শিবজীর ধর্ম্ম-শাস্ত্রে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল, এবং মুসলমানদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি ঘৃণা ছিল। শিবজী বাল্যকালাবধি অত্যন্ত সাহসিক ছিলেন। তিনি ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমে তিন জন বয়স্যের সহিত কথোপকথন কালে কহিতেন যে আমি স্বাধীন রাজা হইব। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া দাদজী অনেক নিবারণ করিতেন, কিন্তু শিবজী তাহাতে কর্ণপাতও করিতেন না।

শিবজী প্রথমতঃ দস্যুবৃত্তি করিতেন এবং এই প্রকারে তুণা নামে দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার উপদ্রবে মুসলমান রাজপুরুষেরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন এবং তন্নিবারণার্থে তাঁহার পিতা সাহ-জীকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। শিবজী পিতার কারা-মোচন জন্য মুসলমানদিগের পদানত হইবার মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী সহিবাই তাহা করিতে দিলেন না। অনন্তর শিবজী সাহজাহান বাদশাকে কয়েক পত্র লিখেন। তাহাতে বাদশাহ

তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপন সৈন্যমধ্যে নিযুক্ত করেন, এবং শিবজীকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্যের অধিপতি করেন।

অনন্তর আলমগীরের সময়ে শিবজীর এতাদৃশ পরাক্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তিনি মুসলমানদিগের সুরাট নামে প্রধান বন্দর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। আর তিনি মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদিগকে এমত সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন যে ক্রমে তাহারা বর্গি নামে বিখ্যাত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল, এবং মুসলমান ভূপতিদিগের নিকট বল-পূর্ব্বক চৌথ গ্রহণ করিতে লাগিল।

শিবজীর মৃত্যু হইলে প্রধান মন্ত্রী তাঁহার পুত্র রাজারামকে সিংহাসনে বসাইলেন, কিন্তু শম্ভুজী অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাইগড়ে কারারুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক আপনি রাজা হইলেন, এবং অতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া সূর্য্য রাইয়ের প্রাণদণ্ড করিলেন। শম্ভুজী যুদ্ধ বিক্রমে ম্লান ছিলেন না, কিন্তু অত্যন্ত ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত ছিলেন। মারহাট্টারা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না বটে, কিন্তু যখন আলমগীর বাদসাহ তুলাপুর নগরে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন তখন তাহারা শিবজীর পুত্রের এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া অধিকতর রুষ্ট হইয়া মুসলমানদিগের অনিষ্ট চেষ্টা আরম্ভ করিল। পরে

রাজারাম সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া সেতারাতে রাজ-ধানী করিলেন, এবং বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া খন্দেশ, গঙ্গোত্রী, বেহার প্রভৃতি দেশ লুণ্ঠন করিয়া চৌথ গ্রহণ করিলেন। রাজারাম অতি বিশুদ্ধ স্বভাব, সুশীল এবং দাতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী তারা-বাই তাঁহার শিশু সন্তান শিবজীর নামে রাজ্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মারহাট্টারা বেহার আক্রমণ করে এবং আলমগীর বাদসাহের মৃত্যু হয়।

আলমগীরের মৃত্যু হইলে শম্ভুজীর পুত্র শিবজী (যিনি আলমগীরের কন্যা বেগম সাহেবের প্রতি-পালিত ছিলেন এবং যাঁহাকে আলমগীর সাহো নাম দিয়াছিলেন) মহারাষ্ট্র অধিকার করিতে আসি-লেন। এবং সেতারা অধিকার করিয়া রাজটীকা প্রাপ্ত হইলেন। অল্পকাল মধ্যে তারাবাইয়ের পুত্র শিব-জীর মৃত্যু হইল। তাহাতে রাজারামের দ্বিতীয় স্ত্রীর পুত্র শম্ভুজী সেই পদ প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ তারা বাইয়ের প্রভুত্ব শেষ হইল এবং শম্ভুজী তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। তারাবাইয়ের রাজধানী কাণ-পুরে ছিল। মারহাট্টা দেশে এককালে দুই জন রাজা হওয়াতে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে মারহাট্টাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ বাজীরাও দিল্লীর নিকটস্থ স্থান সকল লুঠ করেন। পারস্যের অধিপতি

নাদের সাহো ঐ সময়ে দিল্লী অধিবার করিয়া নানা-বিধ দৌরাত্ম্য করেন।

বাজীরাও অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার নামে পৃথিবী কম্পমান হইত। তাঁহার সৈন্য মধ্যে মলহরজী হুলকার সেনেদার ছিলেন। তিনি শূদ্রকুলোদ্ভব, তাঁহার বাসস্থান হোহন গ্রামে নীরা নদীর তীরে ছিল। তাঁহার পিতা সেই গ্রামে চৌগুনা অর্থাৎ পাত-নের সহকারী ছিলেন। এই মলহরজী অবধি মহারাষ্ট্র দেশে হুলকার বংশের আধিপত্য হয়। যৎকালে ভাস্করপান্থ বাঙ্গলা লুঠ করেন এবং আলীবর্দ্দি খাঁর সহিত নানাবিধ যুদ্ধ প্রকাশ করেন, সেই সময়ে মলহর গুজরাটে সেইরূপ লুঠ করিতে ছিলেন। এই মলহরজী দিল্লীশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দ্বিতীয় আলম্-গীরকে সিংহাসনারূঢ় করিয়াছিলেন। ইহাও কথিত আছে যে তাঁহার সহায়তাতে মীর সাহেবুদ্দীন বাদসা-হকে বদ্ধ করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছিল। কিছু দিন পরে মহারাষ্ট্র সেনাপতি রঘুনাথ রাও লাহোর এবং মুল-তান প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু অহমদসাহ দুরাণী কাবুল হইতে আসিয়া পানিপতের যুদ্ধক্ষেত্রে হুলকার প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে পরাভূত করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের বলের হ্রাস করিলেন।

মলহর রাও মালব প্রদেশ বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া

ঐ প্রদেশের প্রথম রাজা হইয়াছিলেন, এবং তিনি অনেক রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য রাখিয়া ৪৮৬৮ কলিগতাব্দে (ইং ১৭৬৭) পরলোক গমন করেন। ঐ রাজার এক মাত্র পুত্র ছিলেন, তাহার নাম কণ্ডীরাও। তিনি পিতা বর্ত্তমান থাকিতেই জাঠ নামক জাতীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ভরতপুরের সান্নিধ্যে কুম্ভীর গিরির নীচে শত্রু কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন। অহল্যাবাই কণ্ডীরাও-য়ের ভার্য্যা। তিনি প্রথম কালাবধি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ও ব্রাহ্মণভক্তা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসনের ধারা অতি সুন্দর ছিল। অতএব তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত নিম্নে লেখা যাইতেছে।

অহল্যাবাইয়ের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন। পুত্রের নাম মালিরাও। তিনি পিতামহের পরলোকান্তে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু নয় মাস রাজ্য ভোগ করিয়াই লোকান্তর গত হন। মালিরাও স্বভাবতঃ ক্ষীণজীবী ও চঞ্চলবুদ্ধি ছিলেন। কিন্তু রাজ্য প্রাপ্তির পর অবধি তিনি অত্যন্ত অহিতাচারী হইয়াছিলেন, এবং কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার বুদ্ধির বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য প্রকাশ হইয়াছিল। বিশেষতঃ তিনি তাঁহার মাতার ধর্ম্মকর্ম্মাদিতে দ্বেষ করিতেন, এবং যে সকল ব্রাহ্মণেরা তাঁহার মাতার দয়ার পাত্র ছিলেন তাঁহাদিগকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে দানার্থ যে বস্ত্র

ও পাদুকা উৎসর্গ করা যাইত, তন্মধ্যে বৃশ্চিক ও জল-পাত্রের মধ্যে সর্প পূরিয়া তাহার উপরি ভাগে মুদ্রা রাখিয়া দিতেন। ব্রাহ্মণেরা লোভাবিষ্ট হইয়া ঐ সকল দ্রব্যাদি গ্রহণ করিলে ঐ জন্তু সকল তাহাদিগকে দংশন করিত, ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত যাতনা পাইতেন। মালিরাও তাহাতে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া আহ্লাদিত হইতেন।

অহল্যাবাই পুত্রের তদ্রূপ কুরীতি দেখিয়া অহরহঃ রোদন করিতেন, কখনং এই বলিয়া বিলাপ করিতেন, এমন অসৎ পুত্রকে কেন গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, পুত্রের দুর্নীতি ও কাপুরুষত্ব দেখিয়া অহল্যাবাই তাঁহাকে ঔষধের দ্বারা ক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু এ অনুমান নিতান্ত অমূলক। তাঁহার বুদ্ধিচাঞ্চল্য হইবার প্রকৃত কারণ এই, তিনি এক স্বর্ণকারকে কোন বিষয়ে অপরাধী অনুমান করিয়া ক্রোধবশতঃ সংহার করিয়াছিলেন। পরে অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছিলেন যে স্বর্ণকার নিরপরাধী তাহার কোন দোষ ছিল না, ইহাতে অন্তঃকরণে অত্যন্ত অনুতাপ জন্মিয়া, ঐ শোকে তাঁহার এমন বুদ্ধি-ভ্রংশ হইল যে অবশেষে তিনি উন্মাদাবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

এরূপও জনশ্রুতি আছে, মালিরাও যে স্বর্ণকারকে

সংহার করিয়াছিলেন সে ব্যক্তি দেবানুগৃহীত ছিল এবং যখন তিনি তাহার প্রাণ দণ্ড করেন তখন সে তাঁহাকে এই কথা বলিযাছিল, আমি নিবপরাধী, আমাকে নষ্ট কবিও না, তাহা কবিলে আমি তোমাব প্রতিফল দিব। অতএব যখন মালিবাও উন্মত্ত হইলেন তখন সকলেই এই মনে করিলেন, ঐ স্বর্ণকাব ভূতযোনি প্রাপ্ত হইযা তাঁহাব শবীবে আবির্ভূত হইয়াছে। সুতবাং অহল্যাবাই তাহাই প্রকৃত জানিযা অহবহঃ তাঁহাব শয্যাতে বসিযা বোদন করিতেন, এবং ভূত ছাড়াইবাব জন্য নানা প্রকাব স্বস্ত্যয়ন, হোম ও অর্চ্চনা কবিতেন। আব ঐ উপদেব তাঁহাকে অধিক যন্ত্রণা না দেয এজন্য তাহাকে সর্ব্বদাই এই কথা বলিয়া স্তব কবিতেন, হে উপদেব! তুমি আমাব পুত্রেব দেহ পবিত্যাগ কব, আমি তোমাব নিমিত্ত এক মন্দিব নির্ম্মাণ কবিয়া দিতেছি, এবং তোমার পবিবাবেব ভবণ পোষণার্থ একখান গ্রাম দিব। কিন্তু এই সকল কবিয়াও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। কোন কোন লোক ইহাও বলিয়া থাকে উপদেবেব স্তবেব পব অহল্যাবাই শুনিতে পাইতেন শূন্য হইতে তাঁহাকে কেহ যেন এই প্রকাব বলিতেছে, তোমার পুত্র আমাকে বিনা দোষে বিনাশ করিয়াছে, অতএব আমি তাহাকে কখন ক্ষমা কবিব না, আমি তাহার প্রাণ লইব।

সুতরাং পুত্রের আরোগ্য হইবার আশা ছিল না, তথাপি অহল্যা রাণী অনেক দৈব কর্ম্ম ও অন্যান্য উপায় করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু কোন রূপেই তাঁহার বাতুলতা ত্যাগ হইল না, মালিরাও ঐ রোগে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

সন্তান বিয়োগে রাণীর কি পর্য্যন্ত শোক হইল তদ্বর্ণন বাহুল্য। বিশেষতঃ রাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিল না, কেননা তাঁহার যে এক কন্যা ছিলেন তাঁহার অন্যত্র বিবাহ হওয়াতে হিন্দু-শাস্ত্র মতে সহোদরের রাজ্যে তাঁহার অধিকার ছিল না। সুতরাং পুত্রের মরণান্তে সিংহাসন শূন্য হইলে, অহল্যাবাই স্বয়ং রাজ্ঞী হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন, এবং রাজকর্ম্মে যেরূপ বিচক্ষণতা, সদ্গুণ ও সাহস প্রকাশ করিলেন এবং জনপদের মঙ্গলার্থ যে যে কীর্ত্তি করিলেন তাহাতে জীবদ্দশায় তাঁহার অত্যন্ত গৌরব হইল, মরণান্তেও পুরুষানুক্রমে তাঁহার নাম জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

অহল্যা রাজ্য-ভার গ্রহণ করিলে গঙ্গাধর যশবন্ত নামে রাজপুরোহিত তাঁহার প্রতিবাদী হইলেন। তিনি জানিতেন অহল্যা পরবুদ্ধির বাধ্য ছিলেন না, এবং তিনি রাজ্য শাসন করিলে তাঁহার নিজের কোন আধিপত্য থাকিবে না। অতএব তিনি তদ্বিষয়ে

তাঁহাকে ক্ষান্ত করিবার জন্য, স্ত্রীজাতির রাজকর্ম্মের ভার গ্রহণ করা অবিধি এবং তাহা হইলে পূর্ব্ব পুরুষ-দিগের পিণ্ড ও বংশ লোপ হইবে, এই সকল কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে পালক পুত্র রাখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কেননা তাহা হইলে বালক রাজার গুরু হইয়া তিনি আপনিই রাজত্ব করেন, বরঞ্চ তৎকর্ম্মে তাঁহার অনায়াসে প্রবৃত্তির জন্য তাঁহাকে এক স্বতন্ত্র দেশ অর্থাৎ বৃত্তি দিবার প্রস্তাব করিলেন, এবং রাঘবদাদা নামে মহারাষ্ট্রীয় রাজার পিতৃব্য এ বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিবেন বলিয়া উপায়ন স্বরূপ তাঁহাকে অনেক ধন উৎকোচ দিতে স্বীকার পাইলেন। রাঘবদাদাও অহল্যাকে পালক পুত্র রাখার বিষয় অনুরোধ করিতে অঙ্গীকার করি-লেন। গঙ্গাধর ইহাও মনে করিলেন, যে যদিও অহল্যাবাই সহজে পালক পুত্র না রাখেন বলে বা কৌশলে তাঁহাকে পালক পুত্র রাখাইব।

কিন্তু অহল্যা গঙ্গাধরের ষড়যন্ত্রে ভীত না হইয়া তাহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে স্পষ্ট কহিলেন আমি এক রাজার গৃহিণী, ও আর এক রাজার জননী ছিলাম, আমার পুত্রের পরলোক গমনে যখন মলহর-রাওয়ের বংশ লোপ হইল এবং আমি পতি পুত্র হীনা হইলাম, তখন পরপুত্রকে রাজ্য দিয়া বংশ রক্ষা করা

মিথ্যা, অতএব তাহা করি, কিম্বা না করি, আমার ইচ্ছা, তদ্বিষয়ে তোমাদের উপবোধ অনাবশ্যক। রাঘবদাদা অর্থলোভে পুরোহিতের বাক্যে তাঁহার অহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এজন্য তাঁহাকেও যথোচিত তিরস্কার করিলেন।

অনুমান হয় অহল্যাবাই, স্বীয় পারিষদ এবং তৎকালে মহারাষ্ট্র দেশের যে যে প্রধান প্রধান লোক মালব প্রদেশে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের পরামর্শে এই উত্তর দিয়াছিলেন। যাহা হউক অহল্যার সাহসকে প্রশংসা করিতে হইবে, ঐ সাহস রাজ্যরক্ষার মূল, নতুবা তাহা একবারে ছার খার হইত।

অহল্যার উত্তরে রাঘব রাগ প্রাপ্ত হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করণার্থ সংগ্রাম সজ্জা করিতে লাগিলেন। অহল্যাবাই এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনর্থক বিবাদ করিও না, তাহাতে সমূহ অযশ, কিছুমাত্র পৌরুষ নাই। কিন্তু একথা বলিয়াই যে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিলেন এমত নহে, তিনি আপনিও যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন, এবং হুল্লকার সেনাগণও তাঁহার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে সাতিশয় আমোদ প্রকাশ করিল। পরন্তু তিনিও স্বয়ং সংগ্রামে যাইবেন তজ্জন্য আপন হস্তী ও ধনু ও তূণ সকল সজ্জিত করিয়া প্রস্তুত হইয়া

থাকিলেন। ইহাতেও রাঘব নিবস্ত হন নাই, কিন্তু তাঁহার পারিষদ লোক তাহাতে পরাঙ্মুখ হইল এবং মাতাজী সিন্ধিয়া জানজী ভোঁশলা তাহার এই অকৃতজ্ঞতার কর্ম্মে তাহার সহায়তা করিলেন না। অধিকন্তু অহল্যাবাই মহারাষ্ট্রাধিপতি মধুরাওকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে ঐ রাজা স্বীয় পিতৃব্যকে লিখিলেন যে অহল্যার প্রতি কোন অহিতাচরণ না করেন। এই আজ্ঞা রাঘবকে অবশ্য মান্য করিতে হইল। সুতরাং যুদ্ধ বিগ্রহ হইল না, এবং প্রথম রাজ্যভার গ্রহণানন্তর অহল্যাবাই এই প্রকার সাহস প্রকাশ করাতে ঐ সাহস রাজ্যোন্নতির প্রধান কারণ হইল।

এই ব্যাপারের পর অহল্যাবাই তকাজী হুলকার নামক তদ্বংশীয় এক প্রধান ব্যক্তিকে সেনাপতি করিলেন। তকাজী যুদ্ধে অতি পারগ ছিলেন, এবং তাঁহার অন্তঃকরণ অতি নির্ম্মল ছিল। এই ব্যক্তি সেনাগণের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া পুনাতে গমন করিলেন। তদনন্তর অহল্যাবাই গঙ্গাধরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন।

এই দুই ব্যক্তির প্রতি যে যে কর্ম্মের ভারার্পণ ছিল তাহাতে তিলার্দ্ধ কালের নিমিত্ত উভয়ের সম্প্রীতি থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু অহল্যা রাণী

তাহাদের কর্ম্ম বন্টন করিয়া দিয়া তাহাদের বিবাদের মূল একেবারে উচ্ছেদ করিলেন। এবং ১৭৬৫ অবধি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে ত্রিশ বর্ষ তিনি রাজ্য করিয়া ছিলেন তন্মধ্যে তাহাদের কোন বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই। তকাজী প্রথমতঃ কেবল সেনাপতি ছিলেন, পরে তাঁহার প্রবীণত্ব জন্মিলে অহল্যাবাই তাঁহাকে রাজ্যের আর আর কর্ম্মের ভার দিলেন। তকাজী অহল্যাবাইকে মাতার ন্যায় মান্য করিতেন।

তকাজী রাজধানীতে প্রায় থাকিতেন না, তিনি একাদিক্রমে দক্ষিণ প্রদেশে দ্বাদশ বৎসর বাস করেন। শাতপুরা নামক পর্ব্বতের দক্ষিণে হুলকারাধীন যে সকল দেশ ছিল তাহার করাদি সংগ্রহ করিতেন। ঐ পর্ব্বতের উত্তরে যে সকল রাজ্য ছিল অহল্যাবাই মহীশূর রাজধানীতে থাকিয়া তাহার রাজস্ব গ্রহণ ও তৎসম্পর্কীয় অন্য অন্য রাজকর্ম্ম স্বয়ং সম্পাদন করিতেন। তদনন্তর যখন ঐ তকাজী হিন্দুস্থানে ছিলেন তখন তিনি বুন্দলখণ্ড ও হিন্দুস্থানের আর যে সকল দেশ জয় হইয়াছিল, তাহার রাজস্ব ও রাজপুতনার রাজস্ব আদায় করিতেন। মালব নিমাড় ও দক্ষিণ অঞ্চলস্থ সকল রাজ্যের কর অহল্যাবাইয়ের নিকট আসিত। তিনি ঐ সকল দেশের রাজ্যসম্পর্কীয় কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতেন।

কথিত আছে, হুলকার রাজাদের রক্ষিত অনেক ধন অর্থাৎ দুই কোটি টাকা অহল্যাবাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার নিজ ব্যয়ের নিমিত্ত সাম্বৎসরিক চারি পাঁচ লক্ষ টাকা লভ্যের সম্পত্তি স্বতন্ত্র ছিল। এই অর্থ তিনি যে কর্ম্মে ব্যয় করিতে ইচ্ছা করিতেন তাহা করিতে পারিতেন, কাহার স্থানে হিসাব দিতে হইত না। কেবল রাজ্য সংক্রান্ত আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে হইত, তাহা তিনি এমন পরিষ্কার ও সুন্দর রূপ রাখাইতেন, যে অতি মূঢ় ব্যক্তিও অনায়াসে বুঝিতে পারিত। রাজসম্পর্কীয় কর্ম্মচারীদিগের বেতন ও রাজ্যের অন্য অন্য দায় সমাধা করণানন্তর যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইত তাহা, যেখানে যখন যুদ্ধাদি উপস্থিত থাকিত, সেই স্থানে প্রেরিত হইত।

তকাজী যখন যে রাজ্যে থাকিতেন তখন তাঁহার প্রতি সেই রাজ্যের সমুদায় ভার থাকিত, কেননা দূর প্রযুক্ত তিনি সকল কর্ম্মে অহল্যার পরামর্শ লইতে পারিতেন না, কিন্তু রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল বিষয় উপস্থিত হইলে সর্ব্বদা পত্র দ্বারা পরামর্শ ও অনুমতি লইতেন। সংগ্রাম বা সন্ধি বা অন্য কোন রাজাদিগের সহিত এই রাজ্যের সম্বন্ধে তিনি যে আজ্ঞা প্রচার করিতেন তকাজী তদনুসারে চলিতেন।

পরন্তু অহল্যার এমন সম্ভ্রম ছিল যে ভারতবর্ষস্থ যাবতীয় রাজাদিগের উকীল ও প্রতিনিধি তাঁহার সভাতে উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহাদিগের রাজ্য-সম্পর্কীয় যে যে কার্য্য উপস্থিত হইত তাহা তাঁহাদের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। অহল্যা রাণীর প্রতিনিধি সকল আর আর রাজ্যে অর্থাৎ পুনা হায়দ্রাবাদ সরিঙ্গাপাটাম নাগপুর লক্ষণৌ ও কলিকাতা রাজধানীতে বাস করিয়া ঐ ঐ স্থান-সম্পর্কীয় সকল কর্ম্ম করিতেন, এবং যখন যে সংবাদ উপস্থিত হইত তাহা বিজ্ঞাপন করিতেন। ইহা ভিন্ন আর আর কয়দ ক্ষুদ্র রাজাদিগের সভাতে তাঁহার আর আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিনিধি থাকিতেন। তাহারা কেবল রাজকর আদায় করিতেন, এবং যখন যে আজ্ঞা প্রকাশ হইত তাহা পালন করিতেন।

হিন্দুদিগের মধ্যে নারীগণকে অন্তঃপুরে বন্ধন করিয়া রাখা যে কদর্য্য ব্যবহার, মুসলমান দিগকে তাহার মূল বলিতে হইবে; কেননা তাহারা যে সকল দেশ জয় করিয়াছিল সেই সেই দেশে ঐ ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মুসলমান রাজারা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন, এবং তাঁহাদের অত্যাচারের ভয়ে কুলাঙ্গনারা গৃহের বাহির হইত না; ইহাতে তাহাদিগকে গোপন ভাবে অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখার ব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বকালে এই ব্যবহার ছিল

না, ধর্ম্মশাস্ত্রেও ইহার বিধি নাই। তাহার প্রমাণ অহল্যাবাই প্রত্যহ রাজসভায় বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন : তাহাতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন ভদ্র লোকেরা প্রতিবাদী হন নাই।

অহল্যাবাই রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া অবধি সম্ভাবিত রাজস্ব গ্রহণ করিতেন, গ্রামস্থ কর্ম্মচারী ও ভূম্যধিকারীদিগের যাহার যে বৃত্তি বা প্রাপ্তি ছিল তাহা কদাপি উচ্ছেদ করেন নাই, বরং যাহাতে তাহা স্থিরতর থাকে তাহাই করিয়াছেন, সুতরাং কর্ম্মচারী ও ভূম্যধিকারীগণ অতিশয় সুখী ছিলেন। পরন্তু যে ব্যক্তি যাহা আদ্দাশ করিত অহল্যাবাই স্বয়ং তাহার বিচার করিতেন। তিনি কখন কখন পঞ্চাইত বা মন্ত্রীদিগের প্রতি বিচারের ভারার্পণ করিতেন, কিন্তু যখন যে ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আপন দুঃখ জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করিত তাহা পারিত, তাহাতে কোন বাধা ছিল না, বিচারে কোন প্রকার পক্ষপাত হইত না; বরং অতি সামান্য বিষয়ে পঞ্চাইতের আদালত বা মন্ত্রীদিগের বিচারের প্রতি কেহ দোষারোপ করিয়া তাহার পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিলে তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিতেন, অতি তুচ্ছ বিষয় হইলেও তাহাতে তাচ্ছল্য করিতেন না।

যে গ্রন্থ হইতে অহল্যারাণীর চরিত্র সংগ্রহ করাগেল

সেই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন হুলকার বংশীয় কোন ব্যক্তিকে অহল্যারাণীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, পাছে তাহারা পক্ষপাতশূন্য না হইয়া কোন কথা বলে, অথবা কেহ তাঁহার অনর্থক নিন্দা করে, এজন্য তিনি অন্যান্য দেশে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন স্থানে তাঁহার অপ্রশংসা শুনেন নাই। যে স্থানে যাহাকে অহল্যার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সেই খানে তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়াছেন, বরং দূর ও ভিন্ন দেশে তাঁহার যশ ও কীর্ত্তি আরো দেদীপ্যমান দেখিয়াছেন। ত্রিংশ বৎসরাবধি যাইট বৎসর অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রমের বিরাম ছিল না, তিনি সকল রাজকার্য্য আপনি করিতেন। তাঁহার নিজ চিন্তা এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম ও পূজা আহ্নিক ও দান বিতরণে অনেক সময় যাইত। ইহা ভিন্ন সাংসারিক কর্ম্ম দেখিতে হইত। সুতরাং তাঁহার অবকাশ মাত্র ছিল না। তিনি জানিতেন জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকট আমাদিগের সকল কর্ম্মের বিচার হইবে। অতএব সকল কর্ম্মে ধর্ম্মভয় ছিল, যদি কখন কোন ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিতে হইত তৎকালে এই কথা বলিতেন, আমরা মনুষ্য হইয়া জগৎকর্ত্তার কৃত কর্ম্মের অন্যথা করি ইহা অত্যন্ত দুরূহ।

অহল্যাবাই প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের এক দণ্ড পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি করিতেন। তাহার পর কিছুকাল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। তদনন্তর স্বহস্তে কয়েকটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। তাহার পর আপনি ভোজন করিতেন, মৎস্য মাংস আহার করিতেন না। স্বজাতীয় শাস্ত্রে মৎস্য মাংসাহার নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু তাহা তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আহারান্তে কিছুকাল নির্জ্জনে বিশ্রাম করিতেন। তদনন্তর বেলা দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময় রাজবেশ ধারণ পূর্ব্বক বিচারস্থলীতে গমন করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিচার করিতেন; তাহার পর সন্ধ্যাদি ও যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া রাত্রি নয় ঘণ্টা অবধি একাদশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন। তাহার পর শয়ন করিতেন। অহল্যাবাইর পূজা ও পরিশ্রমের এই প্রকার নিয়ম ছিল। পর্ব্ব বা উপবাস অথবা রাজকর্ম্মের অত্যন্ত ঝঞ্ঝাট না হইলে এই নিয়মের অতিক্রম কদাচ হইত না।

অহল্যাবাইর রাজ্য শাসনের ধারা অতি চমৎকার ছিল। অন্য অন্য রাজাদিগের সহিত তিনি এমত সদ্ভাব রাখিয়াছিলেন যে তাহারা কখন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ অথবা উহা গ্রহণেচ্ছু হয়েন নাই। এবং যদিও উদয়পুর নিবাসী অলসিবানা নামক এক ব্যক্তি

কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার স্বজাতিদিগকে রামপুর নগর আক্রমণ জন্য আশ্রয় দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি সুসিদ্ধ হইতে পারেন নাই। অহল্যাবাই তাঁহাকে পরে দমন করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, তাঁহার অধিকারস্থ সকল প্রজা স্বচ্ছন্দাবস্থায় থাকিত। বিশেষতঃ যে যেমন লোক তাহার প্রতি তাঁহার তদ্রূপ ব্যবহার ছিল, অর্থাৎ যাহারা নিরপরাধী তাহাদিগকে দয়া এবং যাহারা বিবাদেচ্ছুক তাহাদিগকে সতত দমন করিতেন। ইহাতে যুদ্ধাদি হইতে পারিত না। নিত্যনিত্য মন্ত্রী বা কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন করা যে বিবাদ বিসম্বাদের মূল অহল্যাবাই তাহা বিলক্ষণ জানিয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্যকালে তাহা প্রায় হয় নাই। তাহার প্রমাণ এই, গোবিন্দপন্থ নামক এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁহার রাজ্য শাসনের সমুদয় কাল একাদিক্রমে তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। আর আর যে সকল রাজকর্ম্মকারক ছিলেন তাঁহারা কদাপি কর্ম্মচ্যুত হন নাই। ইহাতে কাহার সঙ্গে কাহার বিবাদ কলহ কিছু ছিল না, অথচ রাজকর্ম্ম সুন্দররূপে চলিত।

ইন্দোর পূর্ব্বে এক সামান্য গ্রাম ছিল, অহল্যাবাই সেই গ্রামকে ক্রমে অতি মান্য ও ধনাঢ্য করেন; এই জন্য ঐ স্থানের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে এক প্রমাণ এই

যে, ঐ স্থানের কোন এক ধনী বণিক নিঃসন্তান হইয়া লোকান্তরগত হওয়াতে, তকাজী স্থলকার কোন অসৎ লোকের মন্ত্রণায়, তাহার ধন হরণার্থ সসৈন্যে তাহার আলয় আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া বণিকের বনিতা অহল্যার নিকটে আসিয়া তাঁহার শরণাগত হইলে, অহল্যাবাই সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তাহাকে তাহার মৃত স্বামীর সকল বস্তুর কর্ত্রীস্বরূপ স্থাপন করিয়া, তকাজীকে নিষেধ করিলেন তাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার না করেন। তকাজী আর কোন অত্যাচার করিতে পারিলেন না। অহল্যাবাই এই প্রকার আর আর অনেকের প্রতি এইরূপ দয়া প্রকাশ করিতেন, তাহাতে ঐ নগরে তাঁহার নাম অত্যন্ত প্রিয় এবং চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

অহল্যাবাইর রাজ্য সচ্ছন্দে থাকার আর এক হেতু এই, মহারাষ্ট্রীয় রাজা তাঁহার সপক্ষ ছিলেন। অহল্যাবাই প্রথমতঃ রাজত্বকালে ঐ রাজার স্থানে অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং এই কারণ তিনি তাঁহার মিত্রতানুশীলন করিতেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় রাজা কেবল বন্ধুতাভাবে যে আত্মস্বার্থ ত্যাগ করিয়া অহল্যাবাইর সহায়তা করিয়াছিলেন এমত নহে, মলহর রাওয়ের লোকান্তর গমনের পর অতুল ঐশ্বর্য্য উপভোগে তাঁহার নিতান্ত বাসনা ছিল। কিন্তু তাহা

হইলে অহল্যার সহিত সদ্ভাব থাকিবে না, এবং অপযশ হইবে, এই কারণে তাহাতে ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু তৎপরে ঐ রাজা অহল্যাবাইর স্থানে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা কর্জ্জ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মলহর রাওয়ের উপপত্নী তাঁহাকে আর ছয় লক্ষ মুদ্রা কর্জ্জ দিয়াছিলেন, এই টাকা পরিশোধ করেন তাঁহার এমন অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তিনি তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। এবং স্বীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে অহল্যাবাইর সহায়তা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ইহাতেই তিনি আপনাকে ঋণে মুক্ত জ্ঞান করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, তাঁহার সহায়তাতে অহল্যাবাইর রাজ্য আরো সবল হইয়াছিল। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয় দেশ ও মালব প্রদেশ উভয় সংলগ্ন ছিল, তাহাতে ঐ সহায়তা দ্বারা অহল্যাবাইর অনেক উপকার বোধ হইয়াছিল।

হুলকারদিগের যে সকল করদ রাজা ছিলেন অহল্যাবাই তাঁহাদিগের প্রতি প্রথমতঃ অত্যন্ত দয়াবতী ছিলেন, তাহাতে কর সংগ্রহে অনেক বিলম্ব হইত, এজন্য পশ্চাৎ তাঁহাদিগের প্রতি কঠিন ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, তাহাতে ক্রমে সময়মত রাজস্ব সংগ্রহ হইত। অপর রজঃপূত বংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলপতিগণ দস্যুতা-স্বভাব প্রযুক্ত পূর্ব্বাবধি বলপূর্ব্বক

ঐ রাজ্যের রাজস্বের অংশ গ্রহণ করিত, অহল্যাবাই তাহাদিগকে দমন করিযাছিলেন। পরে মহারাষ্ট্রীয়াধিপতিও তাহাদিগের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করাতে, তাহাদের অত্যাচার মাত্র ছিল না। ইহাতে উভয় রাজ্যের প্রজাগণ সুখী হইয়াছিল।

অপর, প্রজার ধনে তাঁহার কিছুমাত্র লোভ ছিল না, কোন কোন রাজ্যে প্রজাগণ ঐশ্বর্য্যশালী হইলে রাজারা তাহাদিগের নিকট অধিক রাজস্ব গ্রহণ বা অন্য কোন প্রকারে আত্মস্বার্থ অভিলাষী হইযা থাকেন। অহল্যার রাজ্যে তাহার কিছুই ছিল না। বণিক বা মহাজন বা কৃষক লোক ক্রমশঃ বা অকস্মাৎ ধন প্রাপ্ত হইলে, তিনি বলে বা ছলে তাহা লইবার বাসনা না করিয়া তাহাদিগের সৌভাগ্যে আনন্দিত হইতেন। এবং তাহাদের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রকাশ করিতেন। ইহার এক প্রমাণ এই, ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে, বসিযা নামক এক স্থানে সবকেম দাস নামে এক ধনবান বণিক নিঃসন্তান লোকান্তরগত হইলে, তত্রস্থ রাজকর সংগ্রহ কর্ত্তা তাহার স্ত্রীকে এই বলিযা ভয প্রদর্শন করিল, যদি আমাকে তিন লক্ষ মুদ্রা উপাযন না দাও তবে আমি তোমার তাবৎ ধন রাজ-সরকারে ক্রোক করাইব। এই ভয প্রদর্শনে ঐ বিধবার আত্মীযগণ তাঁহাকে পোষ্যপুত্র রাখিবার পরামর্শ দিলেন, কেন না তাহা

হইলে রাজা ঐ ধন গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু ঐ ধূর্ত্ত করসংগ্রহকর্ত্তা ইহাও করিতে দিল না। তাহাতে বণিক-জায়া যে বালককে পোষ্যপুত্র করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন তাহাকে লইয়া মহীশূরে অহল্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। অহল্যাবাই করসংগ্রহকারকের অত্যাচারের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিলেন, এবং বণিক-জায়ার পোষ্যপুত্র গ্রাহ্য করিয়া, ঐ পুত্রকে স্বক্রোড়ে লইয়া চুম্বনাদি করণানন্তর, শিরোপা দিয়া বিদায় করিলেন।

অহল্যাবাইর নিরাকাঙ্ক্ষ স্বভাবের আর এক দৃষ্টান্ত এই যে, করগ্রামে তপে দাস ও বাবাণস দাস নামে দুই সহোদর প্রায় এককালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ দুই ভ্রাতার অনেক ঐশ্বর্য্য ছিল, এবং কাহার সন্তানাদি ছিল না। ইহাতে তপে দাসের স্ত্রী মহীশূরে অহল্যারাণীর নিকটে আসিয়া আপন স্বামী ও দেবরের স্বোপার্জ্জিত তাবৎ ধন তাঁহাকে সমর্পণ করিতে চাহিল। কিন্তু অহল্যাবাই তাহা গ্রহণ না করিয়া, ঐ ধন বিতরণ করিতে ও তদ্দ্বারা তাহার স্বামী ও দেবরের স্মরণার্থ কোন পুণ্য স্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন। তাহাতে ঐ নারী করগ্রাম-নদীর উপর এক ঘাট ও এক মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ ঘাট ও মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

অপর, গোন্ত নামক নর্ম্মদা-নদীতীরস্থ এবং ভীল নামক পর্ব্বতীয় যে সকল দস্যু ও অসভ্য লোক ছিল, অহল্যাবাই তাহাদিগকে শাসনাধীন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ঐ সকল দস্যুগণ ভদ্রাচরণে নম্র হয় নাই, তাহার পর কয়েক জন অতিশয় দুঃশাসনীয় দস্যুর প্রাণদণ্ড করিয়া তাহাদিগকে একবারে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন।

প্রাণ দণ্ড বিধি অহল্যা রাণীর নিয়মের বিপরীত ছিল। তিনি জানিতেন দুষ্ট-দমনার্থ যদিও কখন কখন গুরু দণ্ড আবশ্যক, কিন্তু প্রায় বিনা দণ্ডে ও বিনা দ্বন্দ্বে তাবৎ কর্ম্ম করিতেন। শান্তি রক্ষার জন্য তিনি স্থানে স্থানে প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ সকল দস্যুগণের দস্যুবৃত্তি অনেক নিবারণ হইয়াছিল। অপিচ ঐ দস্যুগণের জীবনোপায়ের নিমিত্তে তিনি এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাদিগের বাসস্থান অর্থাৎ পর্ব্বত দিয়া যে সকল লোক কোন দ্রব্যাদি লইয়া গমন করিবে তাহারা তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর প্রদান করিবে, অর্থাৎ প্রতিবলদে অর্দ্ধ পয়সা দিবে। এই করকে ভীলের কড়ি বলিয়া থাকে। পর্ব্বতবাসী প্রজাদিগের সহিত এই নিয়ম করিয়াছিলেন তাহারা এই কর গ্রহণ করিয়া রাজ-পথাদি রক্ষা করিবে এবং যদি তাহার সীমার মধ্যে

দস্যুবৃত্তি হয তবে অপহৃত দ্রব্যাদি অন্বেষণ করিয়া দিবে, নতুবা তাহার উচিত দণ্ড পাইবে, সুতরাং দস্যু-বৃত্তির প্রাদুর্ভাব ছিল না। এই প্রকার প্রজা সচ্ছন্দে থাকিবার আর আর অনেক নিয়ম করিযাছিলেন তাহা বর্ণনা বাহুল্য। ঐ সকল নিয়ম অতি সুন্দর ছিল, তাহাতে প্রজারা অতি সুখে কাল যাপন করিয়াছে।

অতি দূর দেশীয রাজাদিগের সঙ্গে অহল্যা রাণীর লিখন পঠন চলিত, তাঁহার কর্ম্মকর্ত্তা ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা এই লিখন পঠন হইত। এই সকল ব্রাহ্মণেরা তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্মের উপাচার্য্য ছিলেন। কথিত আছে, যখন অহল্যা রাণী হুলকার রাজাস্থ ধন প্রাপ্ত হইলেন তখন সৎকর্ম্মে দানার্থ উৎসর্গ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ঐ ধন পুণ্যকর্ম্মে ব্যয় হইবে, অন্য কর্ম্মে ব্যয় হইবে না। এবং যাহাতে দেশের ও লোকের উপকার হয় কেবল তাহাতেই এই সকল ধন ব্যয় করিয়াছিলেন।

তিনি প্রথমতঃ কযেক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহার পর বিন্ধ্য গিরির উপর জাম নামক দুর্গের এক রাস্তা করেন। ঐ রাস্তা প্রায় সোজা উঠিযাছিল এবং তাহাতে অনেক ব্যয় হয। কেদারনাথে পথিক লোকের বিশ্রাম জন্য এক প্রস্তরময় ধর্ম্মশালা ও এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি উত্তমা-

বস্থায় আছে। ঐ ধর্ম্মশালা মন্দন নামক স্থানের উত্তরে, প্রান্তরের মধ্যে, এবং তাহা দুই সহস্র হস্তের অধিক উচ্চ। অপর, মহীশূর নগরে এবং মালব প্রদেশে হুলকারদিগের অধিকারের মধ্যে অনেক ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ ও কূপ খনন করিয়াছিলেন। তিনি নিজ দেশেই যে এই সকল কীর্ত্তি করিয়াছেন এমত নহে; উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পশ্চিমে দ্রাবিড় ও পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্রের মধ্যে হিন্দুদিগের যে সকল প্রধান তীর্থ স্থান আছে সেই সেই স্থানে, তিনি কোননা কোন দেবালয় বা অন্য কোন দেবার্চ্চনার স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং তাহার চিরস্থায়িত্বের নিমিত্ত সকল স্থানে লোক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, প্রতি বৎসর ঐ সকল স্থানে বিতরণ জন্য ধন প্রেরণ হইত। গয়াধামে তাঁহার যে সকল কীর্ত্তি আছে তাহাই প্রধানের মধ্যে গণ্য। ঐ স্থানে অনেকানেক দেবালয় আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুপদ নামে যে মন্দির ও নাট মন্দির* আছে তাহার শিল্পকর্ম্ম অত্যাশ্চর্য্য এবং তাহা উত্তম চিক্কণ প্রস্তরে

---

* এই মন্দিরের এক কাষ্ঠনির্ম্মিত আদর্শ, টিকারি রাজার দুর্গের দ্বারে আছে, তাহা ইদানীং ভগ্নাবস্থায় আছে। কাপ্তেন সর উইল সাহেব কমিসানর সাহেবকে কহিয়াছিলেন, রাজাকে বলিয়া তাহা কলিকাতায় মেরামতের জন্য পাঠান। কিন্তু কমিস্যনর সাহেব সে জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে স্বীকার করিলেন না।

নির্ম্মিত। মন্দিরের ভিতরের শিল্পকর্ম্ম অতি উৎকৃষ্ট, এবং তাহার গুম্বেজ এমত চমৎকাররূপে থিলিযাছে যে তাহা শূন্যে আছে এমত বোধ হয়। আর এক মন্দির মধ্যে রাম ও জানকীর প্রতিমূর্ত্তির নিকট অহল্যাবাই শিবপূজা করিতেছেন, এই প্রকার এক প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহাতে তিনি দেবাংশীয়া বলিয়া গণনীয়া হইযাছেন।

এই সকল দেবালয়ের সাম্বৎসরিক নির্দ্ধারিত ব্যয ভিন্ন অহল্যারাণী আর আর দেবালয়ে বৎসর বৎসর অনেক ধন ও খাদ্য ও অন্য দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতেন। দক্ষিণ প্রদেশে তিনি যে সকল দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা প্রতিদিবস গঙ্গাজলে স্নান করাইতেন, তজ্জন্য গঙ্গা হইতে অনেক জল প্রেরণ করিতে হইত। এই সকল দেশে গঙ্গাজল দুষ্প্রাপ্য, তাহাতে তদ্দেশীয় লোকেরা গঙ্গাজলে দেশকে পবিত্র জ্ঞান করিযা তাঁহার আরো যশোবাদ করিত এবং অদ্যাপিও ঐ জন্য তাঁহার নাম জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

অহল্যা রাণীর হিন্দুধর্ম্মে অত্যন্ত ভক্তি ছিল। তিনি নানা স্থানে নানা প্রকার দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিযাছিলেন, তাহার কারণ এই যে ঐ সকল দেবতা পূজ্য এবং তাঁহারা প্রসন্ন হইলে দেশের ও প্রজাগণের মঙ্গল হইবে তিনি ইহা মনে করিতেন।

ইহা ভিন্ন অহল্যারাণী নিত্য নিত্য ও বিশেষ পর্ব্বের দিবসে দীন দরিদ্র অনেক লোককে ভোজন করাইতেন, গ্রীষ্মকালে পথিকগণের তৃষ্ণা নিবারণ জন্য জলছত্র দিতেন, শীতকালে আতুর, অন্ধ, অনাথদিগকে বস্ত্র বিতরণ করিতেন। আর মনুষ্যের প্রতি তাঁহার যে প্রকার দয়া ছিল, পশু পক্ষী মৎস্যাদির প্রতিও ঠিক সেই প্রকার ছিল। ঐ সকল পশ্বাদির নিয়মিত আহারের জন্য লোক নিযুক্ত ছিল। তাহারা যথাকালে তাহাদিগকে আহারীয় দ্রব্যাদি দিত। মহীশূরের চতুঃপার্শ্বস্থ কৃষকগণকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন গ্রীষ্মকালে লাঙ্গল বহন সময়ে তাহারা মধ্যে মধ্যে বলদকে লাঙ্গল হইতে খুলিয়া জল পান করাইবে। শস্য প্রস্তুত হইলে ক্ষেত্রপালেরা প্রহরী রাখিত, তাহারা ক্ষেত্রমধ্যে পক্ষী আসিতে দিত না, পক্ষী সকল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়াইত, কোথাও আহার পাইত না। অতএব অহল্যাবাই ঐ অনাহারী পক্ষীগণের আহারের জন্য ক্ষেত্রপগণের স্থানে শস্যক্ষেত্র ক্রয় করিয়া পক্ষিগণকে তন্মধ্যে ছাড়িয়া দিতেন, তাহাতে পক্ষী সকল অবাধে আহার করিত, কেহ প্রতিবন্ধক হইত না।

অহল্যা রাণীর সকল জীবে এইপ্রকার দয়া ছিল, আর ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অতিশয় ভক্তি ছিল। এই সকলকে

মিথ্যা ধর্ম্ম বলিয়া কেহ কেহ হাস্য করিতে পারেন, কিন্তু এই সকল কর্ম্মে ব্যয় করিয়া তিনি আপন রাজ্য যে প্রকার সচ্ছন্দ রাখিয়াছিলেন এবং প্রজাদিগকে সুখী ও আপনাকে পূজ্যা করিয়াছিলেন, রাজ্যরক্ষার্থ সৈন্য সামন্ত বা গোলা বারুদে ধনক্ষয় করিয়া, তাহা কদাচ করিতে পারিতেন না। অহল্যার স্বধর্ম্মে আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, ইহা দৃষ্টপ্রমাণ হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইযাছিল ইহার কোন সন্দেহ নাই। যদি তিনি কেবল সাংসারিক হইতেন তবে এমত সুন্দররূপে রাজ্য চালাইতে পারিতেন না। এক ব্রাহ্মণ কহিযাছেন তাঁহার রাজত্বের শেষাবস্থাতে, তিনি পুণা নগরে এক প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া দেখিয়াছেন অহল্যারাণীর নামোল্লেখে সকল লোকে ধর্ম্মবৃদ্ধি বিবেচনা করিতেন, এবং তাঁহার সজাতীয় রাজাদের মধ্যে প্রায় কেহই এমত ছিলেন না যিনি তাঁহার আপদ অথবা যুদ্ধের সময়ে তাঁহার সহায়তা না করিয়া, আপনাকে দেবদ্রোহী জ্ঞান না করিতেন।

এই প্রকার সকল লোকেই তাঁহাকে মান্য করিতেন, এবং দক্ষিণ প্রদেশীয় নবাব ও টিপু সুলতান, দিল্লীর বাদশাহকে যেরূপ সম্মান করিতেন অহল্যাবাইকেও সেইরূপ মান্য করিতেন। ইহা ভিন্ন মুসলমান ও

হিন্দু সকলেই তাঁহার কুশল ও দীর্ঘায়ুঃ প্রার্থনা করিত। নিজে হিন্দু বলিয়া মুসলমানদিগের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র দ্বেষ ছিল না।

অহল্যাবাই রাজত্বের অন্তিম কালে অত্যন্ত শোক পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর পর, তিনি যশবন্ত রাওয়ের সহিত মুক্তানাম্নী কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র অতি উপযুক্ত হইয়া যৌবনাবস্থায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। এই ঘটনার এক বৎসর পরে যশবন্ত রাওয়ের পরলোক প্রাপ্তি হইলে, মুক্তাবাই পতির সহিত সহমৃতা হইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। অহল্যা তাঁহার সহমরণ নিবারণের অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু মুক্তা তাঁহার নিষেধ না শুনিয়া সহগমনে একান্তচিত্ত হইয়া, মাতাকে বলিলেন পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের পতি পুত্রই সুখের কারণ, আমার সে সুখ কিছুই রহিল না, আমি পতি পুত্র বিহীনা হইলাম, অতএব পৃথিবীতে আমার আর কি সুখ আছে। আপনি গর্ভধারিণী আছেন বটে, কিন্তু আপনি বৃদ্ধা হইয়াছেন, কিছুকালের মধ্যে আপনি এই ধর্ম্ম কায ত্যাগ করিবেন। তখন আমার অধিক শোক এবং প্রাণ ধারণ দুষ্কর হইবে, এবং মরণেও মনস্তাপ দূর হইবে না। এখন মরিলে সে শোক পাইব না। অতএব মাতঃ! আমি এখনি স্বামীর সমভিব্যাহারে

সহগমন শ্রেয়ঃ কল্প, বিশেষতঃ ইহা শাস্ত্রসম্মত, অতএব আপনি নিষেধ করিবেন না; অহল্যা কি করেন, কন্যাকে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, তাঁহাকে সহগমনের অনুমতি দিলেন, কিন্তু কন্যাশোকে ব্যাকুলা হইয়া, তাঁহার সহগমন দর্শনার্থ নর্ম্মদাকূলে পদব্রজে গমন পূর্ব্বক, চিতার নিকট দণ্ডায়মানা রহিলেন। দুই জন ব্রাহ্মণ তাঁহার বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া থাকিলেন। মুক্তার চিতা আরোহণ করণানন্তর যখন চিতা প্রজ্বলিত হইল, তখন অহল্যারাণী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া স্বীয় কর দংশন করিতে লাগিলেন। শব দাহন হইলে তিনি নর্ম্মদা নদীতে অবগাহন করিয়া, রাজবাটীতে আগমন পূর্ব্বক শোকাভিভূতা হইয়া প্রায় তিন দিবস পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিলেন। ঐ তিন দিবস কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। অনন্তর শোকের কিঞ্চিৎ শান্তি হইলে কন্যার স্মরণার্থ এক মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। এই মন্দির এমন অপূর্ব্ব এবং তাহাতে এমন শিল্পকর্ম্ম করাইলেন যে তত্তুল্য প্রায় আর দৃষ্ট হয় না। ঐ মন্দির অদ্যাপি মহীশূরে বর্ত্তমান আছে।

তদনন্তর কলি-গতাব্দ ৪৮৯৬, ইং ১৭৯৫ সালে ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে অহল্যারাণীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। কেহ কেহ কহেন উপবাস, কঠিন ধর্ম্ম প্রতি-পালন, শোক ও চিন্তাতে তাঁহার শরীর জর্জ্জরীভূত

হইয়াছিল, তাহাতেই শীঘ্র মৃত্যু হয়। যাহা হউক, তাঁহার মরণে দেশের সম্পূর্ণ অমঙ্গল, এবং তাহাতে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু স্বদেশীয় ও বিদেশীয় যাবতীয় লোক অত্যন্ত মনস্তাপিত হইয়াছিলেন

অহল্যা মধ্যমাকৃতি ও ক্ষীণকলেবরা ছিলেন। তিনি সুন্দরী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার বর্ণ অতি পরিষ্কার ও উজ্জ্বল ছিল। কথিত আছে, সিন্ধিয়াধিপতি বাজি রাওয়ের মাতা, পরম রূপবতী অনন্তাবাই, অহল্যার যশোদ্বেষিণী হইয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য এক পরিচারিণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। দাসী তাঁহাকে দেখিয়া গিয়া অনন্তাকে বলিল অহল্যার আকৃতি সুন্দর নহে, কিন্তু তাঁহার মুখে এক অপূর্ব্ব ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ আছে, তাহাতেই তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল করিয়াছে। ফলতঃ তাঁহার যেরূপ সদন্তঃকরণ তাহা মুখেই প্রকাশ ছিল, মৃত্যুর সময়েও তাহার বৈলক্ষণ্য হয় নাই। অহল্যা সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিতেন, প্রায় রাগ-প্রাপ্ত হইতেন না। যদি কখন রাগান্বিত হইতেন তবে তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ভৃত্য বা দাসীগণও তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী থাকিতে পারিত না।

হিন্দুজাতীয় স্ত্রীলোকের যে সকল গুণ সম্ভাবিত, অহল্যাবাই তদপেক্ষা অধিক গুণে গুণবতী ছিলেন। তিনি স্বয়ং পুরাণ পাঠ করিতেন। অন্য অন্য ধর্ম্ম-

গ্রন্থ পাঠেও তাঁহার অতিশয় আমোদ ছিল। তিনি বিদ্বান ব্যক্তিদের আদর, ও ধন-দান দ্বারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বিদ্যানুশীলনে উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেন। রাজকীয় কর্ম্মেও তিনি অতি বিচক্ষণা ছিলেন, এবং অতি কঠিন বিষয়ও অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার বিচার অতি সূক্ষ্ম ও পক্ষপাতশূন্য ছিল। তিনি বিংশতি বৎসর বয়সের পূর্ব্বে পতিহীনা হইয়াছিলেন, এবং তাহার কিয়ৎকাল পরে পুত্র উন্মাদ রোগ গ্রস্ত হওয়াতে অত্যন্ত মনোদুঃখ পাইয়াছিলেন। তিনি বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া শুক্ল বস্ত্র ব্যতীত অন্য বস্ত্র পরিধান করিতেন না, এবং গলদেশে মালা অর্থাৎ হার ভিন্ন অন্য কোন অলঙ্কার পরিতেন না, বেশ বিন্যাস বা অঙ্গরাগ বিষয়ে একবারে বিরতা ছিলেন। তিনি স্তাবক-বাক্যের বশীভূতা ছিলেন না, এক পণ্ডিত তাঁহার গুণ বর্ণন পূর্ব্বক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহাকে শ্রবণ করাইতে গিয়াছিলেন। তাহাতে আপনার অনুপযুক্ত প্রশংসা শ্রবণ করিয়া তিনি ঐ গ্রন্থ তখনি নর্ম্মদা নদীতে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহার পর কখন ঐ গ্রন্থের নামোল্লেখ করেন নাই।

উপরি উক্ত বিবরণ যে সকল অনুসন্ধানের পর সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে অত্যন্ত সন্দিহান ব্যক্তিরও

সন্দেহ থাকিতে পারে না, অর্থাৎ ইহাতে কিছুমাত্র অনর্থক প্রশংসা নাই। স্ত্রীলোকেরা প্রায় গর্ব্বিত হয়, কিন্তু অহল্যার অহঙ্কার মাত্র ছিল না। কোন মত বা ধর্ম্মের দৃঢ়াবলম্বী হইলে সহজে অন্য মত বা ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ হইয়া থাকে, কিন্তু অহল্যার সে দ্বেষ ছিল না। প্রত্যুত ভিন্ন মত বা ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া ছিল। তাঁহার অন্তঃকরণে প্রজার হিতবুদ্ধি ব্যতীত অন্য চিন্তা ছিল না। আর তিনি স্বাধীনা রাজ্ঞী হইয়াও যে স্বেচ্ছানুরূপ কর্ম্ম না করিয়া, আপনাকে উচিত কর্ম্মের বশতাপন্ন রাখিয়াছিলেন ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নহে।

মালব প্রদেশস্থ লোকেরা তাঁহার এই সকল গুণের অত্যন্ত প্রশংসা করেন, ঐ জাতীয় লোকের মধ্যে তিনি দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার যে অল্পাধিকার ছিল, তন্মধ্যে যে সকল রাজ্যাধিপতিগণ রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অহল্যার চরিত্র নির্ম্মলরূপে জাজ্বল্যমান ও উপমা-রহিত। অধিকন্তু ভবিষ্যতে পরমেশ্বরের নিকট বিচার হইয়া কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া ইহ লোকে যে সৎকর্ম্ম করণে প্রবৃত্তি হয়, ও তাহাতে যে মহোপকার সম্ভব, অহল্যা তাহার এক উপমাস্থল হইয়াছেন।

রাণী ভবানী।

রাণী ভবানী, রাজশাহীর অন্তঃপাতী ছাতিন গ্রাম নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা। যে সকল লোক তাঁহাকে প্রাচীনাবস্থাতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কেহ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা কহেন তিনি অতি সুন্দরী ও সুলক্ষণা ছিলেন। এই জন্য নাটোরের ভূম্যধিকারী রাজা রামজীবন রায়, আপন পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

কোন কোন লেখক লিখিয়াছেন রাণী ভবানী বিদ্যাবতী ছিলেন, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া এমন বোধ হয় না যে তিনি বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন বা লেখা পড়া জানিতেন। এই সকল প্রদেশে বালিকা-গণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার প্রথা বহুকালাবধি লোপ পাইয়াছে, এই জন্য দেশের ব্যবহারানুসারে বাল্য-কালে তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা হয় নাই।

রাণী ভবানী প্রথম কালাবধি ধর্ম্মনিষ্ঠা ও দেবতাভক্তা ছিলেন, এবং বাল্যকালের সংস্কার প্রযুক্ত তিনি শ্বশুরের লোকান্তর গমনের পর রাজরাণী হইয়া, কেবল

ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও পরোপকারে একান্তচিত্তা হইয়া, যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নাম চির-স্মরণীয় হইয়াছে।

রাণী ভবানী যে ঐশ্বর্য্যদ্বারা এই সকল পুণ্য-কর্ম্ম করেন তাহা জিলা রাজশাহীর অন্তর্গত রাজা রামজী-বন রায়ের স্বোপার্জ্জিত। ঐ রামজীবন রায় নাটোরের প্রথম রাজা ছিলেন, তিনি যে কৌশলে রাজত্ব প্রাপ্ত হন তাহা আশ্চর্য্য, অতএব রাণী ভবানীর পুণ্য কর্ম্মের মূলবিবেচনায় তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লেখা যাইতেছে।

কামদেব নামক এক ব্রাহ্মণের রঘুনন্দন ও রামজীবন নামে দুই পুত্র ছিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ, পুঁটিয়ার ভূম্যধিকারী দর্পনারায়ণ রায়ের আলয়ে সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন। রঘুনন্দন চতুর ও বুদ্ধিমান এবং রামজীবন উত্তম লক্ষণযুক্ত পুরুষ ছিলেন। দর্পনারা-য়ণ রায় রঘুনন্দনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চতুরতা দেখিয়া, তাঁহাকে আপন প্রতিনিধি করিয়া, মুরশিদাবাদের নবাবের দরবারে রাখিয়াছিলেন। তথায় কানুনগোর সহিত তাঁহার প্রণয় হওয়াতে, ঐ কানুনগো তাঁহার বিচক্ষণতা ও কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া তাঁহাকে আপনার অধীনে এক কর্ম্ম দিয়াছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতি তাঁহার এমত বিশ্বাস হইয়াছিল যে, আপনার মুদ্রাযন্ত্র তাঁহার নিকটে রাখিতেন।

মুরশিদাবাদের নবাব ঐ সময়ে রাজকীয় অনেক রাজস্ব নষ্ট করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে দিল্লীশ্বর তাঁহাকে পদচ্যুত করেন এমন লক্ষণ হইয়াছিল। এই অপমান নিবারণার্থে নবাব, এক কৃত্রিম আয় ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করাইয়া দিল্লীতে পাঠাইবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু কানুনগো তাহাতে স্বাক্ষর ও মুদ্রাঙ্কন করিলেন না। অথচ তিনি স্বাক্ষর বা মুদ্রাঙ্কন না করিলে দিল্লীর বাদশাহ কোন ব্যয় গ্রাহ্য করিতেন না। এই বিপৎকালে রঘুনন্দন ব্যতীত নবাবের পরিত্রাণের অন্য উপায় ছিল না, অতএব তাঁহাকে ডাকাইয়া ঐ কাগজে কানুনগোর মোহর মুদ্রিত করিয়া লইলেন। রঘুনন্দন নবাবের মনোরঞ্জনার্থে তাহাতে মুদ্রাঙ্কন করিয়া দিলেন। পরে ঐ তালিকা দিল্লীতে প্রেরণ করিলে, দিল্লীশ্বর তাহা গ্রাহ্য করিয়া লইলেন, নবাবের পদচ্যুতি রহিত হইল। রঘুনন্দন ইহাতে নবাবের নিকটে অতিশয় প্রতিপন্ন হইলেন, এবং নবাব তাঁহার পুরস্কারার্থে তাঁহাকে আপনার দেওয়ানি এবং রায়-রাঁয়া পদ প্রদান করিলেন।

এই পদ প্রাপ্ত হইয়া রঘুনন্দনের অত্যন্ত আধিপত্য হইল। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিলেন। পরে বাঙ্গালা ১১১৩ (কং ৪৮০৮) শালে পরগণা বন-গাছির ভূম্যধিকারী রাজস্ব প্রদানে অশক্ত হইলে

রঘুনন্দন ঐ সম্পত্তি লইয়া আপন ভ্রাতা রামজীবনকে দিলেন। তদনন্তর ১১১৫ শালে জিলা রাজশাহীর ভূম্যধিকারী রাজা উদিতনারায়ণ পরলোক গমন করিলে তাঁহার তাবৎ ভূম্যাদি আপন ভ্রাতাকে দেওয়াইলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রায় তাবৎ রাজশাহী তাঁহার করস্থ হইল; কেবল নস্করপুর পরগণা পুঁটিয়ার জমিদারদের রহিল, তাহা লইলেন না। তাহার কারণ, তাঁহাদের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহাদের সম্পত্তি হরণ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ জ্ঞান করিলেন। যাহা হউক আর আর যত ক্ষুদ্র ও বড় ভূম্যধিকার ছিল তাবৎ লইলেন। তদ্ভিন্ন আর আর জিলাতে অনেক সম্পত্তি লাভ হইল, ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা থাকিল না। কথিত আছে, প্রতিবৎসর ৫২ লক্ষ টাকা সরকারে রাজস্ব দিতেন। অধিকন্তু নবাব রামজীবনকে রাজা উপাধি দিলেন, ঐ উপাধি তাঁহার উত্তরাধিকারী গণেরা অদ্যাপি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

রাজা রামজীবনের দুই পুত্র ছিল। প্রথমের নাম কুমার কালু, দ্বিতীয়ের নাম রামকান্ত। কুমার কালু অল্প বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে রাজা রামজীবনের পরলোকান্তে ১১৩৭ (কং ৪৮৩২) শালে, রামকান্ত তাবৎ ঐশ্বর্য্য ও ভূম্যাদি প্রাপ্ত হন। এই রামকান্তের ভার্য্যা রাণী ভবানী।

যৎকালে রাজা রামকান্ত রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর। রাণী ভবানী তৎকালে পঞ্চদশ বৎসরের যুবতী। রাজা রামকান্ত তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কিন্তু রাজ্য প্রাপ্তির পরেই রাজা রামকান্ত ও রাণী ভবানীর অনেক ক্লেশ ঘটিয়াছিল, তদ্বিবরণ পশ্চাতে লেখা যাইতেছে।

রাজা রামজীবনের সময়াবধি দয়ারাম নামে এক ব্যক্তি রাজ-সরকারে কর্ম্মকারক ছিল। ঐ ব্যক্তি প্রথমতঃ ভাণ্ডারি-কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, ক্রমে রাজার অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র হইয়াছিল। রাজা তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। এবং রামকান্ত তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। দয়ারাম এমত বুদ্ধিজীবী ও চতুর ছিল যে রাজা তাহার সঙ্গে সর্ব্বদা বিষয়-কর্ম্মের পরামর্শ করিতেন, এবং প্রায় তাহাকে নবাবের দরবারে লইয়া যাইতেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় রাণীকে এই কথা বলিয়া যান, রামকান্ত বালক, যে কর্ম্ম করিতে হয় তাহা দয়ারামের সহিত পরামর্শ-পূর্ব্বক করিবে।

কিন্তু রাজা রামকান্ত, পিতার লোকান্তর গমনের পর অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া, বিষয় কর্ম্মে অত্যন্ত অমনোযোগী হইলেন। তাহাতে দয়ারাম এক দিবস তাঁহাকে অনেক অনুযোগ করিল। ইহাতে দয়ারামের হিত ভিন্ন অহিত ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু রাজা রামকান্ত

তাহা বিপরীত বিবেচনা করিয়া, তাহাকে আলয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। দযারাম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিল, রাজা রামজীবন আমাকে এত সম্মান করিতেন, তাঁহার পুত্র দুই দিবস রাজা হইয়া আমার এই প্রকার অপমান করিলেন; ভাল দেখিব ইনি কেমন রাজা।

এই কথা বলিয়া দয়ারাম মুরশিদাবাদে গিয়া, নবাবের দরবারে যাতায়াত করিতে লাগিল। ঐ সময়ে আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব ছিলেন। দযারাম এক দিবস তাঁহাকে কহিল, ধর্ম্মাবতার! রামকান্ত রায ৩২ লক্ষ টাকা স্থিত করিযা রাখিয়াছে, এবং দুই লক্ষ টাকাতে এক শিরপেচ প্রস্তুত করিযাছে। ইহা ভিন্ন স্মার আর অনেক অপব্যয ও ধুমধাম করিতেছে। কিন্তু ধর্ম্মাবতারের অনেক রাজস্ব পাওনা আছে, তাহা দিবার নামটিও করে না, আপনাকে প্রতারণা করা তাহার নিতান্ত মানস। এই কথায নবাব অত্যন্ত কুপিত হইলেন। বিশেষতঃ নবাবদিগের রাজ্যশাসন কালে নবাবেরা কাহাকেও এক কথায লক্ষপতি করিয়া দিতেন এবং এক কথায কাহারও সর্ব্বনাশ করিতেন, আর ধনের কথা শুনিলে, বলে ছলে যাহাতে হউক হরণ করিতেন।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ দয়ারামের এই কথা শুনিয়া

তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, বামকান্তেব বাটীতে টাকা আছে তাহা দেখাইয়া দিতে পাবিবে? দয়ারাম কহিল, হাঁ ধর্ম্মাবতাব! পাবিব। তদনন্তব নবাব জিজ্ঞাসা কবিলেন, বাজা বামজীবন বায়েব আব কে আছে? দযাবাম কহিল দেবীপ্রসাদ নামে তাঁহাব এক ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, সে ব্যক্তি অতি ধার্ম্মিক এবং ভূসম্পর্কীয় কার্য্য ভাল জানে। নবাব আজ্ঞা কবিলেন, রাজা বামজীবনেব তাবৎ জমীদাবি দেবীপ্রসাদকে দেওযা যাউক, এবং বামকান্ত রায যে অর্থ সঞ্চয় কবিয়া বাখিযাছে তাহা বাজভাণ্ডাবে আনীত হউক।

নবাবেব এই আজ্ঞা হইবা মাত্র দেবীপ্রসাদ বাজা হইলেন, এবং দযারাম কতকগুলিন বাজসেনা লইয়া ধন দেখাইযা দিতে গেল। ঐ সকল সৈন্য রাজবাটী প্রবেশ করিয়া তাবৎ ধন ও আব আর দ্রব্যাদি লুণ্ঠন কবিতে লাগিল।

যখন সৈন্যগণ লুণ্ঠনে মত্ত, তখন বাজা রামকান্ত অন্তঃপুবে ছিলেন, এবং বাণী ভবানী প্রথম গর্ভবতী হইয়াছেন। বাজসেনা বাটী প্রবেশ কবিযা লুঠ আরম্ভ কবিয়াছে এই কথা শুনিয়া রাজা বামকান্ত, বজ্রাঘাতে আহতের ন্যায মহা বিপদাপন্ন হইলেন, কিন্তু সেনাগণ অন্তঃপুরে আসিয়া পাছে তাঁহাকে অপমান পুর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায় এই আশঙ্কায় তিনি রাণী ভবানীর

হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক এক জলনিঃসরণ পথ দিয়া, যমপুরী তুল্য রাজপুরী হইতে তখনি বহির্গত হইলেন। বহু-মূল্য দ্রব্যাদি কিছুই লইতে পারিলেন না, কেবল রাণীর অঙ্গে যে আভরণ ছিল তাহাই সঙ্গে চলিল।

রাণী ভবানী একে রাজরাণী, তাহাতে গর্ভবতী, চলৎশক্তি অভাবে অচলবৎ হইলেন। রাজা রামকান্ত তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কতকদূর গমন করিলেন, তাহার পর একখান ক্ষুদ্র তরি করিয়া পদ্মা পার হইয়া, নবা-বের ধনরক্ষক জগৎ শেঠের শরণাপন্ন হইলেন। পরে নবাববাটীর কিয়দ্দূরে এক সামান্য গৃহে বাসা করিয়া গোপন ভাবে সামান্যের ন্যায় থাকিলেন, মনে করি-লেন যদি কখন পরমেশ্বর অনুকূল হয়েন তবে নবা-বকে আপনার দুঃখ জানাইব, কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না, ক্রমে ক্রমে তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইতে লাগিল।

এক দিবস রাজা রামকান্ত আপন ঘরের ছাতের উপর দণ্ডায়মান আছেন এমন সময়ে দয়ারাম রায় নবাববাটী হইতে শিবিকারোহণে বাসায় যাইতেছিল। রামকান্ত তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহি-লেন, দয়া দাদা' আমি এই ভাবে আর কত দিন থাকিব? এই কথা শ্রবণে দয়ারাম ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া দেখিল যে, রামকান্ত বারাণ্ডার উপর হইতে তাহাকে ঐ কথা বলিলেন। তাহাতে দয়ারাম দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া

শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া কহিল; তুমি অনেক ক্লেশ পাইয়াছ, আর ক্লেশ পাইতে হইবে না, তোমাকে তিন দিবসের মধ্যে আমি রাজত্ব দেওয়াইব। এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নিকট কি আছে। রামকান্ত বলিলেন আমার স্থানে টাকা কিছুই নাই, পলায়ন কালে রাণীর অঙ্গে যে অলঙ্কার ছিল তাহাই মাত্র আছে। দয়ারাম কহিল, ৫০ সহস্র মুদ্রা না হইলে এই কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই কথায় রাণী ভবানী তৎক্ষণাৎ আপনার কতকগুলিন অঙ্গাভরণ আনিয়া দিলেন।

দয়ারাম ঐ অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া নবাবের চকের যাবতীয় দোকানি ও অন্য অন্য ইতর লোক ও নবাবের দ্বাররক্ষক, হস্তিরক্ষক, অশ্বপাল, পদাতিক প্রভৃতি যত সামান্য কর্ম্মকার ও ভৃত্য ছিল, প্রত্যেককে পাঁচ, দশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ ও কাহাকেও শত মুদ্রা পর্য্যন্ত দিয়া বলিল যখন দেবীপ্রসাদ রায় দরবারে আসিবে তখন তোমরা তাহাকে হতভাগ্য বলিবে। তাহারা স্বীকার করিল তাহাই বলিবে।

পর দিবস যখন দেবীপ্রসাদ নবাব-বাটীতে গমন করেন তখন পথের দুধারি যাবতীয় দোকানি পশারি লোক, বলিতে লাগিল দেখ দেখ হতভাগ্য বেটা যাই-তেছে। নবাববাটী প্রবেশ করিলেও তাবতে ঐ কথা

বলিল। তাহাতে দেবীপ্রসাদ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া নবাবকে সমস্ত বিবরণ জানাইলেন। নবাব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন সে কথা কিছু নয়, তুমি তাহা মনে করিও না। পর দিবস পুনর্ব্বার যখন দেবীপ্রসাদ দরবারে যান তখনও ঐ সকল লোক তাঁহাকে সেইরূপ বলিতে লাগিল। তাহাতে তিনি পুনর্ব্বার নবাবকে তাহা জানাইলেন, নবাবও তাঁহাকে সেইরূপ সান্ত্বনা করিলেন। তৃতীয় দিবস সকলে সেই প্রকার বলিলে যখন দেবীপ্রসাদ নবাবকে পুনর্ব্বার ঐ কথা বলিলেন, তখন আলিবর্দ্দি খাঁ মনে মনে ভাবিলেন, সকল লোকই ইহাকে হতভাগা বলে, অতএব কোন্ ব্যক্তির দণ্ড করিব; বারান্তরে বিবেচনা করিলেন, সকলে যখন ইহাকে অভাগ্যবান্ কহে তখন এ ব্যক্তি অভাগ্যবান তাহার সন্দেহ কি।

নবাব এইরূপ বিতর্ক করিয়া তাহাকে বলিলেন, তুই অবশ্য হতভাগা, তাহা না হইলে তোকে তাবৎ লোকে এমন কথা কেন বলিবে, তুই অতি নীচ এবং রাজত্বের অনুপযুক্ত পাত্র, অতএব তোকে তাহা হইতে বর্জ্জিত করিলাম। ইহা বলিয়া দয়ারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন, তুমি জান, রামজীবনের কেহ আত্মীয় বর্ত্তমান আছে কি না। দয়ারাম কহিল ধর্ম্মাবতার, রাজা রামজীবনের পুত্র রামকান্ত বর্ত্তমান আছেন,

তিনি অতি বিচক্ষণ ও ঐ রাজত্বের উত্তরাধিকারী। এই কথা বলাতে নবাব, রামকান্ত রায়কে তাবৎ ভূ-সম্পত্তি অর্পণ করিবার আজ্ঞা করিলেন। রাজা রাম-কান্ত দয়ারামের কোপে রাজ্যচ্যুত হইয়া, তাহারই কৌশলে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। তদবধি রাজা রামকান্ত দয়ারামকে অতিশয় মান্য করিতেন, এবং সকল কর্ম্মের অধ্যক্ষ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তদনন্তর রাজা রামকান্ত প্রায় ১৬ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া, ১১৬৩ সালে (কং ৪৮৪৮) পরলোক গত হন। পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে যখন রাজা রামকান্ত রাজ্য-চ্যুত হন তখন রাণী ভবানী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, ঐ গর্ভে তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল, এবং তাহার পর আর এক পুত্র জন্মিয়াছিল। কিন্তু প্রথম পুত্র কাশীকান্ত একাদশ মাসে এবং দ্বিতীয় পুত্র অন্নপ্রাশ-নের পূর্ব্বেই নষ্ট হয়। তাহার পর আর পুত্র সন্তান হয় নাই, এক কন্যা হইয়াছিল, তিনি তারা ঠাকুরাণী নামে বিখ্যাত ছিলেন।

রাণী ভবানী যৎকালে সধবা ছিলেন তৎকালে তাঁহার দানাদির বাহুল্য ছিল না, কেননা তৎকালে বিষয়াদি হস্তগত হয় নাই, তথাপি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও ব্রতাদি সর্ব্বদা করিতেন। ইহা ভিন্ন দেবালয় স্থাপন, জলাশয় খনন, অন্নদান, বস্ত্রদান এবং দরিদ্র

বা দায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ ও অন্য জাতির কন্যার বিবাহ দেওয়া, এই প্রকার পরহিতকর কর্ম্ম করিতেন। এবং প্রথমাবধি দেবতা ও বিগ্রহের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি ছিল, কোন উত্তম দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে অগ্রে দেবতাকে না দিয়া কখন গ্রহণ করিতেন না।

কথিত আছে এক সময়ে রাজা রামকান্ত রায় ২৬,০০০ টাকা মূল্যের দুই ছড়া মতির মালা ক্রয় করিয়া মনস্থ করিলেন, এক ছড়া রাণীকে আর এক ছড়া জয়কালী বিগ্রহকে দিবেন। দুই ছড়ার মধ্যে এ ছড়া উত্তম, এক ছড়া কিঞ্চিৎ অধম ছিল, তাহাতে রাজা ভাবিলেন উৎকৃষ্ট ছড়া রাণীকে দিয়া, নিকৃষ্ট ছড়া ঠাকুরাণীকে দিবেন। রাণী ঐ দুই ছড়া মালা দেখিয়া উত্তম ছড়া দেবীর জন্য রাখিয়া, অপকৃষ্ট ছড়া আপনি লইবার মনস্থ করিলেন। তাহাতে রাজা স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলে, রাণী বলিলেন তবে উভয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, অর্থাৎ দুই ছড়াই দেবতাকে দেওয়া যাউক। এই প্রকার দেবতাতে দৃঢ় ভক্তির অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

রাজা রামকান্তের লোকান্তর গমনের পর রাণী ভবানী সমুদায় ঐশ্বর্য্য আপন হস্তে পাইয়া, দানাদি ও পুণ্য কর্ম্ম বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষায় মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল কীর্ত্তির জন্য তাঁহার নাম

চিরস্মরণীয় হইয়াছে তখন পর্য্যন্তও তাহা করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তাঁহার এক কন্যা বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার গর্ভে যদি সন্তান উৎপত্তি হয় তবে তাহাকে তাবৎ ঐশ্বর্য্য ও ভূম্যাদির উত্তরাধিকারী করিবেন। ইহাও তাঁহার বাঞ্ছা ছিল। কন্যার বিবাহ দিয়া গঙ্গাবাসিনী হইবেন, এই অভিপ্রায়ে রঘুনাথ লাহিড়ি নামক খাজুরানিবাসী এক সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ কুমারকে কন্যা দান করিয়া, তাঁহাকে তাবৎ বিষয়ের অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ হতভাগ্য ব্রাহ্মণকুমার বিবাহের অল্প দিবস পরে পরলোক গমন করিলেন। তাহাতে আপনিও অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগে বঞ্চিত হইলেন, এবং রাজনন্দিনীকেও চির দুঃখিনী করিলেন। রাণী ভবানী জামাতার মরণে অত্যন্ত মনস্তাপ পাইয়াছিলেন, এবং দান ধ্যানে সদা সুখে থাকিয়াও দুহিতার পতিহীনত্ব যন্ত্রণার জন্য সতত দুঃখিতা থাকিতেন।

কথিত আছে রাজকন্যা তারা অতি রূপবতী ছিলেন। তাঁহার রূপের এমন গৌরব ছিল যে মুরশিদাবাদের নবাব ও তৎপারিষদগণ তদভিলাষী হইয়া তাঁহাকে হরণার্থ অনেক সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্মাতার অন্নে প্রতিপালিত যাবতীয় কৌপীনধারী মহান্তগণ তাহাতে কুপিত হইয়া এক হস্তে ঢাল

ও এক হস্তে করবাল লইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল, সেই জন্য তাঁহাকে হরণ করিতে পারে নাই। তাহার পর অবধি রাণী ভবানী তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিতেন, স্থানান্তরে যাইতে দিতেন না। যবন রাজাদিগের এই সকল দৌরাত্ম্যের জন্য বিশিষ্ট লোকের কন্যা ও পুত্রবধুরা কখন গৃহের বাহির হইতে পারিত না।

রাণী ভবানী জামাতার পরলোকান্তে একবারে বিষয়াদির মায়া পরিত্যাগ করেন, তদবধি তিনি যে প্রকার দান করেন তাহা শুনিলে অতি আশ্চর্য্য বোধ হয়। ফলতঃ তাঁহা অপেক্ষায় বড় বড় যে সকল রাজা ছিলেন তাহারাও তাঁহার তুল্য দান করিতে পারেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণ গঙ্গাবাসী ক্ষেত্রধামবাসী ও আখড়াধারী মহান্ত ও অতিথিদিগকে বৎসর বৎসর এক লক্ষ আশি সহস্র টাকা দিতেন,* তাহারা ঐ টাকাতে দেবসেবা অতিথিসেবা ও নানাপ্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মাদি করিত, এবং বৃত্তির মধ্যে ২০।২৫ সহস্র টাকা অধ্যাপক ও পণ্ডিতদিগকে দেওয়া যাইত, অধ্যাপক পণ্ডিতগণ টোল ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া এক এক জন অনেক অনেক ছাত্রকে বিদ্যা ও অন্ন দান করিতেন, আর ঐ

---

* এই দানকে নগদ বৃত্তি কহা যাইত।

বৃত্তি চিরস্থায়ী হয় অর্থাৎ তাহারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতে পারে, এই জন্য রাণী ভবানী (কং ৪৮৯০) ১১৯৫ সালে ১,৮০,০০০ টাকা আপন রাজস্ব ভুক্ত করিয়া, বৎসর বৎসর কোম্পানির ভাণ্ডারে দিতেন। বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলে কোম্পানি হইতে ঐ টাকা প্রাপ্ত হইয়া, পুরুষানুক্রমে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে, লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনোপায় হইয়াছে।

এই নগদ বৃত্তি ব্যতীত রাণী ভবানী স্বীয় অধিকারস্থ ও অপর অধিকারস্থ অর্থাৎ বীরভূম, রাজশাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, মুরশিদাবাদ, যশোহর ও ঢাকা-বাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণকে ন্যূনাধিক পাঁচ লক্ষ বিঘা ব্রহ্মত্র, দেবত্র ও মহত্রাণ দিয়াছিলেন। ঐ সকল ভূমির কর ছিল না, তাহার উপস্বত্বে অনেক দীন দুঃখী ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোকেরা সুখে কাল যাপন করিয়া আসিতেছে *।

উপরি উক্ত নগদ বৃত্তি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ভূমিদান ভিন্ন রাণী ভবানী কাশী, গয়া, রাজশাহী ও বড়-

* কিন্তু ইদানীং কোম্পানি বাহাদুর লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া এইরূপ অনেক ভূমিতে কর ধার্য্য করিয়াছেন, এবং নগদ বৃত্তির মধ্যেও অনেকের বৃত্তি হরণ করিয়াছেন। রাণী ভবানী ঐ সকল টাকা আপন শিরে লইয়াছেন তথাপি কোম্পানি বাহাদুর তাহা গ্রহণ করিতেছেন।

নগরে অনেক দেবালয় স্থাপন করিয়া ছিলেন। ইহার মধ্যে কাশীতে যে দেবালয় ও সেবা স্থাপন করেন তাহা অতি প্রশংসনীয়। ঐ স্থানে তিনি অনেক মূর্ত্তি ও বিগ্রহ স্থাপন করেন, তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বর, দণ্ডপাণি, দুর্গা, তারা ও রাধা কৃষ্ণ প্রধান। ইহা ভিন্ন শত শত শিবলিঙ্গ ছিল। এই সকল বিগ্রহাদির জন্য প্রস্তরময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তাহা ভিন্ন ষাণ-বান্ধা ঘাট ও অতিথিশালা অনেক ছিল। এবং কাশীর মধ্যে ৩০০ শত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে তীর্থবাসী লোকেরা বাস করিত, এবং যে সকল লোকেরা, অসঙ্গতি বা শেষাবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাশী-বাসের ইচ্ছা করিত তাহাদিগকে সপরিবার ঐ সকল বাটীতে স্থান দান পূর্ব্বক যাবজ্জীবন অন্ন দান করিতেন, এবং তাহাদের মরণান্তে তাহাদের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি শাস্ত্রানুসারে করাইতেন।

ইহা ভিন্ন রাণী ভবানী কাশীর চতুর্দ্দিকে পঞ্চ ক্রোশ ব্যাপিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক এক ধর্ম্মঢোকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঐ ঐ স্থানে এক এক পিলপা ও এক এক বৃক্ষ ও এক এক কূপ খনন করিয়া দিয়াছিলেন। পথশ্রান্ত লোক বা যাহারা আপন মস্তকে দ্রব্যাদি বহন করে তাহারা শ্রান্ত বা

পিপাসাযুক্ত হইলে বিনা সাহায্যে ঢোকার উপর মোট বা দ্রব্যাদি রাখিয়া, বৃক্ষমূলে বসিয়া বিশ্রাম এবং জল পানাদি করিত, পরে ঢোকার উপর হইতে অক্লেশে মোট আপন মস্তকে লইয়া পুনর্ব্বার গমন করিত। মোট নামাইয়া বা তুলিয়া দিতে কাহার সহায়তার আবশ্যক হইত না। ঐ সকল ধর্ম্মঢোকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহা ভিন্ন ঐ পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে এক এক ক্রোশ অন্তরে এক এক পুষ্করিণী ও স্থানে স্থানে তড়াগ বাপী ও কূপ খনন করা ছিল। সেই সকল স্থানে পথিক লোক বিশ্রামাদি করিত, এবং তাহাদের রন্ধনের জন্য প্রস্তরে ক্ষোদিত আখা বাটী জলপাত্র ও তণ্ডুলাদি ও ফল মূল প্রস্তুত থাকিত। স্থানে স্থানে পথিকেরা সচ্ছন্দে আহার ও বিশ্রাম করিত।

এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে সদাব্রত দেওয়া যাইত। আর নিজ কাশীতে নিত্য প্রাতঃকালে এক প্রস্তরের চৌবাচ্চাতে আট মোন ছোলা ভিজান যাইত, তাহা, অনাহূত যে সকল লোক আগত হইত তাহাদিগকে দেওয়া যাইত। এবং অন্নপূর্ণার মন্দিরে নিত্য নিত্য পঁচিশ মোন তণ্ডুল বিতরণ হইত। আর দেব দেবীর পূজা ও ভোগের যেমন ধূমধাম, সেইরূপ পারিপাট্য ছিল। এই সকল ভোগে অন্ন ও নানা প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত

হইত, এবং চারি পাঁচ সহস্র লোক উত্তমরূপে আহার করিত। দণ্ডী কুমারী ও সধবা প্রত্যহ ১০৮ জন ইচ্ছা ভোজন করিত, তাহাদিগকে এক এক মুদ্রা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া যাইত। অপরঞ্চ মনুষ্যের প্রতি তাঁহার যেমত কৃপা জীব জন্তুর প্রতিও সেইরূপ ছিল। কথিত আছে কাশীর পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে যে যে স্থানে পক্ষ্যাদি বাস করিত সেই সেই স্থানে অন্ন নিক্ষিপ্ত হইত, এবং পিপীলিকাদির গর্ত্তের সম্মুখেও নিত্য নিত্য শর্করা ও অন্য অন্য মিষ্ট দ্রব্য দেওয়া যাইত।

কথিত আছে যখন রাণী কাশীতে গমন করিয়া ছিলেন তখন ১৭০০ খান নৌকা তাঁহার সমভিব্যাহারে গিয়াছিল। এবং প্রতিবৎসর তণ্ডুল ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া ন্যূনাধিক ১০০০ নৌকা যাইত।

এই সকল দানাদির জন্য কাশীতে রাণী ভবানীর নাম অতি জাজ্বল্যমান আছে, এবং অনেকে তাঁহাকে দ্বিতীয় অন্নপূর্ণা কহে। জনশ্রুতি আছে এক সময়ে রাজশাহী হইতে কাশীর ব্যযার্থ অর্থ যাইতে বিলম্ব হইয়াছিল, তজ্জন্য রাণী ভবানী অমৃতলাল নামক এক ধনবন্ত বণিকের স্থানে এক লক্ষ মুদ্রা কর্জ্জ চাহিয়া পাঠাইলেন। বণিক উত্তর করিল, বঙ্গ দেশে অতি সামান্য লোকে অল্প ভূম্যাদি করিয়া আপনাদিগকে রাজা ও রাণী কহায়, তাহাদের বিষয় সম্পত্তি কিছু অন্বেষণ

করিয়া পাওয়া যায় না, আমি রাণী ভবানীকে জানি-না, টাকা কর্জ্জ দিব না। এই কথা বলিয়া রাণীর লোককে বিদায় করিয়া দিল। নিদ্রাকালে ঐ বণিক স্বপ্ন দেখিল, অন্নপূর্ণা তাহার নিকট আসিয়া বলিতে-ছেন, অরে অবোধ! কি করিয়াছিস্‌' রাণী ভবানী তোমার স্থানে অর্থ চাহিয়াছিলেন তাহাতে তুমি কি কহিয়াছ, আমাতে ও তাঁহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।

এই স্বপ্ন দর্শনানন্তর নিদ্রাভঙ্গ হইলে পর, বণিক প্রত্যুষে এক লক্ষ মুদ্রা লইয়া রাণীর বাসস্থানে গিয়া বলিল, আমি রাণী ঠাকুরাণীকে জানিতে পারি নাই, এই জন্য টাকা কর্জ্জ দিই নাই, সম্প্রতি আমি টাকা আনিয়াছি, এই টাকা রাণীকে দিতেছি, কিন্তু আমি একবার তাঁহার চরণ দর্শন করিব। রাণী ভবানী বলিয়া পাঠাইলেন এখানে সাক্ষাৎ হইবে না, যখন আমি অন্ন-পূর্ণার মন্দিরে যাইব তখন সাক্ষাৎ হইবে। অনন্তর যখন রাণী ভবানী অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়া, অন্নপূর্ণার পূজা করিতেছিলেন তখন বণিক দেখিল অন্নপূর্ণা ও রাণী ভবানী অভেদাকার। তদবধি অন্নপূর্ণা ও রাণী ভবা-নীর নামের ভেদ ছিল না, কাশীতে রাণী ভবানীর যেমন নাম তদ্রূপ আর কাহারও নাই।

গয়া ধামেও রাণী ভবানী অনেক পুণ্য কর্ম্ম ও দেবা-লয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি যখন

গয়াধামে গমন করেন, তখন তথায় অনেক দান বিতরণ করেন এবং গয়ালিকে নগদ ও অলঙ্কারাদিতে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা দেন।

রাজশাহী জিলাতে এবং নাটোরের রাজধানীতে রাণী ভবানী অনেক দেবালয় ও পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন, এবং ঐ জিলাতে অনেক নিষ্কর ও ব্রহ্মত্র ভূমী দিয়াছেন। কিন্তু নাটোর গঙ্গাহীন স্থান, এজন্য তথায় অধিক কাল বাস না করিয়া, মুরশিদাবাদ জিলার অন্তঃপাতী বড়নগর গ্রামে জাহ্নবীতীরে সতত বাস করিতেন। এবং ঐ স্থানে অনেক দেবালয় ও মন্দির স্থাপন করিযাছিলেন। ইহা ভিন্ন অনেক অতিথিশালা এবং ২২ আখড়া ছিল। ঐ সকল আখড়াতে অনেক রমথা অতিথি বাস করিত। তাহাদিগের প্রতিপালনার্থ এক এক আখড়াতে প্রতিদিন দুই টাকা অবধি ২০ টাকা পর্য্যন্ত দিতেন। এই দান নগদবৃত্তি ভুক্ত ছিল। ইহা ভিন্ন অতিথিসেবা ও দানের অত্যন্ত ধুম ধাম ছিল।

রাণী ভবানী আপন হস্তে সকল দান করিতে পারিতেন না এজন্য, আজ্ঞা দিয়াছিলেন দরিদ্র বা দায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে পোদ্দার ১ টাকা পর্য্যন্ত দান করিতে পারিবে, ধনরক্ষক ১ টাকা অবধি ৫ টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারিবে, মুচ্ছুদ্দি ৫ টাকা অবধি ১০টাকা পর্য্যন্ত দিতে

পারিবে। দেওয়ান ১০ টাকা অবধি ১০০ টাকা পর্য্যন্ত দান করিবে। এই সকল দানে রাণীকে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ছিল না। ১০০ টাকার অধিক হইলে রাণীর অনুমতির আবশ্যক হইত। ইহা ভিন্ন আপন অধিকারের মধ্যে ব্রাহ্মণকন্যা মাত্রের বিবাহ উপস্থিত হইলে কন্যা দানের সমুদয় ব্যয় সরকার হইতে দিতেন। দুর্গোৎসবকালে ২০০০ পট্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া কুমারী ও সধবা স্ত্রীলোকদিগকে দিতেন, ঐ সঙ্গে এক এক যোড়া শঙ্খ ও এক একটী সোণার নত দিতেন। আর প্রতিপদ্ অবধি নবমী পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক শত কুমারীকে একদা স্বর্ণালঙ্কারে পূজা করিতেন এবং দেশীয় ও বিদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা বার্ষিক দিতেন।

রাণীভবানীর রাজ্যের রোগীদিগের চিকিৎসা করাইবার অতি উত্তম ধারা ছিল, তিনি আট জন বৈদ্য বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা বড় নগর ও তচ্চতুঃপার্শ্বস্থ সাত খান গ্রামের সমুদায় রোগী লোকের চিকিৎসা করিয়া বেড়াইত। ঐ আট জন বৈদ্যের দুই দুই ভৃত্য নিযোজিত ছিল। তাহারা রোগীদিগের শুশ্রূষা ও ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য বৈদ্যদিগের সঙ্গে সঙ্গে যাইত। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক বৈদ্যের সঙ্গে দুই তিন জন ভারী পাচন, ক্ষুদ্র মৎস্য

পুরাতন তণ্ডুল, মুগের দাইল, মিছরি ও রোগীর অন্য অন্য আহারীয় দ্রব্য লইয়া যাইত। যে রোগীর যে দ্রব্য আবশ্যক হইত তাহা বৈদ্যের বিধান মত প্রস্তুত করিয়া দিত। এই সকল গ্রামে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার সৎকারাদির ব্যয় সরকার হইতে দেওয়া যাইত। অপর গ্রামস্থ দীন দরিদ্র লোক মরিলে, ব্রাহ্মণের সৎকার জন্য ৬ টাকা ও শূদ্রের সৎকারে ৩ টাকা করিয়া দিতেন। এবং সতী স্ত্রী সকল পতির সহগমন করিলে একখান বস্ত্র ও এক যোড়া শঙ্খ, আর লোকের অবস্থাবিবেচনায় কাহাকে ৫, কাহাকে ৭, কাহাকেও ১০ টাকা করিয়া দিতেন।

অপর রাণী ভবানীর দান যেমত অদ্বিতীয়, তাঁহার সম্মানও সেইরূপ ছিল। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে অতিশয় মান্য করিতেন। কথিত আছে তিনি যখন গয়াতে পিণ্ডদান করিতে গিয়াছিলেন তখন টিকারির রাজা কহিয়াছিলেন, পাঁচ লক্ষ টাকা না দিলে তাঁহাকে পিণ্ডদান করিতে দিবেন না। রাণী ভবানী এই কথা মুরশিদাবাদের নবাবকে জানাইয়াছিলেন, তাহাতে নবাব তখনি মুঙ্গেরের সুবাদারকে আজ্ঞা দিলেন, ঐ রাজার রাজ্য আক্রমণ করেন। তখন ঐ রাজা রাণীর স্থানে গলবস্ত্র হইয়া, কর গ্রহণ না করিয়া পিণ্ড দান করিতে দিলেন। কিন্তু রাণী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক

তাঁহাকে তিন লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঐ রাজা আপন ভূম্যাদির রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইয়া নবাবের ইস্তুতখানায় কয়েদ হইয়াছিলেন। তখন রাণী ভবানী ঐ টাকা আপনি দিবেন এই কথা বলিয়া তাঁহাকে কারামোচন করেন। তাহাতে ঐ রাজা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ স্বীয় পাগ্‌ড়ি একখান থালে আচ্ছাদন করিয়া তাঁহার নিকট এই কথা বলিয়া প্রেরণ করিলেন যে, আমি তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করি নাই, কিন্তু তিনি আমার মস্তক ক্রয় করিয়া রাখিলেন।

ইংরাজেরা রাজ্যাধিপতি হইলে তাঁহারাও রাণী ভবানীর যথেষ্ট গৌরব করিতেন। জনশ্রুতি আছে রাণীর দেবার্চ্চনাতে বিশেষ মনোযোগ প্রযুক্ত তাঁহার শেষাবস্থাতে ভূম্যাদির কর সুশৃঙ্খলা মতে আদায় হইত না। তাহাতে একবার ১১ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকি পড়াতে করসংগ্রাহক শোর সাহেব তাঁহার তাবৎ জমীদারী খণ্ড খণ্ড করিয়া পত্তন করিবার মানস করিলেন। কিন্তু রাত্রিযোগে সাহেব স্বপ্ন দেখিলেন, একটা শ্যামামূর্ত্তি নারী খড়্গ হস্তে তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলিল, যদি তুমি রাণী ভবানীর ভূম্যাদি অন্য কাহাকে দাও তবে এই খড়্গ দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিব। ইংরাজেরা স্বপ্ন মানেন না, কিন্তু তৎকালের সাহেবেরা পুণ্যাহের সময় ঘট স্থাপন

করিতেন এবং মাথায় টোপর দিয়া বসিতেন, অতএব স্বপ্ন মানিবেন আশ্চর্য্য নহে। যাহাহউক ঐ স্বপ্ন দর্শ-নের পর শোর সাহেব রাণী ভবানীর জমীদারী অন্য হস্তে অর্পণ করেন নাই।

পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে রাণী ভবানীর বৃদ্ধাবস্থাতে ভূম্যাদির কর সুন্দররূপ সংগ্রহ হইত না, তাহাতে কখন কখন ব্যয়ের অনাটনও হইত। কিন্তু তিনি যাহাকে অঙ্গীকার করিতেন কখন তাহার অন্যথা হইত না। এক সময়, অর্থের অনাটন-প্রযুক্ত তিনি খামারের শস্যাদি বিক্রয় করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। শস্যাদি বিক্রয় হইয়া তিন লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইল, কিন্তু টাকা আগত না হইতেই রাণী ঠাকুরাণী ব্যয়ের এক তালিকা করাইলেন, অমুককে এত দিতে হইবে অমুককে এত দিতে হইবে। এই সকল অঙ্ক একত্র করিয়া দেখিলেন তিন লক্ষ টাকা হইতে অনেক অধিক হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার নিয়ম ছিল কোন কথা মুখহইতে নির্গত হইলে তাহা প্রাণান্তেও অন্যথা করিতেন না, অবশিষ্ট মুদ্রা তখনি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিলেন, তথাচ যে কথা কহিয়াছিলেন তাহার অন্যথা করিলেন না।

রাণী ভবানীর পূজা আহ্নিকের নিয়ম অতি কঠিন ছিল। তিনি প্রত্যহ চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে গাত্রো-

ধ্যান করিয়া জপ করিতে বসিতেন। রাত্রি অর্দ্ধ দণ্ড থাকিতে জপ শেষ হইলে স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করিতেন। সে সময়ে অন্ধকার থাকিত এজন্য ভৃত্যেরা অগ্র পশ্চাৎ মশাল ধরিয়া যাইত। পুষ্পচয়নানন্তর নিশাবসান কালে গঙ্গা স্নান করিতেন। তাহার পর বেলা দুই দণ্ড পর্য্যন্ত ঘাটে বসিয়া জপ ও গঙ্গাপূজা এবং শিবপূজা করিতেন। তাহার পর প্রত্যেক দেবালয়ে গিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, গৃহে আসিয়া পুরাণ শ্রবণ এবং বাণ-লিঙ্গ শিবের পূজা ও ইষ্টপূজা করিতেন। ইহাতে প্রায় দুই প্রহর বেলা হইত। তদনন্তর কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করিয়া আত্মপরিবারস্থ ব্রাহ্মণ সকলের ভোজনান্তে স্বপাকে দশ জন ব্রাহ্মণকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইতেন। তাহার পর আড়াই প্রহর বেলার সময় আপনি হবিষ্যান্ন আহার করিতেন। তদনন্তর দেওয়ান-দপ্তরে কুশাসনে উপবেশন করিয়া মুখ শুদ্ধি করিতেন। ঐ সময়ে কর্ম্মাধ্যক্ষগণ উপস্থিত হইলে, বিষয় কর্ম্মের যে আজ্ঞা দিতেন তাহা তাহারা লিখিয়া লইত। তৃতীয় প্রহরের সময় পুনর্ব্বার ভাষাতে পুরাণ শ্রবণ করিতেন। দুই দণ্ড বেলা থাকিতে পুরাণ সমাপন হইত। সেই সময়ে কর্ম্মাধ্যক্ষগণ তাঁহার আজ্ঞানুযায়ি লেখনাদি প্রস্তুত করিয়া স্বাক্ষর করাইতে আসিত। রাণী ভবানী ঐ লেখনাদি শ্রবণ করিয়া তাহাতে মুদ্রাঙ্কন করিয়া

দিতেন। তদনন্তর সায়ংকালে পুনর্ব্বার গঙ্গাদর্শন এবং গঙ্গাকে ঘৃতপ্রদীপ দিতেন। তৎপরে আত্মালয়ে আসিয়া রাত্রি চারি দণ্ড পর্য্যন্ত মালা-জপ করিতেন তাহার পর জলগ্রহণান্তে দেওয়ানদপ্তরে বসিয়া রাজসংক্রান্ত কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের আজ্ঞা দিতেন, রাত্রি এক প্রহরের সময় প্রজাদিগের প্রার্থনাদি শুনিয়া বিচার করিতেন। তদনন্তর দুই তিন দণ্ড কাল অন্যালাপ করিতেন। পরে পৌরগণ কে কি ভাবে থাকে তাহার অনুসন্ধান করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় শয়ন করিতেন।

রাণী ভবানীর এমন শাসন ছিল যে যজ্ঞোপবীত হওনানন্তর যদি ব্রাহ্মণ কুমারেরা প্রাতঃস্নান না করিত এবং প্রাতঃসন্ধ্যার চিহ্ন ঊর্দ্ধপুণ্ড্র কপালে দৃষ্ট না হইত তবে তাহাদিগকে তখনি গঙ্গাপার করাইয়া দিতেন। বালকদিগের পঞ্চ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাহাদিগকে প্রাতঃস্নান অভ্যাস করাইতেন, এবং পঞ্চ পর্ব্বে ও অন্য অন্য নিষিদ্ধ দিবসে তাঁহার পরিবারস্থ পুরুষেরা স্ত্রীর মুখাবলোকন করিতে পারিতেন না।

রাণী ভবানী ৩২ বৎসর বয়সে পতিহীনা হইয়া ৭৯ বৎসরে পরলোক গমন করেন। তিনি মধ্যমাকারা ও অতিসুন্দরী ছিলেন, এবং যদিও অত্যন্ত প্রাচীনা হইয়াছিলেন তথাপি পশ্চাৎ হইতে দেখিলে তাঁহাকে

বিংশতিবর্ষা যুবতীর ন্যায় বোধ হইত। তাঁহার দন্ত-মাত্র ছিল না, কিন্তু কেশ কাল ছিল, কেবল সম্মুখের কয়েক গাছা কেশ পাকিয়াছিল মাত্র। এত বয়ঃক্রমেও তাঁহার এমন সামর্থ্য ছিল যে নিত্য পূজাদি করিয়া স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করিতেন, এক দিনের নিমিত্তও ঐ নিয়মের অন্যথা হয় নাই।

রাণী ভবানী বৈধব্য দশার পর জামাতার পরলোকান্তে পোষ্য পুত্র রাখিয়াছিলেন। ঐ পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তাঁহাকে সর্ব্বাধিকারী করিয়া আপনি গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন, বিষয় কর্ম্ম কিছু দেখিতেন না। রাজা রামকৃষ্ণ অত্যন্ত তামসিক ছিলেন, রাজকর্ম্মে কিছু মনোযোগ করিতেন না, তাহাতে তাঁহার জীবদ্দশাতেই অনেক বিষয় নষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ দোষ নাই। তিনি যে পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে বিষয়ের রক্ষক করিয়াছিলেন তাহারাই ভক্ষক হইয়া ঐ সকল বিষয় কলে কৌশলে আপনারা গ্রাস করিল। সম্প্রতি ঐ সকল লোকেরা রাজশাহী জিলার প্রধান প্রধান জমিদার হইয়াছেন। এবং যে রাণী ভবানীর কীর্ত্তি তাবৎ বঙ্গভূমিতে জাজ্বল্যমান, ও যাঁহার অন্নে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার পরিবারবর্গেরা সামান্যমধ্যে গণনীয় হইয়াছেন।

নারী-গুণ বর্ণন।

সংসারের মধ্যে নারী হয় শ্রেষ্ঠতর।
সর্ব্ব সুখে সুখী নারী, না জানে পামর॥
নারী লয়ে নর লোক সংসারী বলায়।
নানা ধন উপার্জ্জয় নারীর সহায়॥
দান যজ্ঞ ব্রত সঙ্গে সস্ত্রীক হইয়া।
পিতৃলোক তুষ্ট করে পুত্র জন্মাইয়া॥
রাজ্য ধন অট্টালিকা আছয়ে যাহার।
নারীশূন্য গৃহ তার শ্মশান আকার।
সংসার অসার, সার রমণীর সঙ্গ।
যেহেতু পুরুষ নারী হয় এক অঙ্গ॥
গ্রহবশে নিজবাসে দুঃখী যেই জন।
কোন রূপে করে যেই উদর ভরণ॥
গুণবতী নারী সহ যদি করে বাস।
তাহার নিকট স্বর্গবাস উপহাস॥
ইহকালে ভার্য্যা হৈতে বঞ্চে নানা সুখ।
পরকালে কভু তার নাহি হয় দুখ॥

মহাভারত।

সম্পূর্ণ।